ওয়াহাবিদের ইতিহাস

www.muslimdb.com

বই : ওয়াহাবিদের ইতিহাস
লেখক : **ইয়াসির আরাফাত আল হিন্দী**
প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশনায় : সিদ্দীকিয়া প্রকাশনী
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১
✆ ০১৯২৩১৩০৫৬৫ (WhatsApp)
মুদ্রণে : মিরাজ কালার হাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা
: ✆ ০১৭১২৬০৮৭৫৯
অনলাইন পরিবেশক : rokomari.com - wafilife.com

www.muslimdm.com

রচনা

ইয়াসির আরাফাত আল হিন্দী

www.muslimdm.com

Web : darunnazatkitabbivag.com

শাখা প্রতিষ্ঠানসমূহ: দারুননাজাত সেবা ফাউন্ডেশন (গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ প্রকল্প),

: উলুমুল কোরআন ওয়াসসুন্নাহ ফেসবুক গ্রুপ (যে কোনো ধর্মীয় সমস্যা বা মাসআলার সমাধান), muslimdm.com

উলুমুল কুরআন ওয়াসসুন্নাহ

: দারুননাজাত নৈশ মাদরাসা (জেনারেল শিক্ষিতদের জন্য নূরানী কায়দা থেকে বুখারী শরীফ পর্যন্ত, দৈনিক তিন ঘণ্টা করে সাত বছরে দাওরা কোর্স)।

Youtube : DMKB Official Muslim Madrasah

মূল্য: ৬০০ টাকা

[সততা ও দক্ষতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ]

Page in actual:335, Forma: 21 , gms: 80 (offset)

Ohabider Itihash

By : Yeasir Arafat Al Hindi

Published by : Siddikia Prokashoni, Bangladesh

E-mail : info.siddikia2024@gmail.com

উৎসর্গ

খায়রুল বাশার ও নুরুল আনওয়ার ﷺ–কে

প্রকাশকের কথা

একবার কয়েকজনকে প্রশ্ন করেছিলাম বলোতো, '০০০' এ শূন্যগুলোর স্থানীয় মান কত? চিন্তা না করেই কয়েকজন বলে দিল, একক, দশক ও শতক। আপনি বলুন, উত্তর সঠিক না বেঠিক? ভালো করেই ভাবুন। তারপরে বলুন। বাস্তবতা হলো, এভাবে বহু শূন্যকে একত্র করলে শুধু লাইন ভরবে কিন্তু কখনও স্থানীয়মান পাওয়া যাবে না। গণিতশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এমনই। এমন ফতোয়ার জন্য কেউ গণিতবিদদেরকে শ্রুতিকটু কিছুই বলতে পারবে না। তাদের শান-মান বিরোধী কোনো মন্তব্যও করতে পারবে না। সুস্থ বিবেকের দাবী এমনই।

কুরআনুল কারীমের সাধারণ রীতি হলো, প্রথমে ঈমানের আলোচনা, এরপর আমলের আলোচনা। উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, ঈমানবিহীন আমল কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। একাউন্ট খোলা ব্যতীত যেমন ব্যাংকে কোনো টাকা রাখা যায় না, তেমনি ঈমান ছাড়া কোনো আমল পরকালে কাজে আসবে না। দুনিয়াতে কিছু ফায়দা হলেও আখেরাতে একেবারেই জিরো। এজন্য আকীদা বাতিল হলে আমল যতই ইখলাসপূর্ণ হোক না কেন, তা ওজনে হালকা হয়ে যায়। আকীদা সঠিক হলে আমলের ওজন বেড়ে যায়। যেমনিভাবে সংখ্যার পরে শূন্য থাকলে প্রতিটি শূন্যের স্থানীয় মান বাড়তে থাকে।

পৃথিবীর সূচনা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল ও উম্মতের আকীদা একরকম। ভিন্নতার কোনো সুযোগ নেই। এ কথাটিই আল্লাহ তাআলা সূরা শুরায় ১৩ নং আয়াতে বলেছেন-

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই পন্থাই স্থির করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি নূহকে এবং (হে রাসূল!) যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে, তোমরা দীন কায়েম কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না।[১]

এখানে এসে অনেকে বিপদগ্রস্ত হয়ে যায়। আয়াতটিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অর্থে চালানোর অপচেষ্টা করে থাকে। যা সম্পূর্ণ তাহরীফ। একজন মুমিমেনের জান্নাত-জাহান্নামের ফয়সালা হবে এ আকিদার কারণে। ফেরকায়ে নাজিয়াহ ও ফেরকায়ে দল্লাহ হবে আকিদার কারণে। তাই আকিদার গুরুত্ব সর্বাগ্রে। এজন্য নবীজি ﷺ বলেছেন,

إن بني إسرائيل تفرَّقت على ثِنْتين وسبعينَ مِلَّة، وتفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين مِلَّة، كلُّهم في النار إلا ملَّة واحدة. قالوا: ومَن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصْحابي.

অর্থাৎ বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।[২]

আকিদার মানদণ্ডেই ৭৩ দল থেকে এক দল আলাদা হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সফলতা-ব্যর্থতার কোনো প্রভাব থাকে না। কারো কাছে আকিদার চেয়ে যদি রাজনৈতিক সফলতার গুরুত্ব বেশি হয়ে থাকে, তারা নিঃসন্দেহে দিকভ্রান্ত। সাধারণত ইলমশূণ্যতার কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। এজন্য ওলামায়ে কেরাম বলে থাকেন, মাদরাসার চেয়ে কখনও রাজনৈতিক সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। কেননা, রাজনীতি কখনো ইলমে ওহীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বরং ইলমে ওহী দ্বারাই রাজনীতিকে পরিচালিত করতে হবে। ইলম বা কবুলিয়তের দীনতার কারণেই কারো ইলম, আমল, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান রাজনীতি দ্বারা কলুষিত হয়। এর পরিণতি সর্বদাই ভয়াবহ। এগুলো কেমন যেন সংখ্যাহীন একগাদা শূন্য। যার স্থানীয় মান নেই।

---

১. সূরা শুরা-১৩।

২. তিরমিযী- ২৬৪১।

www.muslimdm.com

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার মতো মহান ব্যক্তি ইয়াহুদিদের লেখনিতে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। গোল্ড জিহার বলেছেন, "যে ব্যক্তি তাওরাতে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে আলোচনা করতে চায়, তাকে অবশ্যই ইবনে তাইমিয়ার গবেষণার মুখাপেক্ষী হতে হবে"।[৩]

এ মন্তব্য থেকেই বুঝা যায়, ইবনে তাইমিয়া কী পরিমান অমুসলিম সাহিত্য চর্চা করতেন। ইয়াহুদিদের লেখার প্রভাব তার মধ্যে বহুমুখি প্রভাব ফেলেছিলো।

ইয়াহুদিদের লেখনির প্রভাবেই তিনি আল্লাহ তাআলার সিফাতের মাসআলায় চরম বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। বলা যায়, ইহুদিদের সিফাতে তিনি মাওসুফ। ইহুদিরা শুরু থেকেই নবীদের সাথে বেয়াদবি করে আসছে। এটি যেন তাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। এর থেকে সরে আসা প্রায় অসম্ভব। এদের প্রভাবে ইবনে তাইমিয়া শাদ্দুর রিহালের মাসআলায় নিশ্চিত বেয়াদবি প্রকাশ করেছেন। মুজতাহিদ ইমামদের প্রতিবাদে সরকার তাকে জেলে নিতে বাধ্য হয়। ইয়াহুদিদের দুটি নির্ভেজাল ভ্রান্তি 'আসমা ও সিফাত' এবং 'তানকীদে আম্বিয়া'। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এ উভয় বেআদবীকে পৃথিবীতে জিন্দা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। حفظنا الله

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া শিরক বিদআতের যে দর্শনকে গোড়াপত্তন করে গেছেন, সে চিন্তা-চেতনায় উজ্জিবিত হয়েই শায়েখে নজদ তার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। শিরক বিদআতের বিকৃত চিন্তায় ঝরে গিয়েছিলো অসংখ্য মুসলমানের প্রাণ। মুসলিম হত্যাকে নজদিরা ইবাদত মনে করেছিল। এদের স্ত্রী ও সন্তানদের দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের সম্পদকে গণিমত হিসেবে লুফে নিয়েছিলো। তাদের একটি মারাত্মক রোগ ছিলো। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ: বলেন, اعتقدوا أنهم المسلمون، وأن من خالف اعتقادهم مشركون، استباحوا قتل أهل السنة وقتل علمائهم..الخ অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করে শুধু তারাই মুসলমান। এবং যারা তাদের আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধিতা করে তারা মুশরিক। তারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী ও আলিমদের হত্যা করাকে বৈধ মনে করে।[৪]

ওয়াহাবিরা মনে করে তারা নিজেরাই মুসলমান! বাকিরা সবাই মুশরিক! অথচ তারা সারাজীবন একটি কাফেরও হত্যা করেনি। হত্যার চেষ্টাও করেনি। বরং কাফেরদের সহযোগীতা নিয়ে মুসলিম নিধনে নিজেদেরকে মহাব্যস্ত রেখেছে। এজন্যই আমরা বলি, প্রতিটি মুসলমানের শ্লোগান হোক, "নজদী তাইমি, খারেজি খারেজি"।

বর্তমান দুনিয়াতে খারেজি নামে কেউ হয়তো নেই। সেই আব্দুর রাহমান ইবনে মুলজিমও নেই। কিন্তু তাদের বহু প্রেতাত্মা নজদী-তাইমি নামে পৃথিবীতে বিচরণ করছে। কাফের নিধনের পরিবর্তে মুসলমানদের মূলোৎপাটনই এদের সবচে বড় ইবাদত। এদের ইখলাস-ইখতেসাসের সকল ভাণ্ডার উপচে পড়ে এ নৃশংসতায়। জে. এম. বি., আল-কায়েদা, আই.এস.-সহ বিভিন্ন পরহেজগারী সংগঠনই এখন জামানার খারেজি। যুগের নজদী। সময়ের তাইমী। হাদাহুমুল্লাহ!

রিক্সা-বাইসাইকেল এক্সিডেন্ট কেমন? সি.এন.জি.-মটর সাইকেলের দুর্ঘটনা কতটুকু ভয়াবহ হতে পারে? গতিশীল দুটি বাসের সংঘর্ষ কেমন পরিণতি আনতে পারে? এরচেয়েও বেশি বিপর্যয় নিয়ে আসে খারেজিদের শিরক-বিদআতের বাতিল চিন্তা। মূর্খ বেআমলী মাজার-পূজারী ভণ্ডদের দ্বারা সমাজের সচেতন মানুষ কখনও আক্রান্ত হয় না। এদের অজ্ঞতাই মানুষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে শিরক-বিদআতের গ্রাস থেকে। এরা রিক্সা-বাইসাইকেলের একসিডেন্টের মতো ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু নজদী-তাইমীদের শিরক-বিদআতের আকিদা দর্শন গতিশীল দুটি পরিবহনের বিপর্যয়ের চেয়েও আরো বড় বিপদ ডেকে আনে। অতএব এদের চিন্তা-চেতনা বড়ই ডেঞ্জার এরিয়া। সাবধান! সাবধান!

৩. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন- ৫৫।

৪. রদ্দুল মুখতার-৩/৩০৯

www.muslimlam.com

“রাষ্ট্র ছাড়া ইসলাম হবে না৷ মানা সম্ভব না। আমলি ইসলাহ আসুক আর না আসুক, রাষ্ট্র ক্ষমতা হলো মূল৷ আর সকল ইবাদত হলো এর ট্রেনিং কোর্স৷ সহায়ক শক্তি৷ অতএব আকিদা-ইবাদতের গুরুত্ব যতটা প্রয়োজন, তার চেয়েও রাষ্ট্র ক্ষমতা আরো বেশি প্রয়োজন৷” এগুলো সবই বাতিল চিন্তা৷ আরবির চেয়ে ইংরেজী বেশি পড়লে এমন সমস্যা হতে পারে৷ ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের তাফসির আর শরাহ পড়ে পড়ে এমন ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে৷ কিন্তু নুসূসে শরীয়ার কিছুই দেখাতে পারবে না৷ এজন্য আমরা সুরা শুরার ১৩ নং আয়াতের তাফসীর পড়ার অনুরোধ করবো৷

সারকথা হলো, আমলী বিপর্যয়ের চেয়ে আকীদার ভ্রান্তি অনেক ভয়াবহ৷ জুমহুরুস সালাফের আকীদাই আমাদের আকীদা৷ যারাই এর খেলাফ বলবে তারাই ভ্রান্ত৷ নবীজি ﷺ বলেছেন,.إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافًا فعليكم بالسواد الأعظم. আমার উম্মাত পথভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যবদ্ধ হবে না৷ তোমরা মতভেদ দেখতে পেলে অবশ্যই সর্ববৃহৎ দলের সাথে থাকবে৷[৫]

অর্থাৎ জুমহুরুস সালাফের সাথে থাকো৷ যারা মুজতাহিদ ইমামদের আকিদা মেনে নিবে তারাই নিরাপদ৷ নিজের ব্যাখ্যার পরিবর্তে মুজতাহিদ ইমামদের ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য৷

ওরিয়েন্টালিস্টদের বড় একটি ষড়যন্ত্র হলো, উম্মতকে সালাফের ব্যাখ্যা থেকে সরিয়ে এনে নিজস্ব ব্যাখ্যায় পরিচলিত করা৷ পশ্চিমাদের মূল আক্রমণের জায়গাটা এখানেই৷ মুজতাহিদ ইমামদের লেখনির পরিবর্তে তাদের লেখা পড়ে যারা স্কলার হচ্ছে, তারা আয়াত পড়েই দলিল দেয়া শুরু করে৷ তাফসির বলে না৷ হাদীস দেখেই প্রমাণ পেশ করে৷ শুরুহাতে নজর দেয় না৷ এরা হলো, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবে না, কিন্তু বিশ্ব সেরা ডাক্তার হতে চায়৷ এদের প্রেশক্রিপশনকে কেউ নসখ করতে পারবে না৷ এ হলো পশ্চিমা চিন্তার আধুনিক মুসলমান৷ আধুনিকতার শ্লোগানে সালাফ-খালাফ সবাইকে শেষ করে নিজেরাই সেরা মনীষীর দানবীয় রূপে প্রকাশিত হচ্ছে৷

তাই আমাদেরকে পশ্চিমা সকল ষড়যন্ত্র থেকে বেচেঁ থাকতে হবে৷ জুমহুরুস সালাফের নীতি আদর্শের বাইরে কোনো আকিদা দর্শন পালন করা যাবে না৷ বার বার মনে করতে হবে এ আয়াত-.وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশী হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে৷ বলে দাও, প্রকৃত হিদায়াত তো আল্লাহরই হিদায়াত৷[৬]

দেওবন্দী কিছু ওলামায়ে কেরাম আকীদা ও ইতিহাস না জানার কারণে ওয়াহাবিদের পক্ষে বলে থাকেন। সালাফের সাথে এটি বড়ই অশোভনীয় আচরণ। এখনই আমাদের ফিরে আসা দরকার। হিন্দুস্থানের ইলমি ও আমলি ময়দানে আল্লাহ তায়ালা দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগিয়েছেন। অন্য কোন মাসলাক ওনাদের কাছাকাছিও আসতে পারেনি। এ মর্যাদা সালাফের ইখলাস ও ইখতিসাসের কবুলিয়াতের ফসল। কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহতালা ছারছীনা, ফুরফুরা, দেওবন্দ ও জৌনপুরী-সহ সকল সিলসিলার খেদমতগুলো কবুল করুক। আমিন৷

আমরা একবার মারকাজুত দাওয়ার উস্তাজুল ফুকাহা ওয়াল মুহাদ্দিসীন মুহতারাম আব্দুল মালেক সাহেব হুজুরের সাথে প্রায় বিশ মিনিট নজদী আকিদা নিয়ে কথা বলেছিলাম। আমরা অনুরোধ করেছিলাম যে, হুজুর, শায়খে নজদী সম্পর্কে আপনার একটি মুহাক্কাক লেখা ছাপা দরকার৷ উম্মাহর এ ক্রান্তি লগ্নে নজদী বিরোধী চিন্তা-চেতনা উদীয়মান বহু সমস্যার সমাধান। এমনই এক চেতনা থেকে পাকিস্তানের উলামায়ে দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় আলেম মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমদ খান মা. জি. আ. “দেওবন্দীয়ূঁ কি তাতহীর জরুরী হায়” নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। আমরা মনে করি মারকায-সহ সকল দেওবন্দী ওলামায়ে কেরাম বইটি সংগ্রহ করে নজরে রাখবেন৷

নজদী-তাইমীর সকল আমল ও খেদমত সংখ্যাহীন শূন্যের কাছাকাছি৷ ওয়াহাবীরা যেহেতু পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের ফসল, তাই মুসলমানদের ঈমান আকিদা বাচাঁনোর জন্যই এদের ইতিহাস জানা দরকার৷ প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এবইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ছাপলাম৷ লেখক এ বইয়ে

---

৫. সুনানু ইবনে মাজাহ-৩৯৫০

৬. সূরা বাকারা-১২০।

www.muslimdm.com

ওয়াহাবিদের ইতিহাস —সংক্ষিপ্ত হলেও চমৎকারভাবে— উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব এর জীবনী থেকে তার চতুর্মুখী আক্রমণ ও বর্তমান পৃথীবিতে এ মতাদর্শের প্রভাব কেমন ভয়াবহতা নিয়ে এসেছে তাও সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন। ওয়াহাবীদের তাকফীরি ফেতনায় যেহেতু মুসলিম বিশ্ব চরম অস্থিরতার দিকে যাচ্ছে, তাই এদের ইতিহাস জানা আমাদের সকলের দরকার। এদের তাণ্ডব লীলার ভয়াবহতা জানলে এদেরকে পরহেয করা সবার জন্যই সহজ হবে বলে মনে করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ও এ নজদী ভাইদেরকে হেদায়েত দান করুন। পাঠক মহোদয়ের সুপরামর্শ একান্তভাবে কামনা করছি। আমীন।

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্ত সূচী

প্রথম পর্ব		
1	নজদের ইতিবৃত্ত	২৭
2	মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব	৪১
3	দিরিয়া : দুই ইমামের রঙ্গভূমি	৬৩
4	ইনকিলাবের সূচনা	৭৫
5	ইনকিলাবে আরবি	৮৯
6	সৌদিআরবের প্রতিষ্ঠা	৯৪
7	নিলামে ফিলিসতিন	১১৬
দ্বিতীয় পর্ব		
8	খারিজিদের পরিচয় এবং ওয়াহাবি ও খারিজিদের মধ্যে সাযুজ্য	১৩৫
9	ওয়াহাবি কর্তৃক উম্মতে মুসলিমাকে তাকফির	১৬৪
10	আহলুস সুন্নাহর স্বনামধন্য ইমামদের তাকফির	২২৩
11	ওয়াহাবি আন্দোলনের বিরোধিতায় আহলুস সুন্নাতের আইম্মায়ে কিরাম	২৪৫
12	পরিশিষ্ট	২৯৩

বিস্তারিত সূচী

প্রাককথন ২০

প্রথম অধ্যায় ২১

নজদের ইতিবৃত্ত..... ২১

দ্বিতীয় অধ্যায়.....২৮

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি (১২০৬ হি.) ২৮

জন্ম ও বংশ পরিচয় ৩১

নজদির শৈশব ও কৈশোর.....৩৩

ইরাক যাত্রা..... ৩৪

www.muslimdm.com

হুরায়মালা থেকে বিতাড়ন.....৩৫
উসমান ইবনু মুআম্মার (১১৬৩ হি.) এর সান্নিধ্যে.....৩৬
জায়িদ ইবনুল খাত্তাব (১২ হি.) রা. এর মাজার ধ্বংস.....৩৬
তৃতীয় অধ্যায়.....৩৮
দিরিয়া : দুই ইমামের রঙ্গভূমি.....৩৮
দুই ইমামের শপথ.....৩৮
আলে সৌদের পরিচয়.....৩৯
আরিজের সরদারকে গুপ্তহত্যা.....৩৯
আইনিয়ার শাসক উসমান (১১৬৩ হি.) কে গুপ্তহত্যা.....৪১
হুরায়মালার আমির ইবনু মুবারক (১১৬৫ হি.) কে হত্যা.....৪২
মানফুহাবাসীর বিদ্রোহ.....৪৩
ইনকিলাবের সূচনা.....৪৩
বনু ইয়াম বিপ্লব.....৪৪
ইবনু সৌদ (১১৯৭ হি.) এর তিরোধান.....৪৪
বনু ইয়ামের পুনরায় বিপ্লবের প্রচেষ্টা.....৪৫
বনু খারজের বিদ্রোহ.....৪৫
হারমাবাসীর বিদ্রোহ.....৪৬
মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি (১২০৬ হি.) এর তিরোধান.....৪৬
ওয়াহাবিদের ইরাক আক্রমণ.....৪৬
আবদুল আজিজ (১২১৮ হি.) কে হত্যা.....৪৭
চতুর্থ অধ্যায়.....৪৮
আরব বিপ্লব.....৪৮
পুনরায় ইরাক আক্রমণ.....৫০
বিলাদুশ শাম তথা সিরিয়াতে ওয়াহাবি তাণ্ডব.....৫০
আরব বিপ্লবের সূচনা.....৫০
ঐতিহাসিক আরব বিপ্লব.....৫১
দিরিয়া আমির সৌদ (১২২৯ হি.) র মৃত্যু.....৫১
আমিরাতে দিরিয়ার অন্তিম পরিণতি.....৫২
পঞ্চম অধ্যায়.....৫২
সৌদিআরবের প্রতিষ্ঠা.....৫২
আলে সৌদ ও ব্রিটিশ সম্পর্ক স্থাপন.....৫৩
বিভিন্ন সময় ওয়াহাবি-কুফফার জোট.....৫৩
আমিরাতে জাবাল শাম্মার দখলের প্রচেষ্টা.....৫৪
অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন্দলে আলে সৌদ.....৫৪
আমিরাতে নজদের পতন.....৫৫

www.muslimcm.com

কুয়েত থেকে নতুন ষড়যন্ত্র ৫৬
সুরাইফের গণহত্যা ৫৬
ব্রিটিশ ভৃত্য হিসেবে ইবনু সৌদ ৫৬
ওয়াহাবিদের নির্দেশক হিসেবে ব্রিটিশ গোয়েন্দা উইলিয়াম হেনরি শেকসপিয়র ৫৮
ওয়াহাবিদের নির্দেশক হিসেবে গোয়েন্দা জন ফিলবি ৫৯
মজলিসুর রুব ৫৯
ইমারতে জাবাল শাম্মার দখল ৬০
ইয়েমেনি হাজিদের গণহত্যা ৬১
তায়েফ গণহত্যা ৬১
ষষ্ঠ অধ্যায় ৬৩
নিলামে ফিলিস্তিন ৬৩

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম অধ্যায় ৭১
খারিজিদের পরিচয় এবং ওয়াহাবি ও খারিজিদের মধ্যে সাযুজ্য ৭১
খারিজি কারা ৭২
খারিজিদের বিভিন্ন নাম ৭৩
খারিজিদের উৎপত্তি ৭৫
খারিজিদের বৈশিষ্ট্য ৭৬
ক. এরা হবে সীমালঙ্ঘনকারী ৭৬
খ. তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে কিন্তু মুশরিকদের ছেড়ে দিবে ৭৭
গ. তারা অত্যাধিক ইবাদতকারী হবে কিন্তু তাদের ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না ৭৭
ঘ. তাদের কথাবার্তা সুন্দর হবে কিন্তু কর্মকাণ্ড হবে ইসলামবিরোধী ৭৭
ঙ. তারা অল্পবয়সী হবে এবং তাদের দীন সম্পর্কে জ্ঞান কম হবে ৭৮
চ. বনু তামিম গোত্র থেকে খারিজিদের বের হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ৭৮
ছ. নজদ অঞ্চল থেকে খারিজিদের উৎপত্তি হবে ৭৮
জ. তারা কুরআনের দিকে আহ্বান করবে যার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই ৭৯
ঝ. তারা সৃষ্টিকুলের নিকৃষ্ট জীব ৭৯
ঞ. তাদের কথা হবে ভালো কিন্তু কাজ হবে মন্দ ৮০
যুগে যুগে আবির্ভূত হওয়া বিভিন্ন খারিজি দল ৮০
১. আজারিকা ৮০
২. নাজদাত ৮০
৩. সুফরিয়া ৮০
৪. ইবাজিয়া ৮১
খারিজিদের সঙ্গে ওয়াহাবিদের সাযুজ্য ৮১

www.pathagar.com

বিস্তারিত সূচী

১. ওয়াহাবিরা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী ৮১
২. ওয়াহাবিদের লড়াই ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে ৮৩
৩. তাওহিদের দাওয়াতের মোড়কে বাতিল মতাদর্শ.....৮৩
৪. সুফাহাউল আহলাম ও হুদাসাউল আসনান ৮৪
৫. নজদ ও বনু তামিম থেকে নির্গত হওয়া..... ৮৪
৬. কুরআন-সুন্নাহর (অপব্যাখ্যার দিকে) আহ্বান ৮৪
দ্বিতীয় অধ্যায়..... ৮৬
ওয়াহাবিদের কর্তৃক উম্মতে মুসলিমাকে তাকফির ৮৬
১. ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের কাছে ইলমুল ফিকহ ছিল শিরক..... ৯০
২. যারা ওয়াহাবি মতাদর্শ গ্রহণ করত না তাদের তাকফির..... ৯২
৩. ইমান আনার পর কেউ যদি আমল না করে সে কাফির হয়ে যাবে ৯৬
৪. কালিমার ওপর ইমান আনয়নকারী মুসলিমদের তাকফির যারা করত না তাদের তাকফির ৯৬
৫. বিভিন্ন আরব দেশকে মুশরিকদের স্বর্গরাজ্য মনে করা ৯৭
৬. ইখওয়ান : ওয়াহাবিদের তাকফিরের অনন্য নিদর্শন ৯৮
৭. উসমানিদের আমভাবে তাকফির ৯৯
৮. মাজারকে শিরক হিসেবে পরিগণিত করা.....১০২
৯. তাওয়াসসুল, শাফাআত ও ইস্তিগাসাকারীদের তাকফির..... ১০৩
ক. তাওয়াসসুল ১০৪
খ. ইসতিগাসা ১০৫
গ. শাফাআত ১০৮
১০. শাদ্দুর রিহালের মাসআলায় চরম বাড়াবাড়ি ১১০
১১. নিদাকারীকে তাকফির করা ১১১
১২. আশআরিদের তাকফির.....১১১
১৩. রাসুলুল্লাহ সাঃ-কে শিরকের দায়ে অভিযুক্ত করা.....১১৩
তৃতীয় অধ্যায়.....১১৪
আহলুস সুন্নাহর স্বনামধন্য ইমামদের তাকফির.....১১৪
১. ইমামে আজম আবু হানিফা রাহ.-এর শানে নজদি ও তাঁর শাগরিদদের বেআদবি ১১৪
২. ইমাম বুখারি রাহ.-কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা.....১১৫
৩. ইমাম ইবনু ফিরুজ হাম্বলি ও ইমাম সালিহ ইবনু আবদুহ রাহ.-কে তাকফির১১৫
২. ইমাম সুলায়মান ইবনু সুহাইম হাম্বলি (১২৩০ হি.) রাহ.-কে তাকফির..১১৬
৩. ইমাম ইবনু আফালিক হাম্বলিক (১১৬৩ হি.) কে তাকফির ১১৬
৪. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইসা রাহ.-কে তাকফির..... ১১৭
৫. শায়খ আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া রাহ.-কে তাকফির ১১৭
৫. ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহ. (৯১১ হি.) -এর মধ্যে শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ১১৭
৬. সুলতানুল আরিফিন ইমাম ইবনুল ফারিদ রাহ. (৬৩২ হি.) -কে তাকফির১১৭

www.muslimdm.com

৭. ইমাম রাজি রাহ. (৬০৬ হি.) -কে তাকফির ১১৮
৮. শায়খে আকবার ইমাম ইবনুল আরাবি রাহ. (৬৩৮ হি.) -কে তাকফির.১১৯
শাতহা কি.....১২১
অহদাতুল উজুদ.....১২১
৯. ইমাম মানসুর বুহুতি রাহ. (১০৫১ হি.)-কে মিথ্যাবাদি বলা ১২৪
চতুর্থ অধ্যায় ১২৫
ওয়াহাবি আন্দোলনের বিরোধিতায় আহলুস সুন্নাতের আইম্মায়ে কিরাম ১২৫
১. শায়খ আবদুল ওয়াহহাব নজদি (১১৫৩ হি.) ১২৫
২. শায়খ সুলায়মান ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি (১২০৮ হি.)..... ১২৬
৩. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল লতিফ (১১৮১ হি.)..... ১২৬
৪. ইমাম ইবনু আফালিক হাম্বলি (১১৬৩ হি.) ১২৭
৫. ইমাম ইবনু ফিরুজ হাম্বলি (১২১৬ হি.) ও ইমাম সালিহ ইবনু আবদুহ..১২৭
৬. ইমাম আবদুল্লাহ জুবাইরি (১২২৫ হি.) ১২৮
৭. শায়খ সুলায়মান ইবনু সুহাইম (১২৩০ হি.)..... ১২৮
৮. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু সুহাইম হাম্বলি ১২৮
৯. শায়খ নাসির ইবনু সুলায়মান হাম্বলি..... ১২৮
১০. শায়খ মিরবাদ ইবনু আহমাদ হাম্বলি (১১৭১ হি.).....১২৯
১১. শায়খ আহমাদ আল-মিসরি (১৪০৫ হি.) ১২৯
১২. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইসা.....১২৯
১৩. শায়খ সাইফ ইবনু আহমাদ ১২৯
১৪. সাইয়িদ আল-মুনয়িমি..... ১৩০
১৫. শায়খ রাশিদ ইবনু খিন্নিন হানাফি (১২০৬ হি.) ১৩০
১৬. শায়খ উসমান ইবনু আবদুল আজিজ মানসুর ১৩০
১৭. শায়খ উসমান বসরি.....১৩১
১৮. ইমাম উসমান ইবনু আবদুহ হাম্বলি.....১৩১
১৯. শায়খ আবদুল আজিজ হাম্বলি ১৩১
২০. শায়খ সালিহ ইবনু মুহাম্মাদ হাম্বলি.....১৩১
দুই. ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে হিজাজের উলামায়ে কিরাম.....১৩২
১. ইমাম আহমাদ জাইনি দাহলান (১৩০৪ হি.) ১৩২
২. শায়খুল ইসলাম হুমাইদান ইবনু তুরকি হাম্বলি (১২৯৫ হি.) ১৩২
৩. শায়খ ইবনু সুলায়মান কুর্দি (১১৯৪ হি.) ১৩২
৪. শায়খ আতাউল্লাহ মাক্কি..... ১৩২
৫. ইমাম আবদুল ওয়াহহাব ইবনু আহমাদ বারাকাত মাক্কি (১৪১৮ হি.).... ১৩২
৬. ইমাম সাইয়িদ আবদুল্লাহ ইবনু ইবরাহিম মিরগিনি (১২০৭ হি.)..... ১৩২
৭. ইমাম সালিহ ইবনু ইবরাহিম জমজমি.....১৩৩

www.muslimlam.com

৮. ইমাম সাবি মালিকি (১২৪১ হি.) ১৩৩

তিন. ওয়াহাবিদের রদে ইয়ামেনি উলামায়ে কিরাম ১৩৪

১. শায়খ ইউসুফ ইবনু ইবরাহিম সানআনি ১৩৪

২. ইমাম আলাবি হাদ্দাদ ১৩৪

৩. ইমাম আহমাদ ইবনু ইদরিস (১২৫৩ হি.) ১৩৪

৪. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইসা (১২২৪ হি.) ১৩৪

৫. শায়খ মুহসিন ইবনু আবদুল কারিম (১২৬৬ হি.) ১৩৪

৬. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু হাসান ফিল ফকিহ (১২৭২ হি.) ১৩৪

চার. ওয়াহাবি মতাদর্শের বিরুদ্ধে মিসরি উলামায়ে কিরাম ১৩৪

১. ইমাম আবদুল ওয়াহহাব ইবনু আহমাদ বারাকাত ১৩৫

২. সাইয়িদ মুসতাফা বুলাকি (১২৬৩ হি.) ১৩৫

৩. শায়খুল ইসলাম ইমাম জাহিদ কাউসারি (১৩৭১ হি.) ১৩৫

পাঁচ. ওয়াহাবিদের রদে শামি উলামায়ে কিরাম ১৩৬

১. ইমাম ইবনু আবিদিন শামী (১২৫২ হি.) ১৩৬

২. ইমাম সাফফারিনি হাম্বলি (১১৮৮ হি.) ১৩৬

৩. ইমাম হাসান ইবনু উমর শাত্তি (১২৭৪ হি.) ১৩৬

৪. ইমাম ইউসুফ নাবহানি (১৩৫০ হি.) ১৩৬

ছয়. ওয়াহাবিদের রদে ইরাকি আইম্মায়ে কিরাম ১৩৮

১. শায়খ আবদুর রহমান আহদাল ১৩৮

২. ইমাম আহমাদ ইবনু আলি ১৩৮

৩. ইমাম আবদুল মুহসিন উশায়কিরি ১৩৮

৪. ইমাম আলি ইবনু আবদুহ বাগদাদি ১৩৮

৫. সাইয়িদ ইয়াসিন তবাতবায়ি ১৩৮

৬. ইমাম দাউদ ইবনু সাইয়িদ সুলায়মান বাগদাদি (১২৯৯ হি.) ১৩৮

সাত. ওয়াহাবিদের রদে তিউনিসিয়ার আইম্মায়ে কিরাম ১৩৯

১. ইতিহাসবিদ আহমাদ ইবনু আবিজ জিআফ (১২৯১ হি.) ১৩৯

২. শায়খ সালিহ কাওয়াশ (১২১৮ হি.) ১৩৯

৩. শায়খ ইসমাইল তামিমি (১২৪৮ হি.) ১৩৯

৪. শায়খ আবুল ফজল কাসিম মালিকি (১১৯০ হি.) ১৩৯

আট. ওয়াহাবিদের রদে লিবিয়া ও মাগরিবের উলামায়ে কিরাম ১৪০

১. ইমাম ইবনু গলবুন লিবি (১১৫৩ হি) ১৪০

২. ইমাম তাইয়িব ইবনু কিরান ফাসি (১২২৭ হি.) ১৪০

৩. শায়খ মাখদুম আল মাহদি (১৩৪২ হি.) ১৪০

৪. শায়খ আহমাদ ইবনু আবদুস সালাম বান্নানি (১১৬৩ হি.) ১৪০

৫. মুহাদ্দিস ফাল্লানি (১২১৮ হি.) ১৪০

www.muslimeem.com

নয়. ওয়াহাবিদের রদে উপমহাদেশীয় উলামায়ে কিরাম ১৪০
১. ইমাম শাহ আবদুল আজিজ দেহলবি (১২৩৯ হি.).....১৪০
২. ইমাম গুলাম আলি দেহলবি (১২৪০ হি.) ১৪১
৩. ইমাম শাহ আহমাদ সায়িদ (১২৭৭ হি.) ১৪১
৪. ইমাম ফজলে রাসুল বাদায়ুনি (১২৮৯ হি.) ১৪১
৫. হুসাইন আহমাদ মাদানি (১৩৭৭ হি.)..... ১৪১
একটি সন্দেহ নিরসন ১৪২
৬. খলিল আহমাদ সাহারানপুরি (১৩৪৬ হি.) ১৪২
৭. আশরাফ আলি থানবি (১৩৬২ হি.).....১৪৩
৮. আনওয়ার শাহ কাশমিরি (১৩৫২ হি.).....১৪৩
৯. আহমাদ রেজা খান বেরলবি (১৩৪০ হি.) ১৪৪
১০. আবদুল হক আকরবি (১৪০৯ হি.) ১৪৪
১১. শায়খুল আরব ওয়াল আজম দাজবি (১৪৪০ হি.)..... ১৪৪
১২. শায়খ রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি..... ১৪৪
১৩. ইমাম আবু জাফর সিদ্দিকি কুরাইশি (১৪২৩ হি.) ১৪৫
১৪. নবাব সিদ্দিক হাসান খান (১৩০৭ হি.).....১৪৬
১৫. শায়খ আবদুল হাকিম হক্কানি হাফি. ১৪৬
১৬. শায়খ নুর আহমাদ ওয়ালি জার হাফি. ১৪৬
১৭. শায়খ রুহুল আমিন বশিরহাটি (১৩৬৪ হি.) ১৪৭
১৮. দাদাহুজুর আবু বকর সিদ্দিকি কুরাইশি (১৩৫৮ হি.) ১৪৭
১৯. আবুস সাআদাত শিহাবুদ্দিন আহমাদ কুআ..... ১৪৭
২০. শায়খ হাসান মিসলিয়ার.....১৪৮
২১. শায়খ আহমাদ ইয়ার খান নায়িমি রাহ. (১৩৯১ হি.).....১৪৮
আট. ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে হাম্বলি ইমামদের পরিবার ১৪৮
পরিশিষ্ট-১ ..... ১৪৮
বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে দেশে ওয়াহাবিদের ফিতনা ও বিভৎসতার কিছু নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো, ১৪৯
ওয়াহাবিদের কবলে আফগানিস্তান ১৪৯
ওয়াহাবিদের কবলে আলজেরিয়া.....১৫২
ওয়াহাবিদের কবলে লিবিয়া ১৫৩
ওয়াহাবিদের কবলে সোমালিয়া.....১৫৪
পরিশিষ্ট-২.....১৫৬
মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব সম্পর্কে উলামায়ে দেওবন্দের মুল্যায়ন - হযরত মাওলানা মানযুর নোমানীর বক্তব্য পর্যালোচনা ১৫৬
মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী (১২০৬ হি.) সম্পর্কে উলামায়ে দেওবন্দের অবস্থান : ১৫৬
আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমীরি (১৩৫২ হি.): ১৫৮
শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (১৩৭৭ হি.): .. ১৫৯

www.muslimeem.com

বিস্তারিত সূচী

মুফতী মাহমুদ হাসান গাংগুহী (১৪১৭ হি.): ১৫৯
দারুল উলুম হক্কানিয়ার ফতোয়া: ১৫৯
হযরত মাদানীর অবস্থান সম্পর্কে মানযুর নোমানীর বক্তব্য ১৬৩
আল্লামা কাশ্মীরির অবস্থান সম্পর্কে হযরত মাওলানা মানযুরর নোমানীর বক্তব্য ১৬৪
মাওলানা মানযুর নোমানীর আলোচনার সারকথা ১৬৫
দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েবসাইটের একটি ফতওয়া ১৬৫
সারকথা: ১৬৬
তথ্যসূত্র ১৬৬

www.muslimeen.com

প্রাককথন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কথা। জাজিরাতুল আরবে অবস্থিত নজদের বুকে ঘটে গেল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি এক বিপ্লবের জন্ম দেন, যা মুসলিমবিশ্বের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির নামানুসারে আন্দোলনের নামকরণ করা হয় ওয়াহাবি বিপ্লব এবং তাঁর অনুসারীদের বলা হয় ওয়াহাবি।

ওয়াহাবিদের ব্যাপারে মুসলিমবিশ্বে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে, ওয়াহাবি বিপ্লব হলো একটি তাজদিদি বা সংস্কারমূলক আন্দোলন। তাঁরা মনে করেন, নজদির আবির্ভাবের আগে আরবজগৎ শিরক ও কুফুরের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। নজদি আরবের বুক থেকে সেগুলো উৎখাত করে বিশুদ্ধ তাওহিদের ওপর আরবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরা তাঁকে মুজাদ্দিদ মনে করেন।

কেউ কেউ বলেন, নজদি ও তাঁর অনুসারীরা দীনের মধ্যে বিকৃতি ঘটিয়েছেন এবং তাওহিদ, কুফুর, শিরক ও বিদআতে বিকৃতি ঘটিয়ে পবিত্র হিজাজের মুসলিমদের তাকফির ও তাবদি করে গণহত্যা করেন।

ওয়াহাবিদের বিষয়ে এ মতভেদের একটি প্রধান কারণ হলো, ওয়াহাবিদের ইতিহাসের ওপর গবেষণা ও লেখা ইতিহাসগ্রন্থের অপ্রতুলতা। পাঠকমহলেও এ মতবাদ নিয়ে কৌতূহলের অন্ত নেই। এসব দিক বিবেচনা করে পাঠকদের হাতে এ ক্ষুদ্র উপহারটি তুলে দেওয়ার অবতারণা।

এ বইটি আমি দুই পর্বে ভাগ করেছি। প্রথম পর্বে নজদের ইতিহাস ও নজদির সময় থেকে সৌদিআরব প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ওয়াহাবিদের ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করেছি। দ্বিতীয় পর্বে ওয়াহাবি মতাদর্শ এবং তাদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অবস্থান তুলে ধরেছি।

প্রতিটি তথ্য যাতে নির্ভরযোগ্য হয়, এ জন্য নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়েছি। পাশাপাশি ওয়াহাবি মতাদর্শ বিরোধী ইমাম এবং ঐতিহাসিকগণের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহাবিদের থেকেও দলিল পেশ করেছি। আশাকরি বইটি পাঠককে ওয়াহাবিদের ব্যাপারে একটি পরিপূর্ণ ধারণা পেতে সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ। এতেই আমার স্বার্থকতা।

পরিশেষে বইটি লেখার কাজে যারা আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন, পাশে থেকেছেন—বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় শাইখুনা আবু বকর তাওহিদ হাফিজ্বাহুল্লাহ, মাগুরার আনোয়ারুল উলুম সিদ্দিকিয়া হামিদিয়া দাওরায় হাদিস মাদ্রাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও মুফতি শাইখুনা মনিরুল ইসলাম হাফিজ্বাহুল্লাহ, শাইখুনা ইজহারুল ইসলাম কাওসারি হাফিজ্বাহুল্লাহ, শাইখুনা মুহাম্মাদ বিন তাইয়িব হাফিজ্বাহুল্লাহ, শাইখুনা আফফান বিন শরফুদ্দিন হাফিজ্বাহুল্লাহ এবং অন্য যাদের দুআ ও সহায়তা ছাড়া আমি কাজটি সম্পন্ন করতে পারতাম না, তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরম প্রেমাস্পদের একান্ত দাসানুদাস
ইয়াসির আরাফাত আল হিন্দি

www.muslimdm.com

প্রথম অধ্যায়

নজদের ইতিবৃত্ত

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিমজাহানের প্রাণকেন্দ্র জাজিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপের 'নজদ' অঞ্চলে ঘটে যায় এক ঐতিহাসিক বিপ্লব, যা পরবর্তী সময়ে মুসলিমবিশ্ব, বিশেষ করে আরব উপদ্বীপের মুসলিমদের ওপর সুদূপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ওই সময়টি ছিল, বিশ্ব-ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। খিলাফতসমূহের অন্যতম—উসমানি খিলাফতের সূর্য তখন প্রায় ছয় শতাব্দীব্যাপী সগৌরবে কিরণ ছড়ানোর পর ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিল। ক্রমশ নুয়ে পড়ছিল প্রায় হাজার বছরের ইসলামি খিলাফত ও সভ্যতার গৌরবময় মিনার। সাম্রাজ্যের ভেতরে-বাইরে চলছিল গভীর ষড়যন্ত্র। চলছিল উসমানি খিলাফতের মজবুত প্রাসাদটি ভেঙে ফেলার গোপন পরিকল্পনা। একই সঙ্গে চলছিল ইসলামি বিশ্বব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার মহার্ঘ আয়োজন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইউরোপে ঘটে যাওয়া শিল্পবিপ্লব আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে, পরিবর্তন আনে ইউরোপীয় রাজনীতিতে। এতদিন যারা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর দুর্নীতির অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, শিল্পবিপ্লবের ফলে এখন তারা নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করল। ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের বিষয়টি ছিল অত্যন্ত নাটকীয়। ইতিহাসবিদ কার্লো সিপোল্লার ভাষায়, 'কোনো বিপ্লবই শিল্পবিপ্লবের মতো নাটকীয় ছিল না।'[৭]

৭. আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস, জীবন মুখোপাধ্যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের (১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ) ফলে কৃষি ও বাণিজ্যব্যবস্থা থেকে শুরু করে সব স্তরে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সমুদ্রযাত্রা বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের পথ খুলে দেয়। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয়রা প্রযুক্তির দিক দিয়ে অন্যদের থেকে এগিয়ে যেতে শুরু করে। এ সময় তারা নতুন করে বিশ্ব শাসনের ইচ্ছা পোষণ করতে থাকে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো পুরো বিশ্বের ওপর একচ্ছত্র প্রভাব ও কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে; কিন্তু তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় উসমানি খিলাফত ও ইসলাম। উসমানি খিলাফতের বিশালতা, ঐক্য ও নির্ভিকতা তাদের সর্বদা আতঙ্কিত করে রেখেছিল। সে কারণে তারা ইসলাম ও উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়; কিন্তু উসমানিদের ঐক্য তাদের হতাশ করতে থাকে। তখন এক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রতিনিধি ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সে পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে বলেছিল, 'ইউরোপকে মনে রাখতে হবে, কুরআন যতদিন মুসলিমদের দিকনির্দেশক হয়ে থাকবে, আমরা ততদিন তাদের দেশসমূহে ঔপনিবেশিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারব না।' ফলে পশ্চিমারা মুসলিম সাম্রাজ্য, ইসলাম এবং সর্বোপরি মুসলিমদের ঐক্যের বিনাশ কীভাবে ঘটানো যায়, সে উপায় খুঁজতে থাকে। তারা বুঝে নেয়, মুসলিমদের ঐক্য ধ্বংস আর উসমানিদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য নষ্ট করতে না পারলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ওপর থেকে তাদের কর্তৃত্ব খর্ব করা সম্ভব নয়। এ ভাবনার সিঁড়ি বেয়েই মুসলিমদের ঐক্য ধ্বংস করতে তারা 'ডিভাইড এন্ড রুল' পলিসি প্রয়োগ করে।

এ পলিসির মাধ্যমে উসমানি খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ও যুদ্ধের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। ফলে একদিকে বলকান অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। (রাশিয়া ও পশ্চিমাদের উসকানিতে এ অঞ্চলে যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয়, ইতিহাসে তা 'পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যা' বা The Eastern Question নামে পরিচিত।) অপরদিকে উসমানিদের আরবিয় 'ওলাআত' বা প্রদেশগুলোতে জাতীয়তাবাদীদের উৎপাত ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে মুহাম্মাদ আলি পাশার ক্ষমতায়নের পর মিশরিয় শাসননীতিতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার আনেন। এ সময় মিশর খিলাফত থেকে অনেকটা স্বাধীন হয়ে পড়ে। স্বল্পদিনে মিসর হয়ে ওঠে উসমানিবিরোধী 'আরব জাতীয়তাবাদের' আখড়া। সেখান থেকে উগ্র-জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়তে থাকে সমগ্র আরবে।

এমন এক কঠিন সময়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নজদে উত্থান ঘটা ওয়াহাবি বিপ্লব হিজাজে উসমানি শাসনের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়। তথাকথিত তাওহিদ প্রতিষ্ঠার স্লোগান তুলে হিজাজ ও নজদে শুরু হওয়া এ বিপ্লবটি এক সময় পরিণত হয় ব্রিটিশদের হাতের পুতুল। ফলে ব্রিটিশরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে।

কোনো বিপ্লবের ইতিহাস জানতে এর উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে ধারণা রাখার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, বিপ্লবের উৎপত্তির কারণ, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের ওপর উৎপত্তিস্থলের বড় প্রভাব থাকে। সে ক্ষেত্রে উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে না জানলে—জানাটা অপূর্ণ থেকে যায়। কাজেই ওয়াহাবি বিপ্লবের ইতিহাস জানতে এর উৎপত্তিস্থল নজদ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখা জরুরি। এ অধ্যায়ে আমরা নজদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরব।

আরব উপদ্বীপ হলো, ইসলামের নবি ও রাসুল মুহাম্মাদ সাঃ-এর জন্মভূমি। ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আরবের প্রাণকেন্দ্র মক্কার বুকে যে নুরের স্ফুরণ ঘটে, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তা ছড়িয়ে পড়ে দিগ্‌দিগন্তে। সে নুরের স্পর্শে বর্বর, হিংস্র একটি জাতি চরিত্র ও সভ্যতায় হয়ে ওঠে অনন্য। একপর্যায়ে তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত বিজয়ের মাধ্যমে এমন একটি সাম্রাজ্যের জন্ম দিয়েছিল, যা প্রথম সহস্রাব্দের শেষ ভাগ থেকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষ ভাগ পর্যন্ত হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, জ্বালিয়েছিল শিক্ষা ও সভ্যতার দীপ্ত মশাল। ইতিহাসে এ সভ্যতাটি ইসলামি সভ্যতা নামে পরিচিত।

ইসলামের এ স্বর্ণালী সভ্যতার কথা বলতে গিয়ে ইতিহাসবিদ ফিলিপ কে. হিট্টি বলেছেন, 'মধ্যযুগে আরব ও আরবি বলা মানুষেরা মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে যে ভূমিকা পালন করেছিল, অন্য কেউ তা পারেনি।'[৮]

পশ্চিম ইউরোপ থেকে শুরু করে পূর্বে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াজুড়ে সুবিস্তৃত ইসলামি সাম্রাজ্য জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, প্রযুক্তিসহ সব ক্ষেত্রেই বিশ্বকে সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছে দেয়; যার কাছে রোম, ব্যাবিলন, গ্রিক, ভারত এবং পারসিক সভ্যতাও ম্লান হয়ে যায়। এ সোনালি সভ্যতার বিকাশ এবং বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আরব বীরদের চূড়ান্ত সাফল্যের পেছনে যেসব বিষয় মুখ্য ভূমিকা পালন করে, তার একটি হলো রাজনৈতিক পারদর্শিতা। এ সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে মানুষ চাকরি, শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞান আহরণের জন্য পাড়ি দিত মদিনা, দামেশক, বাগদাদ,

৮. History of the Arabs by Phillip K Hitti, pg. 4

কর্ডোভা, বুখারা, ইসফাহান ও ইসতাম্বুলের মতো জ্ঞান-নগরীগুলোতে। মুসলিম সাম্রাজ্যে অমুসলিমদের জন্য ছিল অবাধ স্বাধীনতা। অন্যদিকে অমুসলিম শাসিত রাষ্ট্রসমূহ থেকে নিরাপত্তার অভাবে মুসলিম খিলাফতে পালিয়ে আসত অমুসলিমরা।

ভারতীয় ইতিহাসবিদ সতীশচন্দ্র মুসলিম খিলাফতে অমুসলিমদের অবাধ স্বাধীনতার বিষয়ে সুন্দর লিখেছেন, 'শাসনকার্য সম্পাদনের জন্য মুসলিম খলিফারা ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানদের মতো অমুসলিম ও অনারব বিশেষত ইরানিদের—যাদের অধিকাংশই ছিল জরাথ্রুস্টবাদী ও বৌদ্ধ—নিয়োগ দিতে কোনো প্রকার দ্বিধা করতেন না। আব্বাসি খলিফারা ধর্মভীরু মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সব ক্ষেত্রে অমুসলিম ও অনারবদের শিক্ষার জন্য খিলাফতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, যতক্ষণ-না তারা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াত। বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ ইসলামি খিলাফতে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করত এবং যেখানে চাইত সেখানে বসবাস করতে পারত। ওই সময় এমন স্বাধীনতা চার্চের কঠোর আচরণের জন্য ইউরোপেও মেলা ভার ছিল।'[৯]

মধ্যযুগীয় আরবি সভ্যতা নিয়ে বিষদ আলোচনা ইসলামের ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। যাইহোক, এ মহান ইসলামি সভ্যতার জন্মদাতা আরবদের পরিচয় আমাদের জেনে রাখা দরকার। জাতিগতভাবে আরবরা হলো, সামীয় (Semetic) জাতিগোষ্ঠীর একটি শাখা। সেমেটিক বলা হয়, নুহ আ.-এর ছেলে সাম ইবনু নুহের বংশধরদের। এরা যে ভাষায় কথা বলত, তা সামীয় ভাষাগোষ্ঠী নামে পরিচিত।

আরবি জাতিগোষ্ঠীকে ইতিহাসবিদ ও কুলাচার্যরা (Genealogists) প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো, বায়িদা, আরিবা এবং মুসতারিবা। এ তিন ভাগের উৎপত্তি নুহ আ.-এর ছেলে সামের বংশ থেকে। বায়িদা বা আল-আরবুল বায়িদা বলা হয়, ওই সমস্ত আরব জাতিকে, যারা ধরাবক্ষে রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর আগমনের আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বায়িদ শব্দটির অর্থ হলো ধ্বংসপ্রাপ্ত। এরা যেহেতু আল্লাহর আজাব বা অন্যান্য কারণে ধ্বংস বা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই এদের বলা হয়, আল-আরবুল বায়িদা। এদের মধ্যে রয়েছে, আদ, সামুদ, আমালেক, জিদ্দিস, তাসম প্রভৃতি। আদ ও সামুদের নাম দুটি ইতিহাসে বিখ্যাত। সামুদ হলো, খোদাদ্রোহী একটি জাতি, যারা আল্লাহর আজাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল; যাদের বর্ণনা পবিত্র কুরআনে এসেছে। সালিহ আ.-এর আদেশ অস্বীকার করাতে এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। আর আদ জাতি ধ্বংস হয়েছিল হুদ আ.-এর আদেশ অমান্য করার কারণে। সম্ভবত প্রাচীন হাজারামাউত ছিল এদের প্রাণকেন্দ্র। আমালেকার বর্ণনা পবিত্র কুরআন ও বাইবেলে এসেছে। তাফসির ও বাইবেল থেকে জানা যায়, আল্লাহর অবাধ্য এ শক্তিশালী জাতিকে ইউশা ইবনু নুন (Jousha) ও কালিব আ. পরাস্ত করেছিলেন।

দ্বিতীয় প্রকার হলো, আল-আরবুল আরিবা, এরা হলো খাঁটি আরব। আরিবা বলা হয় মূলত দক্ষিণ ইয়ামেনের কাহতানিদের। এরা প্রাচীন যুগ থেকে আরব উপদ্বীপের বুকে বসবাস করে আসছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, কাহতানি বংশের ইয়ারুব ইবনু কাহতানের নামানুসারে আরবিয়দের ভাষাকে আরবি নামকরণ করা হয়। ইয়ারুবকে আবুল আরব বা আরবদের পিতাও বলা হয়ে থাকে। পরবর্তী সময়ে এরা হিমইয়ার ও কাহলান নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এরপর এদের থেকে আরও শাখা-প্রশাখার জন্ম হয়।

তৃতীয় প্রকার হলো মুসতারিবা। এরা ছিল নুহ আ.-এর প্রপৌত্র সালিহ বা সালিখের ছেলে আবিরের (Eber) বংশধর। বিভিন্ন জায়গা থেকে এরা আরবে আসে এবং নিজেদের আরবিকরণের মাধ্যমে, আরবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে বিধায় এদের মুসতারিবা নামে নামকরণ করা হয়। উত্তরের হিজাজ ও নজদজুড়ে ছিল এদের বসবাস।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ইয়ামেন হলো খাঁটি আরবদের দেশ। ইয়ারুব ইবনু কাহতান থেকে যে বংশধারা পরবর্তীকালে বিকশিত হয়, তা কাহতানি নামে পরিচিত। আর উত্তর-আরবরা অর্থাৎ, মুসতারিবা আরবরা পরিচিত আদনানি নামে, যা বংশপরম্পরায় ইবরাহিম আ.-এর ছেলে ইসমাইল আ. পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ আদনানিদের মধ্য থেকে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন সাইয়িদুনা রাসুলুল্লাহ সা.।

৯. A History of Mediaeval India by Satish Chandra : 6/8

ভৌগোলিক তথ্য ও উপাত্তের নিরিখে জাজিরাতুল আরবকে ভূতত্ত্ববিদরা প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেছেন, আন-নুফুদ, আদ-দাহনা ও আল-হাররা। উত্তর-আরবে সুবিস্তীর্ণ ঈষৎ রক্তিম ও শ্বেতবর্ণের যে বালুকাসিন্ধু রয়েছে, তা আন-নুফুদ নামে পরিচিত। প্রায় ১ লাখ ৩ হাজার ৬০০ কিলোমিটার বিস্তৃত এ মরুসমুদ্রের চারিদিকে বালু ও মরীচিকায় পূর্ণ। মাঝেমধ্যে সেখানে দেখা যায় মরুসিংহের আনাগোনা। মেঘলা দিন, মহাকবি লাবিদের দাক্কুর রাওয়ায়িদ (মেঘগর্জনের ঘনঘটা), রিহাম (ঝিরঝিরে বৃষ্টি) অথবা জাওদের (ঝমঝমে বৃষ্টি) বিলাসিতা সেখানে দেখা যায় না। বছরে একবার বা দুবার বৃষ্টি তার মুখ দেখায়। নুফুদের চারদিকে ধু-ধু করা বালি ও ক্যাকটাসগাছ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তবে মাঝেমধ্যে রয়েছে মরূদ্যান; যেখানে খেজুর, সবজি, বার্লি প্রভৃতির চাষবাস হয়।

উত্তরে আন-নুফুদ থেকে দক্ষিণে আর-রাবুল খালির সীমান্ত পর্যন্ত বালুকাময় অঞ্চলটি আদ-দাহনা নামে পরিচিত। প্রায় হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত এ এলাকাটি আল-আহসা প্রদেশ ও নজদের মধ্যে বিভক্তিরেখা হিসেবে বিরাজ করছে। মরুভূমির মাঝেমধ্যে পাওয়া যায় এবড়োখেবড়ো গভীর খাদ। এ খাদগুলোর কিছু কিছুকে আরবরা কুয়া হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এ ছাড়া তরঙ্গায়িত লাভাময় অঞ্চলটি আল-হাররা নামে পরিচিত।

এ বিশাল মরু অঞ্চলের একপ্রান্তে অবস্থিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নজদ, যাকে ওয়াহাবিভূমিও বলা হয়ে থাকে। চুনাপাথরময় নজদের চারিদিকে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে মরুখণ্ড। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামি সাহিত্যের (Semetic Literature) স্বনামধন্য অধ্যাপক ফিলিপ কে. হিট্টি নজদের ব্যাপারে লেখেন,

> Within this ring of desert and steppe lies an elavated core, Nejd, the Wahhabiland. In Nejd the limestone has long been generally exposed; here and there are occasional strips of sand.[১০]

নজদ অঞ্চলটি জাজিরাতুল আরবের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে গঠিত। নজদ বলতে ঠিক কোন অঞ্চলটিকে বোঝানো হয়, এ নিয়ে ইতিহাসবিদদের বিস্তর মতভেদ রয়েছে। কারও মতে নজদ হলো, ইয়ামামা, যে অঞ্চলটি সৌদিআরব ও ইয়ামেন সীমান্তে বর্তমানে নজদ নামে পরিচিত, তা-ই নজদ। আবার কেউ বলেন, ইরাককে নজদ বলা হয়। তবে সঠিক এবং প্রণিধানযোগ্য মত হলো, **সুদূর হিজাজ প্রদেশের সীমান্ত থেকে ইরাক এবং ইয়ামেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত উচ্চভূমি হাজবাতু নজদ বা নজদ উচ্চভূমি নামে পরিচিত।** ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে নজদকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। পূর্ব নজদকে বলা হয়, নিম্ন নজদ বা নজদুস সুফলা এবং পশ্চিম নজদকে বলা হয়, উচ্চ নজদ বা নজদুল উলয়া।

প্রখ্যাত ইরাকি ভাষাতত্ত্ববিদ ইবনুল আরাবি রাহ. নজদের সীমানা নির্ণয়পূর্বক বলেন, 'নজদ হলো, দুটি নামের সমষ্টি—উচ্চ নজদ ও নিম্ন নজদ। নিম্ন নজদ হলো, ইরাকের কাছে স্থ অঞ্চলের নাম এবং উচ্চ নজদ হলো, হিজাজ ও তিহামার নিকটবর্তী অঞ্চলের নাম।'[১১]

আরেক ভাষাতত্ত্ববিদ আসমায়ি রাহ. বলেন, 'আপনি যদি বসরা প্রান্তস্থ আজলাজে পৌঁছে যান, তাহলে ধরে নেবেন নজদে পৌঁছেছেন। আর কুফা প্রান্তস্থ সামিরা ইত্যাদি অঞ্চলে পৌঁছুলে ধরে নেবেন নজদে পৌঁছেছেন।'

বিশিষ্ট গবেষক জুহানির আলোচনা থেকেও নজদ সম্পর্কে এ ধারণাটি পরিস্ফুট হয়। তিনি বলেন, 'বিশেষজ্ঞরা নজদকে দুভাবে ভাগ করেছেন, পশ্চিম অংশ, যা স্থানগতভাবে আলিয়াতু নজদ (বা উচ্চ নজদ) নামে পরিচিত; আর পূর্ব নজদ, যেটা স্থানগতভাবে সাফিলাতু নজদ (বা নিম্ন নজদ) নামে পরিচিত।'[১২]

ইবনু খালদুনও তাঁর গ্রন্থে এমন মত দিয়েছেন। মোটকথা, নজদ বলতে বোঝায় ইরাকের বসরা থেকে হিজাজ এবং সিরিয়া থেকে ইয়ামেন পর্যন্ত বিস্তৃত উচ্চভূমিকে।

---

১০. History of the Arabs by Phillip K Hitti : 17

১১. বিলাদুল আরব, ইমাম ইসফাহানি : ৩৩৬।

১২. দ্য হিস্ট্রি অব নজদ : ৪৮।

নিম্ন নজদ বা নাজদুস সুফলার মধ্যে পড়ে ঐতিহাসিক আল-ইয়ামামা; যেখান থেকে ইসলামি সভ্যতার সূচনালগ্নে মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তী সময়ে এ অঞ্চল থেকে একাধিক খারিজি দলও মাথাচাড়া দেয়। আলোচ্য ওয়াহাবি মতবাদেরও অভ্যুদয় ঘটে এখান থেকেই।

ইয়ামামার ইতিহাস সুপ্রাচীন হলেও ততটা সমৃদ্ধ নয়। ঐতিহাসিক ভাষ্যে জানা যায়, প্রাচীন যুগ থেকে ইয়ামামা ছিল জাজিরাতুল আরবের সব থেকে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাসমূহের একটি।

জাহিলি যুগে অথবা তারও আগে নজদে প্রধানত দুটি গোত্রের বসবাস ছিল—তাসম ও জিদ্দিস। সাম্প্রতিক গবেষণামতে গোত্র দুটি পরবর্তী সময়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় বিধায় তাদের বায়িদা গোত্রসমূহে গণ্য করা হয়। এ গোত্র দুটি পেশায় ছিল রাজমিস্ত্রি ও কৃষক। কথিত আছে, এরা সর্বদা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল এবং এ দ্বন্দ্বই এক সময় তাদের ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে। আনুমানিক ৫০০ শতাব্দীতে জনৈক হিমইয়ারি (Himyarite) রাজা ইয়ামামায় আক্রমণ করেন। ফলে অন্যদের মতো তাসম আর জিদ্দিসও বিধ্বস্ত হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ইয়ামামায় বনু হানিফা, বনু আফলাজ, বনু তামিম প্রভৃতি গোত্রের বসবাস ছিল। ইসলামি যুগের প্রায় দুই শতাব্দী আগে হিজাজ, উচ্চ নজদ অঞ্চল থেকে বনু ওয়াইল ও বনু বকর নামের বড় দুটি গোত্র ইয়ামামা ও বাহরাইনে হিজরত করে। একসময়কার তাসম ও জিদ্দিসদের নীড় ইয়ামামার সমৃদ্ধ অঞ্চলে গড়ে ওঠে এদের কেল্লা। পরে এ দুই গোত্র থেকে উৎপত্তি ঘটে বনু হানিফা, বনু ইয়াশকুর, বনু সালাবাসহ বহু গোত্র-উপগোত্রের। ইয়ামামার দক্ষিণ অঞ্চলটি ছিল চাষ-উপযোগী। সেখানকার কিছু এলাকার অধিবাসীদের বংশানুক্রমিক মূল পর্যন্ত পৌঁছায়নি বিধায় এসব এলাকাকে আফলাজ; আর এর অধিবাসীদের বনু আফলাজ বলা হয়। পরবর্তী সময়ে এদের থেকে বনু কাব, বনু উকাইলসহ বহু গোত্র-উপগোত্র আরবের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

ইয়ামামা অঞ্চলের পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে ছিল বিখ্যাত তামিম গোত্রের বসবাস। এ ছাড়া সাদির, আল-ওয়াশম এবং দক্ষিণপূর্ব আল-কাসিম এলাকাতেও তাদের বসবাস ছিল। বনু তামিম বিষয়ে হাদিসে সতর্কবাণী এসেছে। হাদিসের বর্ণনায় এ গোত্র থেকে খারিজিদের উদ্ভবের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ সাঃ একজন তামিমি সম্পর্কে বলেছিলেন,

> ...ওকে যেতে দাও। তার কিছু সঙ্গী-সাথি রয়েছে—তোমাদের কেউ তাদের সালাতের তুলনায় নিজের সালাত এবং তাদের সিয়ামের তুলনায় নিজের সিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে; কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালির নিম্নদেশে (হৃদয়ে) প্রবেশ করবে না। তারা দীন থেকে এত দ্রুত বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়...।[১৩]

খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর যুগে সংঘটিত রিদ্দার যুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর বিপক্ষে মুরতাদবাহিনীর হয়ে বনু তামিম মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, ওয়াহাবি মতাদর্শের জনক ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদিসহ একাধিক খারিজি নেতা বনু তামিম থেকেই আবির্ভূত হন। অবশ্য নজদির তামিমি হওয়া নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে তিনি আরবের বনু তামিম গোত্র থেকে উদ্ভূত হয়েছেন, আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁকে তুর্কির বুরসা নগরীর এক ইয়াহুদি বংশোদ্ভূত তামিম নামক ব্যক্তির বংশধর হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার দিকে নিসবত করে তাঁকে তামিমি বলা হয়।

প্রথম ইসলামি যুগে ইয়ামামায় সর্বাধিক প্রভাব ছিল বনু হানিফার; কিন্তু ১১ হিজরিতে সংঘটিত রিদ্দার যুদ্ধে বনু হানিফা খিলাফতের বিরুদ্ধে শত্রুদের হয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সে যুদ্ধে চরমভাবে পর্যুদস্ত হলে তাদের ক্ষমতায় ভাটা আসে এবং ইয়ামামায় তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। নজদ ও ইয়ামামা খিলাফতের অধীনে আসার পর রাজনৈতিক অঙ্গনেও তারা ব্রাত্য হয়ে পড়ে; কিন্তু বনু হানিফা তাদের পরাজয়ের গ্লানি সহজে ভুলতে পারেনি।

আমিরুল মুমিনিন মুআবিয়া রা.-এর ইনতিকালের পর খিলাফতে রাজনৈতিক যে অস্থিরতা ও ডামাডোল শুরু হয়, এর সদ্ব্যবহার করে বনু হানিফার নাজদা ইবনু আমির হানাফি খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বনু হানিফার দিকে সম্বন্ধ করে তাকে হানাফি বলা হতো। সে

১৩. সহিহ বুখারি : ৩৬১০; সহিহ মুসলিম : ১০৬৪।

ছিল নাজদাত নামক খারিজি দলের নেতা। আনুমানিক ৬৪ হিজরির দিকে সে ইয়ামামাবাসী ও বনু হানিফাকে তার আনুগত্যে রাজি করায়। এরপর তথাকথিত তাওহিদ প্রতিষ্ঠার নামে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। একে একে আফলাজ, বাহরাইন, ওমান, ইয়ামেন, হাজরামাউতসহ বিভিন্ন এলাকায় সে অভিযান চালায় এবং সেসব জায়গায় তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এমনকি পবিত্র আরাফাতের ময়দানে নাজদাতের পতাকা উড্ডীন হয়; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উমাইয়া শাসক এদের বিদ্রোহ দমাতে উদ্যত হলে তাদের তৎপরতায় ভাটা আসে। ৭২ হিজরিতে নাজদা হানাফিকে তারই অনুসারী আবু ফুদাইক হত্যা করে। পরবর্তী বছর উমাইয়া সেনাবাহিনী বনু হানিফার ওপর আক্রমণ করে আবু ফুদাইককে হত্যা করে। ফলে নাজদাত বিপ্লবের সলিলসমাধি ঘটে।

এরপর খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান নজদে উমাইয়া শাসন মজবুত করার লক্ষ্যে প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তি ইবরাহিম ইবনুল আরাবি কিনানিকে ইয়ামামার শাসক নিযুক্ত করেন। ইবনুল আরাবি কঠোরভাবে বিদ্রোহীদের দমন করেন। এমনকি সেখানে বিদ্রোহী ও চোরদের জন্য একটি কারাগারও নির্মাণ করেন।

আব্বাসি খিলাফতের যুগ ছিল ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগ। এ যুগ অন্যান্য অঞ্চলের মতো নজদে বিশেষত ইয়ামামার ইতিহাসেও উন্নয়ন ও বিকাশের যুগ ছিল। আব্বাসিরা ক্ষমতায় এসে হাশিমি বংশের সিররি ইবনু আবদুহ হাশিমিকে নজদে পাঠায়। ইবনু আবদুল্লাহ ছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসক। তাঁর ক্ষমতায়ন এবং নজদে আব্বাসিদের শাসন কায়িমের পর থেকে দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত সেখানে তেমন কোনো বিদ্রোহ বা আপদের উৎপত্তি ঘটেনি।

তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর প্রথমার্ধে নজদে বনু নামির গোত্র আব্বাসিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। ফলে আব্বাসি খলিফা ওয়াসিকবিল্লাহ বিদ্রোহ দমাতে দুর্ধর্ষ তুর্কি বীর বুগা কাবিরকে সেখানে পাঠান। ২২৭ থেকে ২৩২ হিজরি পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর যুদ্ধের পর নজদি বিদ্রোহীদের তিনি সফলভাবে দমন করেন। বুগা কাবিরের আক্রমণ ছিল নজদে আব্বাসিদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার সর্বশেষ প্রচেষ্টা।

বুগা কাবিরের আক্রমণের পর ২৫২ হিজরিতে মুহাম্মাদ উখাইজির আব্বাসিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নজদের শাসনক্ষমতা দখল করে নেয়। এরপর দীর্ঘ বছর ধরে বনু আমির, বনু স্ব'স্বয়া, বনু লাম, জাবারিরা একে একে নজদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

আব্বাসিদের পতনের পর নজদ উসমানি খিলাফতের দখলে চলে যায়। উসমানিরা সুদীর্ঘকাল নজদকে শান্তি ও নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে রাখে। উসমানিদের শাসন ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে নজদের চিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। খিলাফতের অধীনে আসার পর থেকে নজদ হয়ে ওঠে আলিম ও অলিদের প্রাণকেন্দ্র। বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিলেও তা সেখানকার জ্ঞানপ্রদীপগুলোকে নেভাতে পারেনি। নজদে ইসলাম আগমনের পর থেকে সেখানকার আলিমরা মানুষদের মধ্যে ইসলামি জ্ঞানসুধা বিলাতে থাকেন। নজদ ছিল মূলত হাম্বলি মাজহাব প্রভাবিত অঞ্চল। তারা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের অনুসরণ করত। নজদি আলিমদের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন পার্শ্ববর্তী শামি (সিরিয়) ও মিসরি আলিমরা। জ্ঞানাহরণের জন্য নজদ থেকে আলিম ও তালিবুল ইলমরা বিভিন্ন দেশে সফর করতেন। বিশেষ করে সিরিয়া ও মিসর হয় তাদের ইলমি সফরের তীর্থস্থান। সেখানকার বিদগ্ধ আলিম ও ইমামদের সান্নিধ্যে থেকে নজদিরা ইলম চর্চা করতেন। দশম থেকে দ্বাদশ হিজরির বিখ্যাত নজদি ইমামদের অন্যতম হলেন আহমাদ আসকারি, মুসা হাজ্জাবি, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুশরিফ, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল, আহমাদ ইবনু বাসসাম, মুহাম্মাদ বুসাইরি, আহমাদ মানকুর প্রমূখ।

ওয়াহাবিদের উত্থানপূর্বে নজদ ছিল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের একটি স্বর্গোদ্যান। আলিম ও অলিদের পদধূলিতে ধন্য এ ভূমি ছিল জ্ঞানতাপসদের মিলনস্থল। ওয়াশমের উশাইকির (الأشيقر), আরিজের মুকরিন ও আইনিয়া ছিল নজদের জ্ঞানের তীর্থক্ষেত্রসমূহের অন্যতম। এসব স্থানে সে যুগের স্বনামধন্য ইমামদের বসবাস ছিল। ওয়াহাবিদের উত্থানের আগে অর্থাৎ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে নজদের স্বনামধন্য ২৮ জন ইমামের ১৫ জন ছিলেন উশাইকির অঞ্চলের। তাঁরা নজদজুড়ে দীনের খিদমাতে নিজেদের উৎসর্গ করেন। এদের মধ্যে অন্যতম দুজন ইমাম হলেন, আহমাদ ইবনু বাসসাম এবং সুলায়মান ইবনু আলি। তাঁরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দীনের দাওয়াত দিতে দিতে একসময় উয়ায়নাতে এসে বসবাস শুরু করেন। নজদি আলিমরা ফিকহ, তাফসির, হাদিসসহ শরিয়তের প্রতিটি বিভাগে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

একই সঙ্গে তাঁরা ছিলেন বিদআত ও খোরাফাতের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। বিদআতে লিপ্ত না হতে মানুষকে বিশুদ্ধ দীনের শিক্ষা দিতেন।

নজদি মানুষের সঙ্গে আলিমদের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার বন্ধনে তাঁরা আবদ্ধ ছিলেন। সেখানকার আলিমরা ফিকহ ও বিচারকার্য শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। নজদে ওয়াহাবিদের উত্থানের ঠিক আগের একটি হিসাব অনুযায়ী সেখানকার বিখ্যাত মোট ৯৫ জন আলিমের ৬৫ জনই ছিলেন কাজি। হিজাজসহ অন্যান্য আরবি আলিমদের মতো তখনকার নজদি আলিমরা ছিলেন উম্মাহর প্রহরীস্বরূপ। ওয়াহাবি এবং পরবর্তীকালের কিছু ইতিহাসবিদ ওয়াহাবিদের রচনার ওপর ভিত্তি করে বলে থাকেন, ওয়াহাবিদের উত্থানপূর্বে নজদে শিরক ও বিদআতের প্রসার ঘটেছিল। এ বক্তব্য আদৌও ঠিক নয়। কারণ, ওয়াহাবিপূর্ব নজদ ছিল আহলুস সুন্নাতের একটি ইলমি মারকাজ। সেখানকার আলিমরা শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে ছিলেন সদা সোচ্চার।

এ পর্যন্ত আমরা নজদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইতিহাসের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করলাম। আশাকরি পাঠকমণ্ডলী নজদ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা অর্জন করেছেন।

একাধিক হাদিসে প্রিয় হাবিব সাঃ এ ঐতিহ্যবাহী নজদের বিষয়ে উম্মতে মুসলিমাকে সতর্ক করেছেন। এ অঞ্চল থেকে ফিতনা-ফাসাদ প্রকাশ পাওয়া এবং সেখান থেকে খারিজিদের উত্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিভিন্ন হাদিসে। যেমন : একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

> পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে; কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারা আর দীনের মধ্যে ফিরে আসবে না, যেমনভাবে ধনুক ছিলায় ফিরে আসে না। জিজ্ঞেস করা হলো, তাদের আলামত কী? নবিজি বললেন, 'তাদের আলামত হচ্ছে মাথা মুণ্ডন করা।'[১৪]

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে; আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেছেন,

> একবার আল্লাহর নবি সাঃ দুআ করলেন, 'আল্লাহ, আমাদের জন্য বরকত দাও শামে (সিরিয়াতে)। আল্লাহ, বরকত দাও আমাদের জন্য ইয়ামেনে।' সাহাবিরা বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আর আমাদের নজদের (ইরাকের) জন্য (দুআ করুন)?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ, আমাদের জন্য বরকত নাজিল করো শামে। আল্লাহ, আমাদের জন্য বরকত দাও ইয়ামেনে।' তারা বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমাদের নজদের মধ্যেও?' আমার ধারণা তিনি তৃতীয়বারে বললেন, 'সেখান থেকে ভূমিকম্প, ফিতনা হবে এবং শয়তানের শিং উদিত হবে।'[১৫]

> প্রিয় হাবিব সাঃ আরও বলেছেন, رأس الكفر نحو المشرق—কুফুরের শির পূর্ব দিকে। সাইয়িদ হাবিব আলাবি রাহ. একটি বর্ণনা এনেছেন, যেখানে স্থানের নাম উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে, ফিতনা নজদের ইয়ামামা অঞ্চল থেকে উদ্ভূত হবে। বর্ণনাটি এরকম :
>
> يخرج في آخر الزمان في بلد مسيلمة رجل يغير دين الاسلام
>
> শেষ জামানায় মুসায়লামার দেশে এমন একজন লোক বের হবে, যে ইসলাম পরিবর্তন করে ফেলবে।[১৬]

রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর করা ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো পরবর্তী সময়ে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমরা ইতিহাসের দিকে দৃকপাত করলে দেখব, ইসলামের প্রথম যুগ থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো খারিজি দলের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলোর উৎপত্তি অধিকাংশই নজদ থেকে। এমনকি বর্তমানে যে দায়িশি-খারিজি ফিতনার উৎপত্তি হয়েছে, সেটাও নজদ থেকে অর্থাৎ, নজদুল উলয়া থেকে। একইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওয়াহাবি মতাদর্শের জন্মও হয়েছে নজদের ইয়ামামা থেকে, যা রচনা করে খাওয়ারিজদের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম রক্তাক্ত অধ্যায়।

---

১৪. বুখারি : ৭৫৬২

১৫. বুখারি : ৭০৯৪

১৬. মিসবাহুল আনাম

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি (১২০৬ হি.)

জাজিরাতুল আরব তখন মহান উসমানি খিলাফতের অধীনে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা। এ সময় আরব ছিল মুসলিম জাহানের প্রাণকেন্দ্র। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিমরা সমবেত হতেন হিজাজ, নজদ, ইয়ামেন, শামসহ বিভিন্ন আরবি দেশে। কেউ হজ পালন করতে, কেউ জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে, আবার কেউ বাণিজ্যিক কারণে দূরদূরান্ত থেকে পাড়ি জমাতেন। এ সময় মহান মহান জ্ঞানবীর, পণ্ডিত, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, উলামা এবং আওলিয়াদের চরণধূলিতে সমগ্র আরব হয়ে উঠেছিল জ্ঞানতীর্থের প্রাণকেন্দ্র। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্ঞানতাপস শিক্ষার্থীরা জড়ো হতেন এখানকার মসজিদ ও মাদরাসাগুলোতে। উসমানি যুগে মক্তব বা কাতাতিব, মসজিদ বা জামে এবং মাদরাসা ছিল দীন শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। উসমানিদের তত্ত্বাবধানে সেগুলো পৌঁছে যায় উন্নতির শিখরে। সেকালে আরবজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিশেষ বিশেষ কিছু ইলমগাহ হলো, মাদরাসাতুন নিজামিয়া, মাদরাসাতুল মুসতানসিরিয়া, মাদরাসাতুস সুলায়মানিয়া, জামিউল হুসাইনিয়া প্রভৃতি। দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ পণ্ডিতরা এসব মাদরাসায় জ্ঞানসুধা বিতরণ করতেন।

শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি হজ পালনের জন্যও বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মুসলিমরা হিজাজে আসতেন। বিশেষ করে শাম, মিসর, ইসতাম্বুল প্রভৃতি জায়গার লোকজন হজ করতে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে মক্কার উদ্দেশে পাড়ি জমাতেন। নির্দিষ্ট আমিরের তত্ত্বাবধানে বিশাল দলবল নিয়ে তারা যাত্রা করতেন। পথমধ্যে চোর-ডাকাতের খপ্পর থেকে বাঁচতে সঙ্গে তারা 'মাহমাল' বহন করতেন। মাহমাল হলো, পবিত্র কাবার আদলে তৈরি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ঘর স্বরূপ, যা বাহনের উপর স্থাপন করা হতো। তার উপরে কাবার গিলাফের ন্যায় গিলাফ লাগানো হতো। গিলাফে সুন্দর হরফে খচিত করা হতো কুরআনের আয়াতসুধা। সেকালে এ ঘরটিকে 'মাহমাল শরিফ' বলা হতো। হাজিরা একে বাহনের পিঠে বসিয়ে নিয়ে যেতেন।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবিযুগ থেকেই মাহমালের প্রচলন ছিল। তখন মাহমাল বলতে হাওদাকে বোঝাত, যার ওপর কুরআনের আয়াত খচিত থাকত। হাওদা শব্দটি আরবি হাওদাজ শব্দ থেকে নির্গত। হাওদাজ বলতে মূলত মাহমালকেই বোঝানো হতো। মাহমাল বা হাওদাজের প্রচলন জাহিলি যুগেও ছিল। সে যুগে আরববাসীরা রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে হাওদাজ ব্যবহার করত।

নবিজির ইনতিকালের পরেও গিলাফবেষ্টিত মাহমাল প্রেরণের প্রথা প্রায় সমগ্র মুসলিমবিশ্বে চালু ছিল। খলিফা ওয়াসিকবিল্লাহর যুগ থেকে সুররা প্রেরণের প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে ফাতিমি, মামলুক, উসমানি যুগে সরকারিভাবে হারামাইন শরিফাইনে মাহমাল ও সুররা প্রেরণের প্রথা জারি হয়। বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ ও চিঠিপত্র থেকে উসমানিদের সুররা প্রেরণের প্রমাণ মেলে। উসমানি খিলাফতের সূচনালগ্ন থেকেই হারামাইনে সুররা প্রেরণের প্রথা ছিল। তুরস্কের ইসতাম্বুলের ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা 'উসমাননলি আরশিবি' (Osmanlı Arşivi) থেকে প্রাপ্ত একাধিক পত্র

থেকে জানা যায়, সুলতান বায়জিদের কাছ থেকে প্রেরিত প্রথম সুররাতে আশি হাজার স্বর্ণখচিত কাপড়খণ্ড ছিল। পত্রসমূহে লেখা রয়েছে, ৮০ হাজার স্বর্ণখচিত কাপড়খণ্ড হারামাইনের জনহিতকর কাজে ব্যয়ের জন্য সুলতানি ফরমান জারি হয়েছে। সেগুলো গরিব-ফকির, গুণীজন, নেতৃবৃন্দ এবং আলিমদের মধ্যে বন্টিত করা হবে।

সুলতান প্রথম মুহাম্মাদ ৮৪০ হিজরিতে হারামাইনে সুররা পাঠান, যার মধ্যে থাকা কিসওয়ার পরিমাণ কত ছিল, তা জানা যায় না। সুলতান মুরাদ প্রতিবছর ৩৫ হাজার কিসওয়া সমন্বিত সুররা পাঠাতেন বলে জানা যায়। এভাবে উসমানি যুগের শেষ পর্যন্ত মাহমাল ও সুররা পাঠানোর প্রচলন ছিল। সিরিয়া ও মিসরে মাহমালের প্রচলন সম্ভবত মামলুকদের শাসনামলে সুলতানা শাজারাতুদ দুরের কালে শুরু হয়।

উসমানি যুগে খিলাফতের আরবভূমি জ্ঞান ও সমৃদ্ধিতে পৌঁছেছিল এক অনন্যতায়। পবিত্র হিজাজ উম্মতে মুসলিমার ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র হওয়ার পাশাপাশি পরিণত হয়েছিল ইসলামি সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে; কিন্তু অষ্টাদশ শতকে ঘটে গেল ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ঐতিহাসিক ঘটনা। নজদের বুকে জন্ম নিল ওয়াহাবি মতবাদ। মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি এবং মুহাম্মাদ ইবনু সৌদের নেতৃত্বে পরিচালিত এ আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যে বদলে দিলো জাজিরাতুল আরবের মানচিত্র।

গবেষণার অপ্রতুলতা এবং ঐতিহাসিক উপাদানের স্বল্পতার কারণে ওয়াহাবি মতাদর্শ নিয়ে মুসলিমবিশ্বে মতভেদের অন্ত নেই। অনেকে মনে করেন, এটি ছিল স্রেফ সংস্কারবাদী একটি আন্দোলন। যেমনটা ছিল ভারত উপমহাদেশের দেওবন্দ আন্দোলন। তাদের মতে, আরবের বুকে শিরক ও বিদআত নির্মূল করতে হাম্বলি মাজহাবের অনুসারী ইবনু আবদুল ওয়াহহাব যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন, তা-ই ওয়াহাবি আন্দোলন নামে পরিচিত। তারা এ আন্দোলনকে একটি সংস্কারবাদী আন্দোলন এবং নজদিকে একজন সংস্কারপন্থী মুজাদ্দিদ হিসেবে মনে করে থাকেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ওয়াহাবি আন্দোলন মূলত বৃটিশ গোয়েন্দাদের হাতে গড়া একটি ষড়যন্ত্র। তাদের মতানুসারে, বৃটিশরা উসমানি সাম্রাজ্য ধ্বংস করার নিমিত্তে নজদিকে ফুসলিয়ে এ আন্দোলনের জন্ম দেয়। তবে আহলুস সুন্নাতের আইম্মায়ে কিরাম এবং বিদগ্ধ পণ্ডিতদের মতানুসারে, ওয়াহাবিরা ছিল কট্টরপন্থি তাকফিরি ও খারিজি দল, যারা দীনের মধ্যে বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে আরবে উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়েছিল, যা মুসলিমদের ওপর ইসলামের শত্রু ব্রিটিশের কর্তৃত্ব স্থাপনে সুবিধা করে দিয়েছিল।

ওয়াহাবি মতাদর্শ সম্পর্কে বিস্তৃত মতভেদ এবং তথ্য বিকৃতির কারণে মতাদর্শটি সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন পড়াশোনা অনুসন্ধিৎসুকে আন্দলনটির প্রকৃতি সম্পর্কে যথাযথ ধারণালাভে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এ কারণে প্রয়োজন মতাদর্শটি সম্পর্কে গভীর ও দালিলিক অধ্যয়ন। আমরা সামনে ওয়াহাবি মতাদর্শ ও তার ইতিহাস নিয়ে দালিলিকরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নজদের বুকে জন্ম নেয় ওয়াহাবি আন্দোলন। ওয়াহহাব শব্দটি আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম। তবে ওয়াহাবি আন্দোলনের নামকরণ করা হয় মতাদর্শটির জনক মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির পিতা আবদুল ওয়াহহাবের নামানুসারে। এ নামের উৎপত্তি কোথায়, কিভাবে হয়েছিল তা সম্পর্কে যথাযথভাবে কিছু জানা যায় না। ইতিহাস থেকে আন্দোলনটি ওয়াহাবি নামে নামকরণের হেতু সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ওয়াহাবি মতাদর্শীদের একটি দাবি হলো, মতাদর্শটির বিরোধী মত পোষণকারীরা এ আন্দোলনকে ওয়াহহাবি নামে নামকরণ করেছিল। কিন্তু এটা সঠিক তথ্য নয়। কারণ, আমরা ওয়াহাবি মতাদর্শ সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে গিয়ে দেখেছি, ওয়াহাবি মতাদর্শের প্রণিধানযোগ্য ব্যক্তিত্বরা নিজেদের ওয়াহাবি নামে নামকরণ করেছেন। যেমন, এককালে ওয়াহাবি মতাদর্শী ইমাম সুলায়মান ইবনু সাহমান তাঁর ওয়াহাবি থাকাকালে লেখা একটি গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'আল-হাদিয়াতুস সুন্নিয়া ওয়াত তুহফাতুল ওয়াহহাবিয়াহ।' গ্রন্থটি তিনি ওয়াহাবি মতাদর্শীদের জন্য গ্রন্থনা করেন। সেহেতু ওয়াহাবি নামটি বিরোধীদের দেওয়া কথাটি অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন।

জন্মলাভের পর মতাদর্শটি নজদ থেকে ধীরে ধীরে পবিত্র হিজাজের নন্দনকানন পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে জাজিরাতুল আরবের কিছু অংশে। নজদির নেতৃত্বে একদল ওয়াহাবি আরবের বুকে তথাকথিত তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জিকির তুলে ঘোষণা দেয়, পবিত্র আরব ভূমিতে তাওহিদের লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। আরব ভূমি পরিণত হয়েছে কুফুর ও শিরকের আঁতুড়ঘরে। সেখানকার মানুষজন জাহিলি যুগের আঁধারে নিমজ্জিত হয়ে পরিণত হয়েছে কাফির এবং মুশরিকে। তারা লিপ্ত হয়েছে পীর পূজা এবং মাজার পূজাতে। নজদির বইয়ে কিছু জায়গায় আরবের তদানীন্তন মুসলিম যারা তাঁর সংজ্ঞায় মুশরিক ছিল, তাদের ইসলামপূর্ব জাহিলি যুগের মুশরিকদের থেকেও নিকৃষ্ট মুশরিক হিসেবে দেখিয়েছেন। ওয়াহাবিদের মতে,

মতাদর্শ ও তাওহিদের সংজ্ঞা তারা যা নির্ধারণ করেছে তার বাইরে যারা যাবে, তারা হলো মুশরিক ও কাফির এবং তাদের উপর কুফফারদের ব্যাপারে শরিয়তে আসা বিধান কার্যকর করতে হবে। কাজেই এসব পির ও মাজারপূজারি মুশরিকের বিনাশ ঘটিয়ে আরবে নতুন করে ওয়াহাবি তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তাদের মতে, এতদিন মানুষ যে তাওহিদ জেনে এসেছে, যে তাওহিদের ওপর বড় বড় ইমাম গবেষণা, সত্যায়ন ও বিশ্বাস রেখে এসেছেন, সেই তাওহিদ ইনভ্যালিড। প্রকৃত তাওহিদ হলো, ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সংজ্ঞায়িত তাওহিদ। সুতরাং যে এর বিরোধিতা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে; তার ওপর কাফিরদের হুকুম কার্যকর হবে—যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং কালিমার ওপর ইমান রাখে। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাবের সমসাময়িক নজদের বিখ্যাত বিখ্যাত হাম্বলী ইমামগণ এ বিষয়টি তাঁদের গ্রন্থাবলী ও রসায়েল তথা পত্রাবলীতে সত্যায়িত করেছেন। এঁদের মধ্যে নজদের বিশিষ্ট হাম্বলী ইমাম আব্দুল্লাহ আয যুবাইরী আল হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীধানযোগ্য। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আস সাওয়ায়িক ওয়ার রুয়ূদ গ্রন্থের ১১৯ পৃষ্ঠাতে উপরোক্ত বিষয়ে আলোকপাতপূর্বক উল্লেখ করেছেন যে, ওয়াহাবীরা যারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করত তাদের নিকৃষ্টতম জাতি হিসেবে পরিগণিত করত।

তারা তাদের মতাদর্শের বিরোধীদের মুশরিক হিসেবে গণ্য করত। ওয়াহাবি মতাদর্শী ঐতিহাসিক ইবনু গন্নাম তাঁর তারিখু নজদ গ্রন্থে নজদের বিশিষ্ট হাম্বলী আলিম হযরত সুলাইমান ইবনু সুহাইম এঁর একটি পত্র নকল করেছেন যেখানে তিনি ইবনু আব্দিল ওয়াহহাবের বিষয়ে লেখেনঃ "যে ব্যক্তি সে (মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাবের) যা বলত তার সবটুকুর সাথে সহমত পোষণ না করত এবং তা সত্য বলে সাক্ষ্য না দিত, তাকে সে তাকফীর করত।"[১৭]

তারা তদানীন্তন ওয়াহাবি নন এমন মুসলিমদিগকে তাকফির করেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা তাদের সাথে মুশরিকীনদের অনুরূপ ব্যবহার করত, বরং তার থেকেও অধিক বর্বরতা প্রদর্শন করত। তাদের উন্মুক্ত তরবারি থেকে বাদ যেত না শিশু, আবাল, বৃদ্ধরাও। এমনকি মুসলিম রণাঙ্গনে মুসলিম রমনীদের পেট চিরে গর্ভপাত করানো হত। ইমাম আব্দুল্লাহ আল হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তারা শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হত না আর না তারা বয়োঃজ্যেষ্ঠগণকে শ্রদ্ধা করত" [১৮]। তিনি বলেন, "তারা গর্ভবতী রমনীদিগের পেট চিরে ফেলত এবং তার সন্তানকে বের করে ফেলত ও তাকে বর্শার শিরে উঁচু করে ধরত।"[১৯] ওয়াহাবিদের বর্বরতার বর্ণনে তদানীন্তন নজদের বিখ্যাত আলিম ও মুজাদ্দিদ ইমাম ইবনু ফাইরূয আল হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, " তারা তাদের (মুসলিমদের) সন্তান সন্ততিকে দাসে পরিণত করেছিল ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল।"[২০] এভাবে ওয়াহাবিরা তাওহিদ ও দীনের মধ্যে বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে মক্কা-মদিনাসহ সমগ্র মুসলিমবিশ্বকে কাফির-মুশরিক আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, যেন তারা নজদের মরুসাগরে নতুন ধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

ওয়াহাবিরা তাদের এ উগ্র ও বাতিল চিন্তা-চেতনা দ্বারা মূলত রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর একটি সহিহ হাদিস মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল, যে হাদিস ওয়াহাবিদের সকল ভ্রান্ত দাবির ঘাড়ে উন্মুক্ত তরবারিস্বরূপ। সহিহ মুসলিমে সহিহ সনদে একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,

إن الشَّيطان قد يَئِسَ أن يَعْبُدَه المُصَلُّون في جَزِيرة العَرب ولكن في التحريش بينهم

নিঃসন্দেহে শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে যে, আরব উপদ্বীপের মুসল্লিরা (মুসলিমরা) তার উপাসনা করবে কিন্তু তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ করবে।[২১]

উক্ত হাদিস থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, আরবের মুসলিমরা কখনো শয়তানের উপাসনা তথা শিরকে আকবরের দিকে ফিরে যাবে না। একজন মুসলিমের জন্য ওয়াহাবি মতাদর্শ বাতিল প্রমাণের ক্ষেত্রে এ হাদিসটি যথেষ্ট। কারণ, যদি হাদিসটি সত্য হিসেবে ধরা হয়, তবে ওয়াহাবিরা

১৭. তারীখু নজদ, পৃষ্ঠাঃ ২৭১

১৮. আস সাওয়াইকু ওয়ার রুয়ূদ পৃষ্ঠা ১১৯

১৯. প্রাগুক্ত

২০. আর রাদ্দু আলা মান কাফফারা আহলার রিয়াদ্ব ওয়া মান হাওলাহুম মিনাল মুসলিমীন, পৃষ্ঠাঃ ২৬

২১. মিশকাতুল মাসাবিহ : ৬৫

আরবদের শিরকে নিমজ্জিত হওয়ার সকল দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হবে, তাদের মতাদর্শ বাতিল প্রমাণিত হবে আর তাদের কর্তৃক আরবের মুসলিমদের আমভাবে তাকফির ও হত্যা করা জুলুম হিসেবে প্রমাণিত হবে। পক্ষান্তরে যদি ওয়াহাবিদের দাবিগুলো সত্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে নাউজুবিল্লাহ এটা বলতে হয় যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ মিথ্যা বলেছেন।

ওয়াহাবি বিপ্লব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মক্কার শাফিয়ি মাজহাবের তখনকার মক্কার গ্র্যান্ড মুফতি জাইনি দাহলান রাহ. বলেছেন, 'মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের দাবিসমূহের একটি হচ্ছে, তিনি একটি নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছেন, যেমনটা তাঁর কথাবার্তা, কাজকর্ম এবং সার্বিক অবস্থায় প্রকাশ পাচ্ছে। আর এ কারণে তিনি আমাদের নবির দীন থেকে কুরআন ছাড়া অন্যকিছু গ্রহণ করছেন না। একই সঙ্গে তিনি কেবল কুরাআনের বাহ্যিক অংশগ্রহণ করে থাকেন, যাতে জনসমাজ তাঁর বিষয়টি জানতে না পারে।'[২২]

দীনের মধ্যে ওয়াহাবিদের বিকৃতি, তাওহিদের ভুল ব্যাখ্যা, শিরক ও বিদআতের ভুল সজ্ঞায়ন আর সেগুলো দিয়ে গোটা উম্মতে মুসলিমাকে তাকফির করাটা তদানীন্তন সময়ের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বরেণ্য উলামা এবং ইমামরা সুনজরে দেখেননি। তারা ওয়াহাবিদের এমন কুকর্মের বিরুদ্ধে ব্যপকভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং তাদের তাকফিরি ও খাওয়ারিজ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির সমসাময়িক বিখ্যাত হাম্বলি আলিম আবদুল্লাহ ইবনু দাউদ জুবায়রি নজদির প্রসঙ্গে লেখেন, 'তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফিতনার তরবারি উন্মুক্ত করেছেন। তাদের তাকফির ও হত্যা করেছেন। ...তিনি ধারণা করতেন, কেবল তাঁর মাধ্যমেই ইসলাম শুদ্ধ হবে।'[২৩]

উপমহাদেশের বিখ্যাত আলিম হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহ. (১৩৭৭)-যিনি দীর্ঘদিন মদিনায় থাকার সুবাদে একদম কাছ থেকে ওয়াহাবিদের পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান—তাদের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে নজদি সম্পর্কে বলেছেন, 'বন্ধুরা, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে নজদ থেকে আরবে আবির্ভূত হন। তিনি বাতিল চেতনা ও ভ্রষ্ট আকিদা রাখতেন বিধায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালান। তাদের হত্যা করাকে পুণ্যকাজ এবং সম্পদকে তিনি গণীমত জ্ঞান করতেন।'[২৪]

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের আরও অনেক আলিমের মন্তব্য আমরা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচনা করব। এখানে দেখা যাচ্ছে, আহলুস সুন্নাতের শীর্ষস্থানীয় আলিমরা ওয়াহাবিদের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। অনেকে বলতে পারেন, তারা দূর-দেশের হওয়ায় প্রোপাগান্ডার স্বীকার হয়েছেন; কিন্তু এমনটা বলা নিতান্ত অযৌক্তিক। কারণ, তখন নজদ, হিজাজসহ আরবের আহলুস সুন্নাতের যেসব আলিম কাছ থেকে ওয়াহাবিদের কার্যক্রম অবলোকন করেছেন, তাঁরা সে অভিজ্ঞতা মলাটবন্দি করে গেছেন এবং সবাই ওই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কলম চালিয়েছেন। অতএব, কেবল প্রোপাগান্ডার শিকার হয়ে তারা ওয়াহাবি মতাদর্শের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন, এটা বলা হবে ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক প্রলাপ; বরং প্রকৃত বিষয় হলো, নজদির সময়কার আহলুস সুন্নাতের যে আলিমদের কাছে ওয়াহাবিদের প্রকৃত চিত্র পৌঁছেছে, তারা সবাই ওয়াহাবিয়াতের বিরোধিতা করেছেন। নীতিগত কারণে হকপন্থি কোনো জামাআতের বিরুদ্ধে যেখানে আহলুস সুন্নাতের অধিকাংশ আলিম কখনো একমত হতে পারেন না, সেখানে ওয়াহাবিদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের অধিকাংশ আলিমের বিরোধিতার কারণ কী ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের আগে আমরা ওয়াহাবি মতাদর্শের জনক মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নজদে মুসায়লামার দেশ ইয়ামামার আইনিয়া জনপদের সম্ভ্রান্ত দীনি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি। তাঁর পূর্ণ নাম হলো, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ইবনু সুলায়মান আত-তামিমি আন-নজদি। নজদির জন্মসন নিয়ে ইতিহাসবিদদের মতভেদ রয়েছে। তবে প্রণিধানযোগ্য মত হলো, ১১১৫ হিজরি—১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বনু তামিমের দিকে সম্পর্কিত করে তাঁকে তামিমিও বলা হয়। তবে তাঁর তামিমি হওয়া নিয়েও বেশ মতভেদ রয়েছে। কতিপয় ইতিহাসবিদের মতে, বনু তামিমের দিকে সম্পৃক্ত করে তাঁকে তামিমি বলা হয়। আবার কারও কারও মতে, তাঁর বংশধররা তুরস্কের বুরসা থেকে নজদে আসেন। বুরসার এক ইয়াহুদি

২২. খুলাসাতুল কালাম ফি বায়ানি উমারায়িল বালাদিল হারাম মিন জামানি সাইয়িদিনান নবি সাঃ ইলা ওয়াকতিনা হাজা বিত তামাম : ৩০৪

২৩. আস-সাওয়ায়িকু ওয়ার রুয়ুদ : ৪৩-৪৪

১৮. আশ-শিহাবুস সাকিব : ২২১

বংশোদ্ভূত তামিমের দিকে সম্পৃক্ত করে তাঁকে তামিমি বলা হয়ে থাকে। বিশিষ্ট তুর্কি ইতিহাসবিদ ডক্টর মুসতাফা তুরান এ মত উল্লেখ করেন।[২৫] তিনি তামিমকে দোনমে ইয়াহুদি হিসেবে উল্লেখ করেন। দোনমে হলো, ইয়াহুদিদের একটি দল, যারা উসমানি খিলাফতের যুগে মুসলিম-ছদ্মবেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। শায়খ রাফআত সালিম কাবার প্রণীত *the Jews of Al-Dunmah and the Origin of the Saudi Wahabis* গ্রন্থেও মুসতাফা তুরানের মতটির সমর্থন পাওয়া যায়। আবার নজদির সমসাময়িক নজদের বিখ্যাত নাবাতি কবি হুমায়দান শুয়াইয়ির তাঁর ওয়াহাবিবিরোধী বিখ্যাত হিজা কাব্যের দুটি চরণে দাবি করেন, নজদির পূর্বপুরুষ তুরস্কের বুরসা থেকে এসেছে। চরণ দুটি হলো,

اظنه بمحمد يعني محمد الوهابية

يقول اصله من تميم تميم (برصة) التركية

আমি মুহাম্মাদ বলতে ওয়াহাবি মুহাম্মাদের কথা বলছি।

বলা হয়, তাঁর বংশ তুরস্কের বুরসা থেকে আগত তামিম থেকে।

বিশিষ্ট সৌদি ঐতিহাসিক ও বিপ্লবী নাসির সায়িদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারিখু আলে সৌদ' এর মধ্যে নানান দলিলের ভিত্তিতে দাবি করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির বংশধররা তুর্কির ইয়াহুদিদের থেকে আগত। নজদের কতিপয় উলামায়ে কিরামও এই মত পোষণ করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির পিতা শায়খ আবদুল ওয়াহহাব নজদি রাহ. ছিলেন তদানীন্তন হাম্বলি মাজহাবের প্রসিদ্ধ আলিম ও নজদের আইনিয়া অঞ্চলের প্রধান কাজি। তাঁর পুত্র অর্থাৎ, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির ভাই শায়খ সুলায়মান ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদিও তাঁর পিতার মতো একজন বিদগ্ধ হাম্বলি আলিম ও কাজি ছিলেন।

শায়খ আবদুল ওয়াহহাব নজদি রাহ.-এর প্রসঙ্গে তাঁর সমসাময়িক নজদের প্রসিদ্ধ হাম্বলি পণ্ডিত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুহ রাহ. লিখেছেন, 'তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে ফিকহের দারস ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। আবদুল ওয়াহহাব ফিকহের পাঠদানের পাশাপাশি বেশকিছু মাসআলার ওপর সুন্দর কিছু গ্রন্থও রচনা করেন। ১১৫৩ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।'[২৬]

তখনকার হিজাজ ও নজদের প্রায় সব আলিম আবদুল ওয়াহহাবের সততা ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দেন। শায়খ আবদুল ওয়াহহাব নজদি রাহ. তাঁর সন্তান মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের প্রতি শৈশব থেকে সন্তুষ্ট ছিলেন না। নিজে একজন দূরদর্শী পণ্ডিত হওয়ার কারণে তাঁর পুত্রের মধ্যে পথভ্রষ্টতা পরিলক্ষ করে, শৈশবকাল থেকেই তার ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করতে শুরু করেন। হিজাজের বিশিষ্ট আলিম সাইয়িদ হাবিব আলাবি রাহ. নজদির বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 'তাঁর পিতা সজ্জনব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুহাম্মাদের বাল্যকাল থেকেই তাঁর এ দুর্ভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছিলেন। বিপরীতে মুহাম্মাদ তাঁকে ব্যথিত ও রাগন্বিত করছিল। আবদুল ওয়াহহাব বলতেন, অচিরেই তাঁর থেকে বড় ধরনের ফাসাদ প্রকাশ পাবে।'[২৭]

মক্কার তখনকার গ্র্যান্ড মুফতি জাইনি দাহলান রাহ. একই কথা লিখেছেন, 'নজদির পিতা সৎ এবং একজন আলিম ছিলেন।'[২৮]

প্রসিদ্ধির উচ্চ শিখরে পৌঁছুলেও শায়খ আবদুল ওয়াহহাব ইলমি নহরের সাঁতারে তাঁর পিতা সুলায়মানকে অতিক্রম করতে পারেননি। প্রসিদ্ধ ওয়াহাবি ইতিহাসবিদ আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান বলেছেন, 'আবদুল ওয়াহহাব ফকিহ হলেও তাঁর পিতার তুল্য ছিলেন না।'[২৯]

শায়খ আবদুল ওয়াহহাব নজদি রাহ.-এর মুহাম্মাদ ছাড়া আরও একজন সন্তান ছিলেন যেমনটা ইতিপূর্বে জেনেছি। তাঁর নাম ছিল সুলায়মান। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও সে যুগের একটি রত্নে পরিণত হয়েছিলেন। সুলায়মানের ভাই মুহাম্মাদ যখন নজদের বুকে ওয়াহাবি বিপ্লব

২৫. Jews of Al Dunmah : ১৪

২৬. আস-সুহুবুল ওয়াবিলা : ২৭৫

২৭. মিসবাহুল আনাম : ৭

২৮. ফিতনাতুল ওয়াহহাবিয়া : ৪

২৯. উলামাউ নজদ : ৪১

শুরু করেন এবং তাঁর থেকে নানাবিধ শরিয়তবিরোধী কার্যকলাপ প্রকাশ পেতে থাকে, তখন সুলায়মান তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির বিরুদ্ধে কলম ধরেন। তিনি ওয়াহাবি মতাদর্শের বিরুদ্ধে লিখে ফেলেন তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'আস-সাওয়ায়িকুল ইলাহিয়া ফির রাদ্দি আলাল ওয়াহহাবিয়া'। মসিযুদ্ধ ছাড়াও তিনি ওয়াহাবি মতাদর্শের বিরুদ্ধে অসি যদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন এবং ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে ব্যপক জনমত গড়ে তোলেন। মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি যখন দীনের বিকৃতির মাধ্যমে মানুষকে বিকৃত তথাকথিত তাওহিদের পথে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সুলায়মান ওয়াহাবিদের ভুলগুলো তুলে ধরে তাদের আহ্বান করছিলেন প্রকৃত তাওহিদের দিকে।

নজদির শৈশব ও কৈশোর

শৈশব থেকেই মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ছিলেন অত্যন্ত ধীশক্তির অধিকারী। দীন-সংক্রান্ত গ্রন্থপাঠে ছিল তাঁর অদম্য আগ্রহ। পিতার কাছ থেকে তিনি ফিকহ, তাফসির, হাদিসসহ দীন শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ লাভ করেন। তবে শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে বড় বড় বিচ্যুতি দেখা দিতে শুরু করে। তিনি হাম্বলি মাজহাবের সুবিখ্যাত আলিম ইবনু তাইমিয়া ও তাঁর শিষ্যদের মত-পথ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ইবনু তাইমিয়া ও তাঁর শিষ্য ইবনুল কাইয়িম শরিয়তের বিষয়ে দুইজন মহাপণ্ডিত ছিলেন; তবে শরিয়তের কিছু মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ে কিছু গুরুতর বিচ্যুতি রয়ে যায়। বিধায় আহলে সুন্নাতের কাছে তাঁরা সমালোচিত হন। বিশেষত তাকফির ও তাবদির ক্ষেত্রে তাদের বাড়াবাড়ি ইমামরা ভালো নজরে দেখেননি। ইবনু তাইমিয়া ও তাঁর শিষ্য ইবনুল কাইয়িম তাকফিরের ক্ষেত্রে এতটাই বাড়াবাড়ি করেন যে, বিশিষ্ট ভারতীয় আলিম আশরাফ আলি থানবি রাহ. (১৩৬২ হি) তাদের সুলতানুল কলম বলে অভিহিত করেন। শায়খ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রাহ. তাঁর মালফুজাতের মধ্যে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

> থানবি রাহ. (১৩৬২ হি) তাঁকে ও (তাঁর ছাত্র) ইবনুল কাইয়িমকে সুলতানুল কলম (কলমের প্রভু) উপাধি দেন, যেহেতু তারা কার মাথা কাটল আর কাকে তাঁরা বিরোধিতা করছেন তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই কলম চালিয়ে যেতেন।[৩০]

যাইহোক, ইসলামি শরিয়তের যথাযথ তাফাক্কুহ না অর্জন করা এবং তাকফিরপ্রবণ মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের মধ্যে বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। দীনের বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের স্বতঃসিদ্ধ মতামত ছেড়ে তিনি কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করেন। আহলুস সুন্নাতের কাছে ফিকহের ইলম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইলম হিসেবে পরিগণিত; কিন্তু নজদি ফিকহ ছেড়ে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করেন। ফলে তাঁর পিতা আবদুল ওয়াহহাব তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি সচরাচর বলতেন, ভবিষ্যতে তাঁর এ ছেলের থেকে ফাসাদ প্রকাশ পাবে।

নজদি আলিম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুহ এ বিষয়ে লিখেছেন, 'যারা শায়খ আবদুল ওয়াহহাবের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তাদের কেউ কেউ আমাকে বলেছেন, তিনি তাঁর ছেলে মুহাম্মাদের ওপর তাঁর পূর্ববর্তীদের এবং তাঁর সমকালীনগণের মতো ফিকহশাস্ত্র চর্চায় আত্মনিয়োগ না করায় ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর বিষয়ে তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন, "অচিরেই তাঁর থেকে অকল্যাণকর বিষয় প্রকাশ পাবে।[৩১]

ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সমসাময়িক হিজাজের বিখ্যাত হাম্বলি ইমাম ও মুজাদ্দিদ ইবনু দাউদ আল হাম্বলি রাহ. বলেন, 'এ দাম্ভিকের (অর্থাৎ, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের) মধ্যে যখন প্রথম বিদআতি বিশ্বাস প্রকাশ পেল, তখন তাঁর পিতা বিরোধিতা করেন, তাঁর বিরুদ্ধে বদদুআ দেন এবং চরম ক্রুদ্ধ হন।'[৩২]

শায়খ জাইনি দাহলান তাঁর 'ফিতনাতুল ওয়াহহাবিয়া', শায়খ জামিল সিদকি তাঁর 'ফাজরুস সাদিক', শায়খ মিকদাদি তাঁর 'কাশফুল খাফা'-সহ আহলুস সুন্নাতের অনেক আলিম এবং ইতিহাসবিদ তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে শায়খ আবদুল ওয়াহহাব রাহ. কর্তৃক তাঁর পুত্রের পথভ্রষ্টতার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীটির কথা উল্লেখ করেছেন।

---

৩০. Malfoozat of Faqeeh ul Ummat by Mufti Mahmood Hasan Gangohi, Volume 1, Pg. 385

৩১. আস-সুহুবুল ওয়াবিলা : ২৭৫

৩২. আস-সাওয়ায়িকু ওয়ার রুয়ুদ : ৮৯

পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি হজ পালন ও উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য রওনা হন পবিত্রতম শহর মক্কার উদ্দেশে। সেখানে যে সকল শায়খের থেকে বিদ্যার্জন করেন তাদের মধ্যে দুইজন ছিলেন, হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত আলিম ইমাম হায়াত সিন্ধি রাহ. ও শাফিয়ি মাজহাবের জ্ঞানবীর ইমাম সুলায়মান কুর্দি রাহ.। এ ছাড়া তিনি মদিনার বিখ্যাত শায়খ আবদুল্লাহ ইবরাহিম এবং ১৬ বছর বয়সে আল-মুতাসিমে শায়খ হাসান তামিমির কাছ থেকেও বিদ্যার্জন করেন। তাঁর শায়খদের মধ্যে শায়খ জায়নুদ্দিন মাগরিবি, আবদুল কারিম কুর্দি, শায়খ আলি দাগিসতানি রাহ. প্রমুখ উল্লেখযোগ্য; কিন্তু ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের পথভ্রষ্টতা লক্ষ্য করে তাঁর শায়খরাও পথভ্রষ্টতার বিষয়ে তাঁর পিতার অনুরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন।

শায়খ দাহলান লিখেছেন, 'তাঁর পিতা, ভাই এবং শায়খরা তাঁর ব্যাপারে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন, 'তাঁর থেকে বক্রতা ও পথভ্রষ্টতা প্রকাশ পাবে।'[৩৩]

ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের শায়খদের মধ্যে তাঁর বিরোধিতায় সম্ভবত সুলায়মান কুর্দিই সব থেকে বেশি সরব ছিলেন। তিনি তাঁর বিচ্যুত মতাদর্শ খণ্ডন করে একটি রিসালাও লিখেছেন। 'মিসবাহুল আনাম' এ আছে, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান রাহ. নজদিকে যেসব প্রশ্ন করেছিলেন, তার কোনোটারই জবাব তিনি দিতে পারেননি। সুলায়মান কুর্দিকে নজদির উদ্ভাবিত কিছু মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে শক্তভাবে তাঁর খণ্ডন করেন। শায়খ সুলায়মান প্রদত্ত জবাবখানি আমরা এ গ্রন্থের শেষ দিকে সংযোজিত করেছি। নজদির মতাদর্শের খণ্ডনে سيف الجهاد নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন তাঁর আরেক শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল লতিফ। এভাবে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের ছাত্রজীবন ও পরবর্তী সময়ে পিতা ও ভাইয়ের মতো তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন শিক্ষকরাও।

ইরাক যাত্রা

উসমানি যুগে ইরাক ছিল ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। আব্বাসিদের যুগে বাগদাদ ছিল ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানী। এ যুগে বাগদাদ উন্নতির চূড়ায় পৌঁছে যায়। শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয় এ ঐতিহ্যবাহী শহর। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গল-আক্রমণের পর বাগদাদ তার জৌলুস হারিয়ে ফেলে। ১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দে শিয়া সাফাবিরা আক-কুয়ুনলুদের হাত থেকে বাগদাদ দখল করে সেখানে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সাফাবি শাসক শাহ ইসমাইল বাগদাদস্থ ইমাম আজম আবু হানিফার মাজারটি ধ্বংসের নির্দেশ দেন। পরবর্তী সময়ে সাফাবিদের বিরুদ্ধে উসমানিরা যুদ্ধ পরিচালনা করে ইরাকসহ ইরানের একটা অংশ দখল করে নেয়। উসমানি ও সাফাবিদের মধ্যকার যুদ্ধসমূহের উল্লেখযোগ্য একটি ছিল চ্যালদিরানের যুদ্ধ। ১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সেলিম ইয়াবুজের নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধে পারসিক সাফাবিরা চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়।

ইরাক হলো, আহলে বায়ত ও ইমাম আবু হানিফাসহ আহলুস সুন্নাতের বড় বড় ইমাম, আলিম ও অলির পুণ্যভূমি। তাই ইরাকের প্রতি উসমানিদের স্বাভাবিক একটি তীব্র আকর্ষণ ছিল। ফলে তারা ইরাক দখলের পর এর উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেয়। শাসনকার্যের সুবিধার্থে ইরাককে তারা চারটি ওলায়াত বা প্রদেশে ভাগ করে—ওলায়াতে বাগদাদ, ওলায়াতে মাওসিল, ওলায়াতে শাহরজুর (উত্তরাঞ্চলীয় অংশ) এবং ওলায়াতে বসরা।

উসমানি যুগে অন্যান্য প্রদেশের মতো বসরাও ছিল জ্ঞানের উদ্যান। বিজ্ঞ আলিম, ফকিহ, অলি আর জ্ঞানান্বেষীদের সমারোহ বসরাকে পরিণত করে জ্ঞানবিজ্ঞানের মিলনক্ষেত্রে। দেশ-বিদেশের জ্ঞানপিপাসুরা এসে জড়ো হতেন সেখানে। তাই ইবনু আবদুল ওয়াহহাবও জ্ঞানান্বেষণের জন্য সুদূর মক্কা থেকে বসরাতে পাড়ি জমান। কিছুকাল এখানে আলিমদের সান্নিধ্যে কাটান। বসরার গভর্নর শায়খ হাসান ইসতাম্বুলিসহ বিভিন্ন আলিমের থেকে জ্ঞানার্জন করেন।

কথায় আছে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। কিশোর নজদির ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটল। বসরায় গিয়ে তিনি দীনের মনগড়া ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। তাওহিদ, বিদআত ও শিরকের সংজ্ঞায় বিকৃতি এনে তিনি সেখানকার আহলুস সুন্নাতের অনুসারী মুসলিমদের কুফুর ও শিরকের দায়ে অভিযুক্ত করতে লাগলেন, তাদের অবৈধ পন্থায় কাফির ও মুশরিক ফাতওয়া দিতে শুরু করলেন। ফলে সেখানকার উলামাসমাজ ও মুসলিমরা

৩৩. ফিতনাতুল ওয়াহহাবিয়া

তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। ফিতনার আশঙ্কায় তাঁকে বসরার পবিত্র ধাম থেকে বিতাড়িত করা হয়। নাসির সায়িদ লেখেন, 'তাঁকে নজদ থেকে বিতাড়িত করা হয়। এরপর তিনি যথাক্রমে ইরাক, মিসর ও সিরিয়াতে যান এবং সব জায়গা থেকেই বিতাড়িত হন। অবশেষে সিরিয়া থেকে নজদের আইনিয়াতে ফিরে আসেন।[৩৪]

বসরা থেকে বিতাড়িত হওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে ওয়াহাবি মতাদর্শী ইতিহাসবিদ ইবনু বিশরের লেখায়, 'এরপর শায়খের বিরুদ্ধে বসরার কিছু মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়, যাদের মধ্যে তাদের নেতারাও ছিল। তারা তাঁকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়ে সেখান থেকে বহিষ্কার করে...।'[৩৫]

ইবনু বিশরের বয়ান থেকে বোঝা যায়, নজদিকে বিতাড়িত করায় বসরাবাসীকে তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চান; কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা তো এমন ছিল না; ছিল ভিন্ন। তাঁকে বিতাড়নের কারণ ছিল, তিনি বসরাতে গিয়ে আহলুস সুন্নাত থেকে বিচ্ছিন্ন মতামত প্রদান এবং অন্যায়ভাবে শিরক ও বিদআতের অভিযোগে মুসলিমদের অভিযুক্ত করতে শুরু করেন। ফলে সেখানকার মুসলিমসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে বিতাড়িত করে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের ফিতনার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল, ইরাকের বসরা নগরীতে। বসরা নগরী উচ্চ নজদের সীমান্তে অবস্থিত। বিশিষ্ট নজদি আলিম শায়খ আবদুল ওয়াহহাব ইবনু তুর্কি লিখেছেন, 'মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি প্রথম ইরাকের বসরা শহরে তাঁর সালাফি দাওয়াতের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।'[৩৬]

এখানে লক্ষণীয়, নজদি জন্মগতভাবে নজদের ইয়ামামার হলেও তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম ইরাকের বসরা থেকে শুরু হয়। নজদ-সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যেসব ইমাম নজদির প্রসঙ্গ এনেছেন, তাদের ভুল প্রমাণিত করতে কেউ কেউ এ যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, হাদিসে নজদ বলতে ইরাক বোঝানো হয়েছে। হাদিসে নজদ থেকে কারনুশ শয়তান বা শয়তানের শিং ও ফিতনা ফাসাদ উদ্ভূত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোনো কোনো হাদিসে নজদের স্থলে মাশরিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আরবি অভিধান অনুসারে যার অর্থ হলো পূর্বদিক। যেহেতু হাদিসে নজদের নির্দিষ্ট জায়গার কথা উল্লেখ করা হয়নি, সেহেতু আইম্মায়ে কিরামদের মধ্যে নজদ নিয়ে মতভেদ তৈরি হয়েছে। কিছু ইমাম বলেন, নজদ বলতে মূলত ইরাক তথা উচ্চ নজদকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। আবার কিছু ইমামের মতে, নজদ হলো ইয়ামামা বা নিম্ন নজদ। তবে কিছু বর্ণনা অনুযায়ী নজদ বলতে ইয়ামামা হওয়ার বিষয়টিকে অধিক বিশুদ্ধ হিসেবে প্রতীয়মান করে। ইবনু তাইমিয়া এ মতের সমর্থন করেছেন। তিনি মাশরিক-এর ব্যাখ্যায় বলেন, ومنها خرج مسيلمة الكذاب، الذي ادعى النبوة

> আর সেখান থেকে মুসায়লামাতুল কাজজাব উদ্ভূত হয়েছিল, যে নবুওয়াতের দাবি করেছিল।[৩৭]

মুসায়লামার দেশ বলতে ইয়ামামা বোঝায় যেখান থেকে একাধিক খাওয়ারিজ দল পরবর্তীতে বেরিয়েছিল। মুসায়লামার ইয়ামামার নজদ ও ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের জন্মভূমি নজদ স্থানগতভাবে একই।
তবে নজদের ব্যাখ্যা যা-ই হোক, উক্ত হাদিস দিয়ে ওয়াহাবি মতাদর্শের ব্যাপারে ইসতিদলাল করার মধ্যে কোন ভুলের অবকাশ নেই। যদি বলা হয়, হাদিসে নজদ বলতে ইরাক বোঝানো হয়েছে, সে ক্ষেত্রে আমাদের জবাব হলো, ওয়াহাবি মতাদর্শ প্রথম ইরাক থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যেমনটা আমরা উপরে দেখলাম। আবার যদি বলা হয়, নজদ বলতে ইয়ামামার নজদ বোঝানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমাদের জবাব হলো, ওয়াহাবি মতাদর্শ প্রকৃতভাবে উদ্ভূত হয়েছিল ইয়ামামার নজদ থেকে। অতএব, নজদ নিয়ে সংশয়ের আর কোনো অবকাশ থাকল না।

হুরায়মালা থেকে বিতাড়ন

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব সিরিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে পিতৃভূমি নজদের আইনিয়াতে ফিরে আসেন। পরে সেখান থেকে আহসা হয়ে পৌঁছে যান হুরায়মালাতে। এদিকে ওই সময় আইনিয়াতে মহামারির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ফলে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের পিতা আইনিয়া পরিত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী হুরায়মালা নামক স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব হুরায়মালাতে পৌঁছার পর সেখানে

৩৪. তারিখু আলে সৌদ : ২০
৩৫. উনওয়ানুল মাজদ : ৩৬
৩৬. ওয়াহহাবিয়া ওয়া আহওয়ালুন নজদ : ৮০
৩৭. আল-জাওয়াবুস সহিহ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা : ১২৭-১২৮

ওয়াহাবি মতাদর্শ প্রচারে লিপ্ত হন। দীনের অপব্যাখ্যা এবং মুসলিমদের অন্যায়ভাবে তাকফির করার ফলে হুরায়মালাবাসী তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পুত্রের কর্মকাণ্ড দেখে পিতা শায়খ আব্দুল ওয়াহাব তাঁর ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। নজদির শৈশবে তাঁর পথভ্রষ্টতার বিষয়ে তিনি যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, তা নিজের চোখের সামনে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হতে দেখে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। ফলে পিতা ও পুত্রের মধ্যে শুরু হয় বাকযুদ্ধ ও কথা কাটাকাটি। ওয়াহাবি ইতিহাসবিদ ইবনু বিশর তাঁর গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, 'এমনকি পিতা-পুত্রের মধ্যে বাকযুদ্ধ হয়।'[৩৮] এরপর পিতার ভয় এবং মুসলিমদের বিরোধিতায় কিছুকাল তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম স্তিমিত থাকে।

হুরায়মালা অঞ্চলে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু হয় ১১৪৩ হিজরি সনে। এ সালটি ওয়াহাবি মতাদর্শের উত্থানের সাল হিসেবে ধরা হয়। যদিও ইবনু আবদুল ওয়াহহাব পিতা থেকে ধমক খেয়ে বেশ কিছু বছর তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম স্তিমিত রেখেছিলেন। ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ, নজদের বুকে ওয়াহাবিয়াতের উত্থানের প্রায় দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হুরায়মালা অঞ্চলে তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন। পিতার ইনতিকালে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের একটি প্রধান বাধা দূর হয়ে যায়। ফলে কোমর বেঁধে তাঁর তাকফিরি মতাদর্শ প্রচারে নেমে পড়েন। একপর্যায়ে তাকফিরি দাওয়াতের কারণে অতিষ্ঠ হুরায়মালাবাসী ইবনু আবদুল ওয়াহাবকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। পরে তিনি হুরায়মালা ছেড়ে আপন জন্মভূমি আইনিয়াতে পালিয়ে আসেন।

উসমান ইবনু মুআম্মার (১১৬৩ হি.) এর সান্নিধ্যে

নজদি যখন হুরায়মালা ছেড়ে আইনিয়াতে আসেন, তখন এর শাসনভার ছিল উসমান ইবনু মুআম্মারের হাতে। আইনিয়াতে আসার পর উসমানের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে নজদের রাজা হওয়ার প্রলোভন দেখান। বিনিময়ে তাঁর তথাকথিত দাওয়াতের সমর্থন ভিক্ষা চান। 'ইবনু আবদুল ওয়াহহাব হুরায়মালা থেকে উসমান ইবনু মুআম্মার শাসিত আইনিয়াতে চলে যান। তারপর উসমানকে নজদের রাজা হতে প্রলুব্ধ করলে তিনি তাঁকে সহায়তা করেন।'[৩৯]

নজদির এ প্রস্তাবের কথাটি ইবনু বিশর তাঁর 'উনওয়ানুল মাজদ' এ ভিন্নভাবে নিয়ে এসেছেন। নজদির প্রলোভনে ইবনু মুআম্মারকে রাজা হওয়ার লিপ্সা গ্রাস করে ফেলে। তিনি ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে তাঁকে সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। এমনকি তাঁর মেয়ে জাওহারাকে নজদির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন। ইতিমধ্যে আইনিয়াতে নজদির কিছু অনুসারী ও ভক্তের আবির্ভাব ঘটে। ফলে আইনিয়া তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রমের জন্য কিছুটা প্রশস্ত হয়ে ওঠে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে সেখানে তিনি তাঁর তাণ্ডব শুরু করেন। তথাকথিত তাওহিদ প্রতিষ্ঠার নামে ইসলামের অপব্যাখ্যা, মুসলিমদের তাকফির-তাবদি[৪০] করার মাধ্যমে অস্থির করে তোলেন পুরো আইনিয়া। ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সত্ত্বেও ক্ষমতালোভী মুআম্মার তাঁকে সমর্থন করতে থাকেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল সমগ্র নজদে আধিপত্য কায়িম করা।

জায়িদ ইবনুল খাত্তাব (১২ হি.) রা. এর মাজার ধ্বংস

আইনিয়াতে দিনদিন বাড়তে থাকে নজদির প্রলয়ংকরী ধ্বংসযজ্ঞ। চারিদিকে মুসলিমদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হতে থাকে ক্রোধের রোষানল। এরই মধ্যে তিনি মনে মনে বিখ্যাত সাহাবি জায়িদ ইবনুল খাত্তাব রা.-এর মাজার ধ্বংসের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। মাজারটি ছিল আইনিয়ার জুবায়লা এলাকায়। নজদি জুবায়লার মুসলিমদের ভয়ে ভীত ছিলেন। কারন, তাঁর তথাকথিত তাওহিদের সংজ্ঞায় মাজার মাত্রই শিরকের আখড়া এবং তা ধ্বংস করা আবশ্যক বলে মনে করা হলেও আহলুস সুন্নাতের কাছে ক্ষেত্রবিশেষে যেমন গায়রে মুসাব্বালা তথা জনগণের জন্য ব্যবহৃত নয় এমন স্থানে মাজার স্থাপন করা বৈধ। যেমন : হাম্বলি মাজহাবের সুবিখ্যাত ফিকহগ্রন্থ الفروع في فقه الحنابلة-এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে : وذكر صاحب المستوعب و المحرر لا بأس بقبة و بيت و حظيرة في ملكه

> আল-মুসতাওয়িব ও আল-মুহাররার প্রণেতা বর্ণনা করেন, আপন মালিকানাধীন জায়গায় (কবরের ওপর) কোনো গম্বুজ বা ঘর অথবা বেষ্টনী নির্মাণে কোনো দোষ নেই।

---

৩৮. উনওয়ান : ১/৩৭।

৩৯. The Birth of Al- Wahabi Movement by Intel. Col. Sa'id Mahmud Najm Al Amiri, pg. 184

৪০. তাকফির শব্দটির অর্থ হলো কাউকে কাফির প্রতিপন্ন করা এবং তাবদি শব্দটির অর্থ কাউকে বিদআতি প্রতিপন্ন করা। এখানে অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমকে কাফির বা বেদআতি বলা বোঝানো হয়েছে।

আহলুস সুন্নাতের কোনো ইমাম কবরের ওপর মাজার নির্মাণ হারাম বলে ফাতওয়া দেননি। বড়জোর সেটা ক্ষেত্রবিশেষে মাকরুহ হতে পারে। ইমাম ইবনু দাউদ আল-হাম্বলি রাহ. তাঁর বইয়ে এ বিষয়ে বলেন, ولم يقل احد من العلماء انه من الكبائر

উলামাদের কেউই বলেননি, সেটা (কবরের উপর মাজার ইত্যাদি নির্মাণ করাটা) কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।[৪১]

তা ছাড়া সাহাবায়ে কিরামের মাজার ধ্বংস করাটা আহলুস সুন্নাতের চার মাজহাবের কাছে অত্যন্ত গর্হিত কাজ হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে। ফলে নজদি অন্য ফন্দি আঁটেন। ইবনু মুআম্মারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মাজারটি ধ্বংসের জন্য তাঁর সহায়তা চান। ক্ষমতালোভী ইবনু মুআম্মার তখনই ৬০০ সেনাবাহিনী নিয়ে নজদির সমর্থনে বেরিয়ে পড়েন। এভাবে মুআম্মারের সহায়তায় ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি প্রিয়নবি সাঃ-এর উক্ত সাহাবির মাজারটি ভেঙে ফেলেন। খবরটি যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন সেখানকার মুসলিমরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কারণ, অলি ও নবিদের মাজার হলো মানাজিলুর রহমত। এগুলো জিয়ারত, তাবাররুক ও তাওয়াসসুলের স্থান।

এদিকে সংবাদটি আল-আহসার শাসক সুলায়মানের কানে গেলে তিনি ইবনু মুআম্মারকে পত্রমারফত নজদিকে হত্যার আদেশ দেন; কিন্তু নজদের রাজা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ইবনু মুআম্মার তাঁর আদেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। ফলে সুলায়মান মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবকে নজদ পরিত্যাগের আদেশ দেন। নজদি তখন তাঁর প্রলোভনের মোক্ষম অস্ত্রটি পুনরায় ব্যবহার করেন এবং সুলায়মানকে নজদের রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখান; কিন্তু এবার আর সফল হতে পারেননি। সুলায়মান তাঁর প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দেন। ফলে নজদি বাধ্য হয়ে আইনিয়া ছেড়ে নজদের দিরিয়াতে চলে আসেন।

ওয়াহাবিবাদের নামকরণ

ওয়াহাবিদের 'ওয়াহাবি' নামে নামকরণ করা হয় মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাবের নাম হতে। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাবকে সংক্ষিপ্তাকারে ইবনু আব্দিল ওয়াহহাবও বলা হতো। এই নামে থাকা 'ওয়াহাব' শব্দ হতে ওয়াহাবিদের নামকরণ করা হয়। আব্দুল ওয়াহাব ছিলেন মুহাম্মদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাবের পিতা। তবে যেহেতু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাবকে সংক্ষিপ্তাকারে ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব বলা হত, সেহতু সম্ভবতঃ তাঁর অনুসারীদের ওয়াহহাবী নামে নামাঙ্কিত করা হয়।

ওয়াহাবিদের নামকরণ নিয়ে কতিপয় মানুষ ভ্রম বশতঃ বলে থাকেন যে, নজদে যখন ওয়াহাবিদের আন্দোলনের সূচনা ঘটে তখন তাদের প্রতিপক্ষ উসমানীয় শাসকগণ ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদেরকে ওয়াহাবি নামে নামকরণ করে। এটি একটি ঐতিহাসিকভাবে ভিত্তিহীন রটনা। আমরা যদি ইতিহাসের পাতা ওলটাই এবং একটু গভীরভাবে গবেষণা করি, তাহলে দেখবো যে, ওয়াহাবি নামটি নজদী আন্দোলনের সমসাময়িক এবং তৎপরবর্তী ওয়াহাবি মতাদর্শীগণ সগর্বে ব্যবহার করতেন। উদাহরণস্বরূপঃ ১৩৪৪ হিজরী সনে আধুনিক সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা এবং ওয়াহাবিদের ইমাম আব্দুল আযীয ইবনু সৌদের নির্দেশে ওয়াহাবিদের পাঁচ ইমামের পত্রাবলীর একটি সংকলন পুস্তক প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল 'আল হাদিয়্যাতুস সুন্নিয়্যাহ ওয়াত তুহফাতুল ওয়াহহাবিয়্যাতুন নাজদিয়্যাহ', এছাড়া ওয়াহাবিদের ফতোয়া সংকলন 'আদ দুরারুস সানিয়্যাহ' এর ষোড়শ খণ্ডের ৪৫২ পৃষ্ঠায় ওয়াহাবিদের জনৈক ইমামের কাব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেখানে তিনি সগর্বে কাব্যচ্ছলে বলছেন, 'نعم نحن وهابية حنفية' অর্থাৎ 'হ্যাঁ আমরা হলাম ওয়াহাবি ও হানাফিয়া (বনূ হানীফা গোত্রের মানুষদের হানাফিয়া বলা হয়)।" এছাড়াও ওয়াহাবিদের লেখা নানান গ্রন্থাবলীতে তাদের নিজেদেরকে ওয়াহাবী হিসেবে ঘোষণা করতে দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ওয়াহাবিদের নামটি 'উসমানীয় প্রদত্ত' এধরনের প্রচলিত কথাগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

৪১. আস-সাওয়ায়িক : ৪৪৬

তৃতীয় অধ্যায়

দিরিয়া : দুই ইমামের রঙ্গভূমি

দিরিয়া একটি ঐতিহাসিক নাম। নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাজার বছরের ইতিহাস। দিরিয়ার প্রতিটি অণুতে গ্রথিত আছে ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রের গল্প। প্রিয়নবি সাঃ-এর যুগে দিরিয়ার বনু হানিফার ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ ও তৎপরবর্তী সময়ে ভণ্ডনবি মুসায়লামাকে দিরিয়াবাসীর সমর্থন প্রদানের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ভৌগোলিকভাবে দিরিয়া দক্ষিণ নজদের ইয়ামামার আরিজ প্রদেশে অবস্থিত। দিরিয়ার উত্তরে হুরায়মালা, দক্ষিণ-পশ্চিমে জুরমার বালুসমুদ্র এবং পূর্বে রিয়াদের অবস্থান। ১১৫৭ বা ৫৮ মতান্তরে ৬০ হিজরিতে মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি যখন আইনিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে দিরিয়াতে আসেন, তখন এর শাসনকর্তা ছিলেন আমির মুহাম্মাদ ইবনু সৌদ।

দুই ইমামের শপথ

দিরিয়াতে আসার পর শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু সুয়াইলিমের বাড়িতে আশ্রয় নেন নজদি। সে সময় নজদির ফিতনা ও তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি তৎপরতার খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে প্রথমদিকে আবদুল্লাহ তাঁকে আশ্রয় দিতে ইতস্ততবোধ করতে থাকেন; কিন্তু পীড়াপীড়ির কারণে শেষমেশ অনুমতি প্রদান করেন। এদিকে তাঁর নজদে আসার খবর দিরিয়ার আমির ইবনু সৌদের কানে গেলে, তিনি অবস্থা গুরুতর দেখে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি আবদুল্লাহর ঘরে গেলে নজদি তাঁর সঙ্গে সে কাজটাই করলেন, যা তিনি এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন শাসকের সঙ্গে করে এসেছেন। তিনি তাঁকে নজদের শাসক হওয়ার লোভ দেখালেন। ইবনু সৌদও এ লোভনীয় প্রস্তাব এড়াতে পারলেন না। ইবনু মুআম্মারের মতো তিনিও তাঁর জালে পা দিলেন। নজদির প্রস্তাবে রাজি হয়ে তিনি তাঁর হাতে বায়আত হলেন। এরপর উভয়ের মধ্যে এ মর্মে চুক্তি হলো যে, ইবনু সৌদ হবেন ওয়াহাবি মতাদর্শীদের রাষ্ট্রীয় আমির বা আমিরুল মুমিনিন; যিনি ইমামুল মুসলিমিন নামে পরিচিত হবেন এবং রাষ্ট্রীয় শাসনভার সামলাবেন। অপরদিকে নজদি হবেন ইবনু সৌদের অধীনে ধর্মীয় গুরু বা গ্র্যান্ড মুফতি; যিনি ধর্মীয় বিষয়াদির ভার নেবেন এবং ইমামুদ দাওয়া নামে পরিচিত হবেন। উল্লেখ্য, সে সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইবনু সৌদের পরিবার বা আলে সৌদ সৌদিআরবের শাসনভার সামলে আসছে; আর নজদির বংশধর, যাদের আলে শায়খ বলা হয়, তাঁরা দীন-সংক্রান্ত বিষয় দেখে আসছেন। ইবনু সৌদ ও ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের মধ্যে এ ঐতিহাসিক চুক্তি ইতিহাসের পাতায় 'দিরিয়া চুক্তি' নামে পরিচিত। এ চুক্তির মাধ্যমে শুরু হলো, ওয়াহাবিদের নতুন করে পথচলা। দিরিয়া পরিচিত হলো, ইমারাতে দিরিয়া নামে। সেটা হয়ে উঠল দুই ইমামের রঙ্গমঞ্চ। ইবনু আবদুল ওয়াহহাব তাঁর তৈরি তাওহিদের বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা দিলেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইবনু আবদুল ওয়াহহাব তাওহিদের বিকৃতি সাধন, এরপর তাঁর সেই তাওহিদের ওপর ভিত্তি করে তাকফিরের যে উসুল বানিয়েছিলেন, সেই উসুল অনুযায়ী ওয়াহাবি মতাদর্শ ছাড়া সব মুসলিম তাঁর কাছে কাফির হিসেবে পরিগণিত ছিল। তিনি জাহিরি মতাদর্শী হওয়ায় আহলুস সুন্নাতের কাছে স্বতঃসিদ্ধ বহু জিনিসকে তিনি শিরকে আকবার হিসেবে পরিগণ্য করতে থাকেন। এ ছাড়া তাঁর একটি ভয়ংকর ভ্রান্তি ছিল, তিনি আমলকে আকিদার সঙ্গে সংযুক্ত করতেন এবং আমলকে ইমানের মৌলিক অংশ হিসেবে মনে করতেন যেমনটি অন্যান্য

খাওয়ারিজরা করে বেড়াত। ফলস্বরূপ ইসতিগাসা, ইসতিআনা, তাওয়াসসুল, তাবাররুকের মতো বৈধ জিনিসকে তিনি শিরক জ্ঞান করে, এসবের কারণে মুসলিমদের কাফির ও মুশরিক ফাতওয়া দেওয়া শুরু করেন। এ বিষয়ে আমরা তাকফির-সংক্রান্ত অধ্যায়ে দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আলে সৌদের পরিচয়

সৌদিআরবের ইতিহাসের সঙ্গে আলে সৌদ নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সৌদ নামটি থেকেই মূলত সৌদিআরব নামের উৎপত্তি। আলে সৌদ বলা হয়, দিরিয়া শাসক মুহাম্মাদ ইবনু সৌদ ইবনু মুকরিন ইবনু মারখানের বংশধরদের। প্রথম ওয়াহাবি রাজ্যের প্রথম শাসক মুহাম্মাদ ইবনু সৌদ ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে নজদের দিরিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ তথা আলে সৌদের বংশসূত্র নিয়ে ইতিহাসে ধোঁয়াশা রয়েছে। অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থে আলে সৌদের বংশ সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ইতিহাসে তাদের পূর্বসূরিদের সম্পর্কে যে সামান্য তথ্য মেলে, সেখানে মোটাদাগে দুটি মত পাওয়া যায়।

পরবর্তী সময়ে ওয়াহাবি ইতিহাসবিদরা যেসব ইতিহাসগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, সেসবের তথ্যমতে ইবনু সৌদ বংশপরম্পরায় আরবি আনাজা গোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়। সৌদি রাষ্ট্রদূত হাফিজ ওয়াহবা লেখেন, 'আলে সৌদ আনাজা গোত্রের শাখা মাসালিখ থেকে নির্গত'।[৪২] কিছু ঐতিহাসিক সূত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। এসব সূত্রমতে আলে সৌদের বংশসূত্র আরবি আনাজার সঙ্গে মেলে না। ইউসুফ কামিল হানানা লিখেছেন, 'ইবনু সৌদ আরবি কোনো গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নন; না ইসলামপূর্ব সময়ের, না ইসলামি যুগের।'[৪৩]

কিছু ইতিহাসবিদের মতে ইবনু সৌদের এক পুর্বপুরুষ ইতিহাসে মারখান নামে প্রসিদ্ধ—তাঁর আসল নাম ছিল মারদেখাই (Mordecai)। ধর্মগতভাবে তিনি ছিলেন ইয়াহুদি। পরিচয় গোপন রাখতে তাঁর নতুন নাম 'মারখান' রাখেন। সৌদিআরবের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নাসির সায়িদ এ মত পোষণ করেছেন। মারদেখাইর নজদ ভ্রমণের কাহিনি উল্লেখপূর্বক তিনি লিখেছেন, 'আর এভাবে ইয়াহুদি মারদেখাই নজদে পৌঁছল...। তাকে কাসিম ও আরিজ ছেড়ে আহসান চলে যেতে বাধ্য করা হলো। সেখানে গিয়ে তার নাম সামান্য পরিবর্তন করে মারদেখাই থেকে মারখান রাখল।'[৪৪] নজদির সমসাময়িক বিখ্যাত নাবাতি কবি হুমায়দান শুয়াইয়ির তাঁর কবিতার একটি পঙ্‌ক্তিতে এ মত উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'মুহাম্মাদ ইবনু সৌদ ইয়াহুদি বংশোদ্ভূত।' তিনি ওই কবিতায় মারদেখাইর নাম উল্লেখ করেছেন। শায়খ আবদুল ওয়াহহাব শাম্মারি লিখেছেন, 'মুহাম্মাদ ইবনু সৌদও ছিলেন ইয়াহুদি বংশোদ্ভূত এবং বংশপরম্পরায় তিনি ইয়াহুদি মারদেখাই ইবনু ইবরাহিম ইবনু মুশির সঙ্গে মিলিত হন।'[৪৫]

নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে আলে সৌদ বংশধরদের ব্যাপারে বিশদ তথ্য পাওয়া যায় না। যা তথ্য পাওয়া যায়, তার মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। এ কারণে সঠিক মত কোনটি তা নির্ণয় করা কঠিন। তারিখে আলে সৌদ বইয়ে একটি তথ্য এমনও পাওয়া যায়, ১৯৪৩ সনে সৌদ পরিবারের নির্দেশক্রমে আবদুল্লাহ ইবনু ইবরাহিম নামক ব্যক্তি আলে সৌদের শাজারা তথা কুলজি পরিবর্তনের অপচেষ্টা করেছিলেন। তিনি আলে সৌদের প্রকৃত বংশসূত্রে পরিবর্তন এনে আলে সৌদদের আহলে বায়তদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছিলেন।
যাইহোক, উপরে উল্লেখিত মারদেখাই বা মারখানের বংধরদের মধ্য থেকে সৌদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুকরিন ছিলেন দিরিয়া প্রদেশের ত্রয়োদশতম আমির। পাশাপাশি তিনি ছিলেন আলে সৌদ বংশের পিতা যার নামানুসারে এ বংশকে আলে সৌদ নামে অভিহিত করা হয়। সৌদ ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দিরিয়াতে রাজত্ব করেন। তিনি মানি বংশীয় সরদার ছিলেন, যা বংশ পরম্পরায় মানে ইবনু রাবিয়া মুরায়দির সঙ্গে মিলিত হয়। সৌদ পুত্র মুহাম্মাদ তাঁর পরে দিরিয়াতে শাসক নিযুক্ত হন। এ ব্যক্তি হলেন আলোচ্য অধ্যায়ে বর্ণিত ইবনু সৌদ যিনি ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সঙ্গে মিলিত হয়ে নজদের বুকে প্রথম ওয়াহাবি ইমারত কায়িম করেন।

আরিজের সরদারকে গুপ্তহত্যা

৪২. জাজিরাতুল আরাব ফিল কারনিল ইশরিনে : ২৪৩।
৪৩. আল-মাসআলাতুল হিজাজিয়া
৪৪. তারিখু আলে সৌদ : ১৫
৪৫. হারাকাতুল ওয়াহহাবিয়া : ২১

দিরিয়ারাজ মুহাম্মাদ ইবনু সৌদ ও নজদির মধ্যে দিরিয়া চুক্তি সম্পাদনকালে ইবনু সৌদ ধর্মীয় বিষয়াদিতে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের প্রতি একান্ত আনুগত্য প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর রাজকার্যে সব ধর্মীয় বিষয়াদিতে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের নির্দেশ মেনে চলতেন। অপরদিকে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবও ইবনু সৌদকে বেশ সমীহ করে চলতেন। যেন একই আত্মার দুই দেহ। তাদের পারস্পরিক আনুগত্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে শায়খ খাজাল বলেন, 'নজদির মতামত ছাড়া আমির মুহাম্মাদ ইবনু সৌদ কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কিংবা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেন না। নজদি কোনো বিষয়ে রাজি হলে আমিরও রাজি হয়ে যেতেন। আর তিনি কোনো বিষয় অপছন্দ করলে আমিরও তা অপছন্দ করতেন।'[৪৬]

এভাবে ইবনু সৌদকে সঙ্গে নিয়ে নজদি দিরিয়াতে তাঁর ওয়াহাবি দাওয়াত জোরেশোরে শুরু করলেন। মানুষকে ডাকতে থাকলেন তাঁর প্রচারিত তথাকথিত তাওহিদের দিকে। তিনি তাঁর প্রচারিত মতাদর্শকে একমাত্র সত্য বলে মনে করতেন এবং তাঁর মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী ছাড়া অন্যান্যদের তিনি মুসলিম হিসেবে গণ্য করতেন না, বরং তাদের কাফির ও মুশরিক আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধবাদী যদি কোনো বড় ইমামও হতেন, তিনি ও তাঁর অনুসারীরা তাঁকেও মুশরিক আখ্যায়িত করতেন। ইমাম ইবনু দাউদ রাহ. ওয়াহাবিদের এ চরিত্রের কথা উল্লেখ করেন,

> তারা মানুষকে তার দিকে (কুরআন ও সুন্নাহে তাদের অপব্যাখ্যার দিকে) আহ্বান করে, এমনকি তাদের মধ্যে ইতরশ্রেণী যারা আলিফ, বা, তা, সা, (অর্থাৎ, যার মৌলিক জ্ঞান নেই) জানে না, তারা যখন কোনো আকাবির-উলামাদের সঙ্গে মেলে—যদি ধরে নেওয়া হয়, উক্ত ব্যক্তি মর্যাদার দিক থেকে ইমাম আহমাদ রাহ.-এর সমপর্যায়ের, তাঁকে পর্যন্ত সে এটাই বলবে, "আমি আপনাকে কিতাবুল্লাহর দিকে আহ্বান করছি"। যদিও কি না সে (অর্থাৎ, ইতর ব্যক্তি) সুরা ফাতিহার একটি আয়াত ছাড়া আর কিছু ঠিকঠাক পড়তে পারে না, আর না নামাজও সঠিকরূপে আদায় করতে পারে। এমনকি আমি তাদের অসংখ্যাবার বলতে শুনেছি, তারা তাদের সাধারণ লোকেদের বলে বেড়ায়, "আমার বিরুদ্ধে যদি এ অঞ্চলের উলামারা জড়ো হয়, আমি তাদের পরাজিত করব এবং তাদের বিরুদ্ধে কুরআন থেকে দলিল পেশ করব।" প্রায়শ তাদের চিঠিপত্র ও কল্পকাহিনী যাকে তারা স্মারক বলে থাকে, তাতে তারা লেখে, "মুআহহিদিনদের একজন শতজন মুশরিকদের পরাজিত করে থাকে"। তারা মুআহহিদিন বলতে নিজেদের অর্থ নেয়, আর মুশরিকিন বলতে তাদের ছাড়া বাকিদের (মুসলিমদের) অর্থ নেয়। আল্লাহ তাআলা (ইমাম) শাফিয়ি (রাহ.)-কে রহম করুন যিনি বলেছেন, "আমার সহিত কোনো আলিম যখনই বিতর্ক করেছেন আমি তাঁকে পরাজিত করেছি; কিন্তু আমার সাথে কোনো মূর্খ যখন বিতর্ক করেছে সে আমায় পরাজিত করেছে।'[৪৭]

ওয়াহাবিদের এ ধরনের তাকফিরের ভয়াবহতা উঠে এসেছে হাজি মালিক বিহের গ্রন্থে। তিনি লেখেন, 'এ অঞ্চলের ওয়াহাবি নেতারা এ বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হয়ে আছে, যারা ওয়াহাবি নয়, তারা হলো মুশরিক। কাজেই তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি।'[৪৮] নজদির তাকফির বিষয়ে ইরাকের বিশিষ্ট আলিম এবং আরবি সাহিত্যিক শায়খ জামিল সিদকি লিখেছেন, 'বিশুদ্ধ মুসলিম আর মুত্তাকি হলেও তাঁকে অনুসরণ না করলে নজদি তাদের কাফির-মুশরিক আখ্যা দিতেন।'[৪৯] নজদি তাঁর বিরোধী কাউকে প্রকাশ্যে হত্যা করতে না পারলে গুপ্তহত্যার চেষ্টা করতেন। তাঁর সময়কার নজদের বিখ্যাত আলিম ইবনু হুমায়দ হাম্বলি এ শিহরণ-জাগানো তথ্যটি তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায়, 'কেউ তাকে পরিত্যাগ অথবা খণ্ডন করলে তিনি তাকে প্রকাশ্যে হত্যা করতে না পারলে গুপ্তচর পাঠিয়ে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে দিতেন।'[৫০] ইবনু হুমায়দ তাঁর বইয়ে আরও তথ্য দিয়েছেন যে, একদা মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি তাঁর ভাই সুলায়মানকে গুপ্তহত্যার চেষ্টা করেন। যেহেতু শায়খ সুলায়মান ইবনু আবদুল ওয়াহহাব একজন কট্টর ওয়াহাবিবিরোধী ছিলেন এবং ওয়াহাবি তাকফিরিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

শায়খ নজদি দিরিয়াতে মোটামুটি প্রভাব বিস্তারের পর নজর দেন আরিদ অঞ্চলের দিকে। তখন আরিদ বলা হতো বর্তমান রিয়াদকে। আরিজের সরদারের নাম ছিল আদহাম ইবনু দাওয়াস। অনেকে বলেন তাঁর নাম ছিল দাহহাম ইবনু দাওয়াস। তিনি নজদি মতাদর্শের বিরোধী ছিলেন। ফলে নজদি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দাহহাম বাধ্য হয়ে ওয়াহাবিরাজ্য দিরিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। প্রায় ১৭ বছর ইবনু সাউদের বিরুদ্ধে

৪৬. হায়াতুশ শায়খ : ২৬৫

৪৭. আস-সাওয়ায়িকু ওয়ার রুয়ুদ : ০৮-০৭

৪৮. আল-হাকায়িকে : ১৫

৪৯. আল-ফাজরুস সাদিক : ১২

৫০. আস-সুহুবুল ওয়াবিলাহ : ২৭৬

লড়াই চালিয়ে যান। ইবনু সাউদের মৃত্যুর পর তিনি আরও প্রায় ১৩ বছর ওয়াহাবি রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান।

এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় ৪ হাজার মানুষ হতাহত হয়। যুদ্ধ করতে করতে একপর্যায়ে বিরক্ত হয়ে পড়েন দাহহাম। নিরীহ মানুষের কথা চিন্তা করে তিনি রাজ্য পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর রিয়াদবাসীকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে রিয়াদবাসী, তোমরা জানো আমি ইবনু সাউদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করেছি। তবে এখন আমি যুদ্ধে বিরক্ত হয়ে (রিয়াদ) শহর তাকে দিয়েছি। কাজেই তোমাদের যে আমার সঙ্গে যেতে চায়, সে আমার সঙ্গে আসুক; আর যে শহরে থাকতে চায়, সে থাকুক।' এরপর তিনি রিয়াদ থেকে খারজ মতান্তরে আহসা অভিমুখে যাত্রা করেন। তবু শেষ রক্ষা হয়নি তাঁর। নজদির পরামর্শে এক ভাড়াটে গুন্ডা তাঁকে হত্যা করে ফেলে। ওয়াহাবি ইতিহাসবিদরা দাহহামের শাহাদাতের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও 'তারিখু আলে সৌদ'-সহ ঐতিহাসিক অন্যান্য প্রমাণ এ বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের স্বাক্ষর হয়ে আছে। আদহাম হত্যার পর রিয়াদ অঞ্চলে ওয়াহাবিদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

আইনিয়ার শাসক উসমান (১১৬৩ হি.) কে গুপ্তহত্যা

আইনিয়া হলো রিয়াদের পার্শ্ববর্তী এলাকা। ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির সময় এখানকার অধিপতি ছিলেন উসমান ইবনু মুআম্মার। উসমান পরিবারের সঙ্গে নজদি পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নজদির পিতা উসমানের অধীন কাজি ছিলেন। এ জন্য নজদি হুরায়মালা থেকে বিতাড়িত হয়ে আইনিয়াতে এলে উসমান তাঁকে হার্দিক অভিনন্দন জানান। তাঁর অধীন এবং প্রখ্যাত কাজির ছেলে হিসেবে তিনি তাঁকে স্নেহ-সমাদর করতেন। একপর্যায়ে তাঁর আদরের কন্যা জাওহারাকে তাঁর হাতে তুলে দেন। আইনিয়াতে থাকাকালে নজদিকে তিনি সর্বতোভাবে সহায়তা করেন। এমনকি ওয়াহাবি মতাদর্শে প্রভাবিত হয়ে নজদি ও ইবনু সাউদের কাছে তিনি বেশ কিছুকাল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন; কিন্তু ইবনু সৌদের সঙ্গ পাওয়ার পর নজদি ও তাঁর অনুসারীদের উগ্রতা দেখে উসমান ওয়াহাবি মতাদর্শ সম্পর্কে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেন। নজদির পথভ্রষ্টতা বুঝতে পেরে তিনি নজদিবিরোধী আহলুস সুন্নাতের কাফেলাতে যোগ দেন।

সেন্ট জন ফিলবি[৫১] উল্লেখ করেছেন, 'উসমান নিজের ভুল বুঝতে পেরে আহসার শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আফালিকের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলেন। ইবনু আফালিক ছিলেন নজদের প্রসিদ্ধ একজন হাম্বলি ফকিহ। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল দিগ্‌দিগন্তে। নজদে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের থেকে ফিতনা প্রকাশ পেলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে মসিযুদ্ধ শুরু করেন। একবার তিনি পত্রমারফত কিছু মাসআলার উত্তর জানতে চাইলে নজদি সেগুলোর জবাব দিতে পারেননি।'[৫২] এই ঘটনাটি ইমাম আলাবিও উল্লেখ করেছেন, 'মুহাম্মাদ ইবনু আফালিক নজদিকে যা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি একটারও জবাব দিতে পারেননি।'[৫৩] নজদির মতাদর্শ খণ্ডনে ইবনু আফালিকের বেশকিছু গ্রন্থ রয়েছে।
এখানে ইবনু আফালিকের কথা আলোচনার কারণ হলো, উসমান প্রথমদিকে যখন নজদির প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁকে সর্বতোভাবে সহায়তা করছিলেন, তখন ইবনু আফালিক رسالة في الرد على رسالة عثمان بن معمر الوهابي শীর্ষক পত্রের মাধ্যমে উসমানের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। পরবর্তীতে উসমান নিজের ভুল বুঝতে পেরে ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে ইমাম ইবনু আফালিক রাহ.-এর একজন সহযোদ্ধাতে পরিণত হয়েছিলেন।

নজদির কাছে তাওহিদবিরোধী এবং তাঁর ফাতওয়ায় মুশরিক পরিগণ্য ইবনুল আফালিকের সঙ্গে উসমানকে যোগাযোগ স্থাপন করতে দেখে নজদি আক্রোশে ফেটে পড়েন এবং তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হন। উসমান অত্যন্ত প্রভাবশালী শাসক হওয়ায় নজদি তাঁকে প্রকাশ্য-হত্যায় অপরাগ হয়ে বেছে নেন গুপ্তহত্যার পথ।

১১৬৩ হিজরির রজব মাস। জামিউল আইনিয়া আল-কাবির মসজিদে জুমুআ পড়তে যান উসমান। সেখানে নজদির ভাড়াটে গুন্ডা হামাদ ও ইবরাহিম তাঁকে হত্যা করে। নাসির সায়িদ এ মর্মান্তিক ঘটনা উল্লেখপূর্বক বলেন, 'এরপর তারা (ওয়াহাবিরা) আইনিয়ার শাসক উসমানকে হত্যার জন্য হামাদ ইবনু রাশিদ, ইবরাহিম ইবনু জায়িদসহ কতিপয় ভাড়াটে গুন্ডাকে পাঠায়। তারা তাঁকে জুমুআর সালাতে হত্যা করে।'[৫৪] ওয়াহাবি ইতিহাসবিদ হুসাইন ইবনু গানাম তাঁর 'তারিখু নজদ' এবং বিশর তাঁর 'উনওয়ানুল মাজদ' এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। ইবনু গানাম তাঁর গ্রন্থে

৫১. বর্তমান সৌদি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল আজিজ ইবনু সৌদের পরামর্শদাতা, কট্টরপন্থি জায়নবাদী ব্রিটিশের এজেন্ট সেন্ট জন ফিলবি শায়খ আবদুল্লাহ নামেও পরিচিত।
৫২.তারিখু নজদ : ৭১
৫৩. মিসবাহ : ৪
৫৪. তারিখু আলে সৌদ : ২১

ঘটনাটি উল্লেখপূর্বক বলেন, 'তাওহিদবাদীরা ইবনু আফালিকের সঙ্গে উসমানের যোগাযোগের কথা জেনে তাঁকে হত্যার মনস্থ করে। পরে তারা একদিন জুমুআর নামাজ শেষে মসজিদেই তাঁকে হত্যা করে ফেলে।' ঘটনাটি ১১৬৩ হিজরিতে ঘটে।[৫৫]

উসমান হত্যার পর নজদি আইনিয়া দখল করে নেন। এরপর সেখানে শুরু হয় ওয়াহাবি তাণ্ডব। তাকফির ও হত্যাকাণ্ডের ফলে চারিদিকে বিরাজ করছিল বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। তখন ওয়াহাবি ইমারত দিরায়ার পক্ষ থেকে আইনিয়ার মসনদে বসেন ইবনু মুআম্মার মিসরি।

এদিকে আইনিয়ার যারা ওয়াহাবি মতাদর্শ গ্রহণ করেনি, নজদি তাদের ওপর কুফরের হুকুম লাগালে তারা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ওয়াহবিদের নির্মূলে তারা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে; কিন্তু অস্ত্রসজ্জিত দিরিয়াবাহিনীর মোকাবিলায় সেই প্রতিরোধ বেশিদিন টেকেনি। ইবনু সৌদ তখন আইনিয়াবাসীর ওপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালান। কিছুদিন যাবৎ ভয়াবহ ওয়াহাবি বিভৎসতা দেখার পর অবশেষে ওয়াহাবিদের হাতে পতন ঘটে আইনিয়ার। হকের প্রভাকর মিলিয়ে যায় অঞ্চলটির দিগন্তের লালিমায়।

আইনিয়াতে ইবনু সৌদ ও ওয়াহাবিদের বর্বরোচিত আক্রমণের বিবরণ দিতে গিয়ে নাসির সায়িদ লিখেছেন, 'তারা আইনিয়ার দেয়াল ও ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলেছিল। শকুনের মতো চিরে ফেলেছিল মহিলাদের গর্ভ। নিষ্পাপ শিশুদের অঙ্গ কেটে নিক্ষেপ করছিল আগুনে। নজদের ৪০ কিলোমিটার বিস্তৃত আইনিয়া প্রদেশে—যেখানকার শান্তিপ্রিয় জনগণ ভোরের আজান আর পাখির ডাক শুনে দিন শুরু করতেন; যেখানকার শিশু ও পাখিরা মাগরিবের আজান শুনে শুনে নীড়ে ফিরত—সেখানে শুরু হলো গণহত্যা। শহিদের রক্তে স্নাত হলো আইনিয়ার মরুভূমি। শুরু হলো, তথাকথিত তাওহিদ প্রতিষ্ঠার নামে জালিমের নির্দয় অত্যাচার আর মাজলুমের করুণ হাহাকার।[৫৬]

হুরায়মালার আমির ইবনু মুবারক (১১৬৫ হি.) কে হত্যা

হুরায়মালা হলো রিয়াদের দক্ষিণ প্রান্তের একটি এলাকা। হুরায়মালা শব্দটি হারিমালা শব্দের তাসগির। এটি একটি প্রাচীন অঞ্চল। জাহিলি যুগের কবিতায় এ অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। অঞ্চলটির নামকরণ সম্পর্কে জানা যায়, প্রাচীনকালে এখানে কোনো এক উদ্যান ছিল। সে উদ্যানের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় হুরায়মালা। আবার এটাও শোনা যায়, কোনো এক পানির উৎসের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম হুরায়মালা রাখা হয়। কেউ কেউ বলেন, এখানে হারমাল বা হারমিল নামের ছোট ছোট উদ্ভিদ জন্মাত, সে নাম থেকে হুরায়মালা নামটির উৎপত্তি।

নজদির ফিতনাকালে হুরায়মালার শাসক ছিলেন ইবনু মুবারক এবং এর কাজি ছিলেন নজদির ভাই সুলায়মান। সুলায়মান ছিলেন কট্টর ওয়াহাবিবিরোধী। আপন ভাইয়ের এ ধরনের পদস্খলন তাঁকে সর্বদা পীড়া দিত। একবার তিনি ওয়াহাবিদের উদ্দেশে বলেন, 'অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ ফিরকায়ে নাজিয়াকে কিছু বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত করেছেন, অনুরূপভাবে আহলে ইলমদেরও; কিন্তু তোমাদের মধ্যে সেগুলোর একটি গুণও নেই।'

১১৬৫ হিজরিতে হুরায়মালাবাসী সুলায়মানের নেতৃত্বে ওয়াহাবিদের বিরোধিতা শুরু করে। তাদের বিরুদ্ধে যাওয়ায় নজদি ও তাঁর অনুসারীরা হুরায়মালাবাসীকে গণহারে তাকফির করা শুরু করে। যে কারণে ওয়াহাবি ইতিহাসবিদ ইবনু গানাম একে ইরতাদ বা ইসলাম ত্যাগ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'আর এ বছরের (১১৬৫ হিজরি) শাওয়ালে হুরায়মালাবাসী মুরতাদ হয়ে গেল। তখন সেখানকার কাজি ছিলেন ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের ভাই সুলায়মান।'[৫৭]

ফলে ওই বছর ওয়াহাবি ইমারতে দিরিয়ার আমির ইবনু সৌদ এবং তাদের ধর্মগুরু ইবনু আবদুল ওয়াহহাব হুরায়মালায় আক্রমণ করেন। ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পর তাঁরা সেখানকার শাসক আমির ইবনু মুবারককে সিংহাসনচ্যুত করে হুরায়মালা দখল করেন। পরে ওয়াহাবিদের পক্ষ থেকে এ অঞ্চলের আমির নিযুক্ত হন আবদুল আজিজ মুবারক ইবনু উদওয়ান। ওয়াহাবিরা হুরায়মালা দখলের কিছুদিনের মধ্যেই আমির ইবনু মুবারককে হত্যা করা হয়। সুলায়মান তখন সুদায়র নামক স্থানে চলে যান।

৫৫. তারিখু নজদ : ১০৩

৫৬. তারিখু আলে সৌদ : ২১-২২

৫৭. তারিখু নাজদ : ১০২

ওয়াহাবিরা এ যুদ্ধকে কাফিরদের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় হিসেবে দেখে থাকে। ইবনু গানাম এ ঘটনার বিবরণ উল্লেখপূর্বক বলেন, 'আবদুল আজিজ গনিমত নিয়ে এলে নজদি তা নবিজির সুন্নাত ও সালাফদের বক্তব্যে বর্ণিত নিয়মে বন্টন করে দেন।'[৫৮] মুসলিমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর যে সম্পদ অর্জন করেন, তাকে গনিমত বলে। ওয়াহাবিরা হুরায়মালাবাসী মুসলিমদের কাফির মনে করত বিধায় তাদের থেকে অর্জিত সম্পদকে গনিমত হিসেবে পরিগণিত করেছিল। ঐতিহাসিক ইবনু গানাম এবং ইবনু বিশর উভয়েই ওয়াহাবি মতাদর্শের অনুসারী হওয়ার কারণে, তারা ওয়াহাবিবিরোধী মুসলিমদের কাফির ও মুশরিক হিসেবে দেখিয়েছেন।

অবশ্য ওয়াহাবিদের দখলদারিত্ব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। হুরায়মালাবাসী তাদের অত্যাচারে অসহ্য হয়ে বিদ্রোহ করে এবং ইবনু উদওয়ানকে তাড়িয়ে দেয়। কিছুদিন পর ইবনু উদওয়ানের কথাতে তাঁর গোত্র ইবনু হামাদের অনুরোধক্রমে একরাতে হুরাইমালাতে ফিরে আসেন। পরদিন এই খবর চাউড় হলে ফের হুরাইমালাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রোধান্বিত হুরাইমালাবাসী ইবনু উদওয়ানকে হত্যার মাধ্যমে সেখানকার ওয়াহাবিবাদের সমাধি রচনা করে।

মানফুহাবাসীর বিদ্রোহ

মানফুহা হলো, রিয়াদের দক্ষিণ প্রান্তের ছোট্ট প্রাচীন একটি ঐতিহাসিক গ্রাম। ইতিপূর্বে ওয়াহাবিরা একটি আক্রমণের মাধ্যমে গ্রামটি দখল করে মুহাম্মাদ ইবনু সালিহকে সেখানকার ওয়ালি নিয়োগ দেয়। ওয়াহাবিদের তাকফির, হত্যাকাণ্ড, দীনের মধ্যে বিকৃতি প্রভৃতি ফিতনায় মানফুহার পরিস্থিতি অস্থির হয়ে ওঠে। ফলে মানফুহাবাসী বিরক্ত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে।

হুরায়মালার পরবর্তী বিপ্লবটি মানফুহাতে সংঘটিত হয়। ১১৬৬ হিজরিতে মানফুহাবাসী ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে ইবনু সালিহকে বিতাড়িত করে। ফলে অল্পদিনের মধ্যে স্বল্পকালের জন্য মানফুহা থেকে বিদায় নেয় ওয়াহাবিবাদ।

এভাবে একে একে নজদ ও হিজাজের বিভিন্ন এলাকা ইমারতে দিরিয়ার অধীনে যেতে থাকে। আবার ওয়াহাবি মতাদর্শের উগ্রতা ও দীনের মধ্যে তাহরিফের কারণে বিভিন্নখানে ছড়াতে থাকে বিদ্রোহের অনল।

ইনকিলাবের সূচনা

নজদের ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলোতে ওয়াহাবিদের প্রভাব দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন এলাকা তাদের দখলে আসার ফলে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। দখলিকৃত অঞ্চলে তারা ওয়াহাবি মতাদর্শ প্রচার করতে শুরু করে। তথাকথিত তাওহিদ প্রতিষ্ঠার নামে তাকফির এবং গণহত্যা শুরু করে। ফলে নজদের ভূমি আবারও উম্মাহর রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে।

ওয়াহাবিরা মানুষের ওপর বলপূর্বক তাদের মতাদর্শকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। যারা তাদের ভ্রান্ত মত-পথকে মানত না, তাদের তারা মুশরিক ও কাফির তকমা দিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হতো। তাদের অস্ত্রাঘাত থেকে বাদ পড়েননি রাব্বানি আলিম-উলামা থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা। নজদে মুসলিমদের রক্ত দিয়ে যেন হোলি খেলা শুরু হয়। ওয়াহাবিদের বর্বরতা কতটা নৃশংস ছিল, তা নিচের ঘটনা থেকে পাঠকমণ্ডলী কিছুটা আঁচ করতে পারবেন।

আধুনিক সৌদ রূপকার আবদুল আজিজ ইবনু সৌদের পরামর্শদাতা ইবনু ওয়াহহাব ইবনু সৌদের মুখে বর্ণিত একটি ঘটনা তুলে ধরেছেন, যা থেকে আলে সৌদ ও ওয়াহাবিদের বর্বরতার একটি চিত্র পাওয়া যায়। ঘটনাটি হলো, 'একবার আলে সৌদের শাসক সৌদ ইবনু আবদুল আজিজ, যিনি ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের শিষ্য ছিলেন, মুতাইর গোত্রের কিছু বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসেন। নিরপরাধ বৃদ্ধদের ছাড়িয়ে নিতে ওই গোত্রের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক সৌদের কাছে সুপারিশ করতে আসেন। সৌদ তাদের হত্যা করে কর্তিত মাথাগুলো মুতাইর গোত্রের নেতৃস্থানীয়দের দস্তরখানে পাঠান। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে মুতাইর গোত্রে আক্রোশের আগুন জ্বলতে শুরু করে।[৫৯]

৫৮. তারিখু নাজদ : ১০৯

৫৯. জাজিরাতুল আরব ফিল কারনিল ইশরিন : ২৪৯

নজদজুড়ে তখন ভয়াবহ থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। ওয়াহাবিদের ভয়ে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছিল। অত্যাচার ও গণহত্যা সহ্যের মাত্রা ছাড়ালে নজদবাসীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তারা অতিষ্ঠ হয়ে ওদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। পুঞ্জীভূত ক্ষোভ নিয়ে ভেতরে ভেতরে দ্রোহের আগুনে জ্বলতে থাকে তারা। একপর্যায়ে এ ক্ষোভ বড় বিপ্লবের সূচনা করে এবং চারদিকে ওয়াহাবিয়াতের মূলোৎপাটনের স্লোগানে কম্পিত হয় নজদের আকাশ-বাতাস। আরবরা ওয়াহাবিদের থেকে মুক্তি পেতে রণসাজে সজ্জিত হতে শুরু করে। এরপর শুরু হলো একটি ঐতিহাসিক বিপ্লব, যা ইতিহাসের পাতায় সাওরাতু বনি ইয়াম বা বনু ইয়ামের বিপ্লব নামে পরিচিত।

বনু ইয়াম বিপ্লব

বনু ইয়াম হলো, প্রাচীন আরবি কাহতানি গোত্রের একটি উপশাখা। এ গোত্রটি একসময় বনু হামাদান নামেও পরিচিত ছিল। প্রথমদিকে বনু হামাদান ছিল মূর্তিপূজক বা মুশরিক গোত্র। আরবে ইসলামের আবির্ভাব ঘটলে তারা দলবদ্ধভাবে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। ইয়ামেনের নিকটবর্তী নাজরানে ছিল বনু ইয়ামের বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি। ওয়াহাবিদের অত্যাচার-নির্যাতনে নজদ যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন নাজরানের তিন গোত্র যথাক্রমে বনু ইয়াম, বনু উজমান ও বনু খালিদ তাদের বিরুদ্ধে লৌহবৎ শপথ নেয় যে, নজদ থেকে ওয়াহাবিদের মূলোৎপাটন না করে তারা স্থির হবে না। ১১৭৮ হিজরি—১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তারা ওয়াহাবিদের তাওহিদের রাজ্য তথা প্রথম সৌদি রাজ্যের রাজধানী দিরিয়ায় আক্রমণের পরিকল্পনা করে। সিদ্ধান্ত হয়, বনু ইয়ামের বীরেরা হাসান ইবনু হিবাতুল্লাহর নেতৃত্বে নাজরান থেকে দিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করবে। বনু খালিদ ও উজমান উরাইয়র খালিদির নেতৃত্বে আহসা থেকে দিরিয়ার দিকে যাত্রা করবে। এরপর যৌথভাবে ওয়াহাবিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দিরিয়াকে ওয়াহাবিয়াতমুক্ত করবে।

পরিকল্পনামাফিক বনু ইয়াম নির্দিষ্ট পথে দিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে এবং বনু খালিদ ও উজমান দিরিয়া পৌঁছুনোর আগেই তারা সেখানে আক্রমণ করে বসে। ইবনু গানাম এ আক্রমণকে মুসলিম দেশে কাফিরবাহিনীর আক্রমণ হিসেবে উপস্থাপন করে লিখেছেন, 'এরপর নাজরানের প্রধান হাসান সমগ্র শহর ও গ্রামবাসীকে জড়ো করলেন। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য ইয়ামেনি গোত্রসমূহও যোগ দিল। পরে তারা হামলে পড়ে মুসলিম দেশকে পদদলিত করলেন।'[৬০]

হিবাতুল্লাহর নেতৃত্বে বনু ইয়াম বীরত্বের সঙ্গে দিরিয়াবাহিনীকে আক্রমণ করে এবং এককভাবেই তাদের বিধ্বস্ত করে ফেলে। ওয়াহাবিবাহিনীর প্রচুর উগ্রবাদীকে হত্যা ও বন্দি করা হয়। ইবনু গানামের মতে, এ যুদ্ধে প্রায় ৪০০ ওয়াহাবিকে (তাঁর মতে মুসলিম সেনা, যেহেতু ওয়াহাবি মতাদর্শের অনুসারীরা কেবল নিজেদের মুসলিম; আর বাকি সবাইকে কাফির মনে করত) হত্যা করা হয় এবং ৩০০ জনকে বন্দি করা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে দিরিয়ার শাসক ইবনু সৌদ আত্মগোপন করেন। দিরিয়া আক্রমণের পরও বনু ইয়াম বিপ্লবীদের থামার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। তারা যেন প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল, ওয়াহাবিদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করা পর্যন্ত থামবে না। ইতিমধ্যে বনু খালিদ আর উজমানও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। তখন পুরোদমে দিরিয়াতে ওয়াহাবিদের সমাধি রচনার কার্যক্রম চলতে থাকে। সমগ্র নজদবাসী বনু ইয়ামের বিপ্লবীদের অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হবে, ঠিক এমন সময় ইবনু সৌদের পক্ষ থেকে শান্তিচুক্তির প্রস্তাব নিয়ে হাজির হন খোদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব। নতিস্বীকার করেন বনু ইয়ামের কাছে।

ইতিহাসবিদ নাসির সায়িদ বলেন, বনু ইয়ামের কাছে নিজের দাওয়াতকে তিনি বাতিল বলে স্বীকার করতে বাধ্য হন। নজদির কথা বিশ্বাস করে বনু ইয়াম, উজমান ও খালিদ শান্তিচুক্তিতে সম্মত হয়। এভাবে ইতি ঘটে সবেমাত্র অঙ্কুরিত হওয়া একটি বিপ্লবের। নজদি তখন শান্তিচুক্তির প্রস্তাব না করলে এ বিপ্লব হয়তো ওয়াহাবিদের পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলত। চুক্তির ফলে বনু ইয়াম তার বিপ্লবের লক্ষ্যে পৌঁছনোর আগেই যুদ্ধ থামিয়ে ফিরে যায়। ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায় প্রথম ওয়াহাবি শাসিত রাজ্য ইমারতে দিরিয়া।

ইবনু সৌদ (১১৯৭ হি.) এর তিরোধান

সাওরাতু ইয়াম বা বনু ইয়াম বিপ্লবে ইয়ামেনি গোত্রগুলোর কাছে ওয়াহাবিরা চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়। এ পরাজয়ের গ্লানি ও আতঙ্ক দিরিয়ার শাসক

৬০. তারিখু নজদ

মুহাম্মাদ ইবনু সৌদকে গ্রাস করে ফেলে। ফলে তিনি স্বল্পকালের মধ্যে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। কিছুদিন রোগে ভোগার পর ১১৭৯ হিজরিতে অর্থাৎ, বনু ইয়াম বিপ্লবের পরবর্তী বছর তাঁর তিরোধান ঘটে।

মুহাম্মাদ ইবনু সৌদের পর ইমারতে দিরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর ছেলে আবদুল আজিজ। মসনদে বসার পর পিতার পদাঙ্ক অনুসারে তিনি ওয়াহাবি ইমাম শায়খ নজদির হাতে বায়আত হন এবং ওয়াহাবি মতাদর্শের প্রচার-প্রসারে মনোনিবেশ করেন। আবদুল আজিজ বনু ইয়ামের সঙ্গে পিতার কৃত চুক্তি ভুলে আবার ওয়াহাবি গোঁড়ামি দিয়ে রাজ্যশাসন শুরু করেন। ফলে নজদজুড়ে ফের দানা বাঁধতে থাকে ওয়াহাবিবিরোধি আন্দোলন।

নজদের আলিম-উলামারা অসি ও মসিযুদ্ধের মাধ্যমে ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে থাকেন। তাদের ফিতনার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকেন জনসাধারণকে। এ সময় নজদের বিখ্যাত আলিম মুহাম্মাদ ইবনু ফিরুজ হাম্বলির শিষ্য আবদুল্লাহ ইবনু দাউদ হাম্বলি ওয়াহাবি মতাদর্শের খণ্ডনে লিখে ফেলেন বিশ্ববিখ্যাত 'আস-সাওয়ায়িকু ওয়ার রুয়ুদ'। এ গ্রন্থে তিনি ওয়াহাবি মতাদর্শের খণ্ডনের পাশাপাশি নজদি ও আবদুল আজিজের বর্বরতার ইতিহাস তুলে ধরে কঠোর সমালোচনা করেছেন। সম্প্রতি আজ-জাবি মাকতাবা থেকে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

বনু ইয়ামের পুনরায় বিপ্লবের প্রচেষ্টা

আবদুল আজিজ মসনদে বসার পর তিনি আবার রিয়াদ, জুরমাসহ বিভিন্ন এলাকায় আক্রমণ করে কথিত তাওহিদ প্রতিষ্ঠার নামে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালান। ফলে ১১৪৯ হিজরিতে হুয়াইল অদআনি ও জাহিদ ইবনু জামিলের নেতৃত্বে কিছু গোত্র আরও একবার বিপ্লব ঘটাতে সচেষ্ট হয়। হুসাইন ইবনু গানাম তাঁর তারিখু নজদে লিখেছেন, জাহিদ ইবনু জামিল ওয়াহাবিরাজ্যে আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলে আবদুল আজিজ পুনরায় তাঁর কাছে চুক্তির জন্য একটি পত্র পাঠান। এ পত্রে তিনি জাহিদকে ইসলামগ্রহণের অনুরোধ জানান। জাহিদ ওয়াহাবি মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন না বিধায় ওয়াহাবিরা তাঁকে কাফির মনে করত। এ জন্য ইবনু সৌদের কাছেও তিনি কাফির বিবেচিত ছিলেন। আর এটাই ছিল জাহিদের কাছে আবদুল আজিজের ইসলামগ্রহণের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠানোর প্রধান কারণ।

জাহিদ বাহিনী নিয়ে ১১৮৯ হিজরিতে নজদের জুরমায় আক্রমণ করেন। বেশ কিছুদিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ইয়ামেনি গোত্রগুলো দিরিয়াবাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়ে পুনরায় ইয়ামেনে ফিরে আসে। পরবর্তী বছর শায়খ সুলায়মান ইবনু আবদুল ওয়াহহাব আল্লাহর উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। জীবনসায়হ্নেও তিনি হকের ওপর অবিচল ছিলেন, এবং ওয়াহহাবিয়াতের বিরুদ্ধে কলম ও জবানি জিহাদ চালিয়ে গেছেন।

বনু খারজের বিদ্রোহ

এ বছর অর্থাৎ, ১১৯০ হিজরিতে রিয়াদের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের খারজবাসী ওয়াহাবিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ইবনু জামিলের কাছে সহায়তা চেয়ে দূত পাঠায়। ইবনু জামিলের কাছে খারজবাসী দূত পাঠানোয় ওয়াহাবিরা গণহারে তাদের তাকফির করে মুরতাদ ঘোষণা করে। ইবনু গানাম এ বিষয়ে লিখছেন, 'এরপর আহলে খারজ মুরতাদ হয়ে জাহিদের কাছে দূত পাঠাল...আর তখন আলে মুররার মুরতাদরা তাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং ইয়ামামাবাসী তাদের সমর্থন করল। এরপর তারা সবাই মুসলিমদের (ওয়াহাবিদের) সঙ্গে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলো।'[৬১]

এরপর বনু খারজ, বনু মুররা ও ইয়ামামাবাসী একজোট হয়ে ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে বিরত্বের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যে ইবনু জামিল এসে যোগ দেন বনু খারজের কাফেলাতে। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধে প্রায় ৪০ জন ওয়াহাবি নিহত হয়। পরিস্থিতি যখন বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছিল, ওয়াহাবিরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ময়দান ত্যাগ করে হায়ির নামক এলাকায় পালিয়ে যায়। এভাবে বনু খারজপক্ষ ওয়াহাবিদের গলায় পরাজয়ের মালা পরিয়ে দেয়।

৬১. তারিখু নজদ : ১৪৬

হারমাবাসীর বিদ্রোহ

হারমা হলো, রিয়াদ প্রদেশের উত্তর–পশ্চিমের ছোট একটি শহর। বনু খারজের বিদ্রোহের পরের বছর হারমাবাসী ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হারমার শাসক জুয়াইসির হুসাইনি তখন আরও কিছু এলাকার প্রধানদের সঙ্গে ওয়াহাবিদের বিনাশ করার ব্যাপারে চুক্তি করেন। ইবনু গানাম লিখেছেন, 'এরপর হারমাবাসী মুরতাদ হয়ে গেল। তখন তাদের নেতা ছিলেন জুয়াইসির হুসাইনি। তিনি সুদাইর প্রধানদের সঙ্গে মুসলিমদের (ওয়াহাবিদের) বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে সম্মত হন...তারা চুক্তি করেন, প্রত্যেক শহরে যেখানেই কোনো মুসলিমকে (ওয়াহাবি) পাওয়া যাবে, তাকেই হত্যা করা হবে।'[৬২] এরপর হারমা ও সুদাইরিরা যৌথভাবে ওয়াহাবিদের ওপর আক্রমণ করলে ভয়ংকর লড়াই এবং অনেকে হতাহত হয়।

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি (১২০৬ হি.) এর তিরোধান

আবদুল আজিজ দিরিয়ার মসনদে বসার পর দীর্ঘ একটা সময় জুড়ে আমিরাতে দিরিয়ার ইমাম হিসেবে ওয়াহাবি মতাদর্শের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটান মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব। পিতার মতো আবদুল আজিজের কাছেও নজদির বেশ কদর ছিল। তিনিও রাষ্ট্রীয় কাজে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের নির্দেশ মেনে চলতেন। আবদুল আজিজের যুগেও নজদে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের ফিতনা সমানভাবে বজায় ছিল।

এভাবে নজদের ভূমিতে ওয়াহাবি মতাদর্শ প্রচার-প্রসারের পর ১২০৬ হিজরি—১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দের শাওয়াল মাসে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে দিরিয়াতে ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর মাস নিয়ে ইতিহাসবিদদের মতভেদ রয়েছে। ইবনু গানামের মতে তিনি শাওয়ালের শেষের দিকে ইনতিকাল করেছিলেন। অপরদিকে ইবনু বিশর বলেন, তিনি জিলকদে ইনতিকাল করেন। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সামাপ্তি ঘটে ইতিহাসের রক্তাক্ত একটি অধ্যায়ের।

ওয়াহাবিদের ইরাক আক্রমণ

ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের মৃত্যুর পরও ওয়াহাবিদের উৎপাত থামেনি; বরং দিনদিন বিস্তার পেতে থাকে তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড। এবার তারা নজদ ও হিজাজের গণ্ডির বাইরে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। পরিকল্পনামাফিক তারা এবার আক্রমণ করে বসে ইরাকে।

১২১৬ হিজরিতে আবদুল আজিজ ইবনু মুহাম্মাদের শাসনামলে তাঁর ছেলে সৌদ ইবনু আবদুল আজিজের নেতৃত্বে ওয়াহাবিবাহিনী ইরাকের ঐতিহাসিক কারবালা আক্রমণ করে। কারবালার প্রান্তরে ঘটে যায় আরও একটি হৃদয়বিদারক ট্রাজেডি। দিরিয়াবাহিনীর আক্রমণে কারবালা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। তারা কারবালাবাসীদের গণহত্যার উৎসবে মেতে ওঠে। মসজিদসমূহও বাদ যায়নি তাদের নাপাক হাত থেকে। ঐতিহ্যবাহী কারবালার ধনসম্পদ লুণ্ঠন এবং নারীদের সম্ভ্রমহানির মাধ্যমে নিজেদের তৃপ্ত করে। ইতিহাসবিদ নাসির সায়িদ ওয়াহাবিদের কারবালা আক্রমণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে একটি হৃদয়বিদারক দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে লেখেন, 'তারা সেখানকার বাসিন্দাদের সম্পদ লুণ্ঠন, মহিলাদের বন্দি এবং গর্ভ চিরার মতো বর্বরোচিত আচরণ করে।'[৬৩]

কারবালাতে ওয়াহাবিদের তাণ্ডবের বিবরণ বর্ণনা করতে গিয়ে ওয়াহাবি মতাদর্শী ঐতিহাসিক ইবনু বিশর সগর্বে লেখেন,

> এবং তারা (অর্থাৎ, ওয়াহাবিরা যাদের তিনি মুসলিম হিসেবে বর্ণনা করেছেন) বাজার ও ঘরে থাকা তার (কারবালার) অধিকাংশ মানুষকে হত্যা করল এবং স্থাপিত কুব্বাটি যেটি সম্পর্কে ধারণা করা হয় হুসাইন রা.-এর কবরের উপর ছিল, সেটি ধ্বংস করল এবং কুব্বাটিতে ও তার আশেপাশে যা ছিল, তা হাতিয়ে নিল।[৬৪]

কারবালাতে বেশ কিছুদিন প্রলয়ংকরী তাণ্ডব চালানোর পর হিজাজ ফিরে আসেন ওয়াহাবি নেতা সৌদ। এরপর তিনি সেখান থেকে মক্কা আক্রমণ করেন। পবিত্র মক্কায় কিছুদিন তাণ্ডব চালানোর পর শহরটিকে দখলে নেয় দিরিয়াবাহিনী। এরপর জিদ্দা দখল করার পর সৌদ আপন রাজ্য দিরিয়াতে ফিরে আসেন; কিন্তু মক্কাবাসী ওয়াহাবিদের উগ্রতা এবং তাকফির ও দীনের মধ্যে তাহরিফ করতে দেখে অল্পদিনের মধ্যেই ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মক্কায় তাদের সমাধি রচনা করে, যা ইতিহাসে আরব বিপ্লব নামে পরিচিত। পরবর্তী অধ্যায়ে এর

৬২. তারিখু নজদ : ১৪৭

৬৩. তারিখু আলে সৌদ : ৩১

৬৪. উনওয়ানুল মাজদ : খণ্ড ১ পৃষ্ঠা : ২৫৭

বিশদ আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

মক্কা ও জিদ্দা দখলের পর ১২১৮ হিজরিতে সৌদ ইবনু আবদুল আজিজের নেতৃত্বে ওয়াহাবিবাহিনী আবার ইরাক আক্রমণ করে। এবার তাদের আক্রমণে অপবিত্র হলো ইরাকের ইলমের নগরী বসরা। ঐতিহাসিক আউলিয়াদের শহর বসরা আক্রমণের পর তারা জুবাইর নগরী ঘেরাও করে। সেখানকার কাসরুদ দুরাইহিমিয়া পানশালায় হামলা চালিয়ে অনেক মুসলিমকে হত্যা করে। ইবনু বিশর এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'এ বছর বসরা আক্রমণ, আজ জুবাইরবাসীর পানশালা কাসরুদ দুরাইহিমিয়া ও তার ভেতরকার লোকদের ধ্বংস সংঘটিত হয়।'[৬৫] অর্থাৎ, ওয়াহাবিরা কেবল দুরাইহিমিয়া ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তার মধ্যে থাকা জুবাইরবাসীকেও গণহত্যা করে। দুরাইহিমিয়া ধ্বংসের আগে ওয়াহাবিরা বসরায় আক্রমণকালে বসরাবাসীকেও ছাড় দেয়নি; গণহত্যার তরবারি চালায় তাদের ওপর।

ওয়াহাবি ইতিহাসবিদ ইবনু বিশর লিখেছেন, 'এরপর সৌদ আজ জুবাইরের কাছেরই একটি প্রসিদ্ধ মসজিদে উপস্থিত হন। তারপর মুসলিমরা (অর্থাৎ, ওয়াহাবিরা) বসরার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার দক্ষিণ প্রান্তে আক্রমণ করে। সেখানে তারা ব্যাপক লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ চালায়।'[৬৬]

বসরার গৌরব ভূলুণ্ঠিত করার পর ওয়াহাবিবাহিনী জুবাইর আক্রমণ করে সেটিকে প্রায় চার-পাঁচ দিন ঘেরাও করে রাখে এবং সেখানে ব্যাপক লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ইরাকে বেশ কয়েকদিন বর্বরোচিত তাণ্ডব চালানোর পর তারা ল্যান্ড অফ ওয়াহাবিয়া নামে পরিচিত আমিরাতে দিরিয়ায় ফিরে আসে।

আবদুল আজিজ (১২১৮ হি.) কে হত্যা

ইরাকে ওয়াহাবিদের হিংস্রতা ও বর্বরতা ইরাকবাসী মেনে নিতে পারেনি। তাদের সন্ত্রাসবাদে আক্রান্ত ইরাকবাসী আহত সিংহের মতো ফুঁসতে থাকে, তাদের মধ্যে জ্বলতে থাকে প্রতিশোধের দাবানল। ইরাকবাসীর কাছে ওয়াহাবিরা পরিচিত ছিল বর্বর দস্যু ও অজ্ঞ হিসেবে, যারা আবির্ভূত হয়েছিল নতুন একটি ধর্ম নিয়ে।

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ স্টিফেন হেমসলি লংরিগ লিখেছেন, 'নতুন মতবাদটি (ওয়াহাবিবাদ) ইরাকে খুব কমই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তথাকথিত ওয়াহাবিবাহিনী (ইরাকে) মরুবাসী ও চোর হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পায়।[৬৭]

সৌদের নেতৃত্বে ইরাকে গণহত্যা ও বর্বরতার প্রতিশোধ নিতে ইরাকবাসীর পক্ষ থেকে উসমান কুর্দি নামক এক তরুণ ছদ্মবেশে দিরিয়াতে আসেন। তিনি সেখানে নিজেকে একজন তালিবুল ইলম পরিচয় দেন। এরপর ১২১৮ হিজরির ১০ রজব—১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩ অক্টোবর আবদুল আজিজ দিরিয়ার তাইফ মসজিদে উপস্থিত হলে উসমান তাঁকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। তিনি নিহত হওয়ার পর ওই বছরই দিরিয়ার মসনদে আসীন হন তাঁর ছেলে ও কারবালা ট্রাজেডির খলনায়ক সৌদ। পিতা ও দাদার পদাঙ্ক অনুসারে তিনিও ওয়াহাবি মতাদর্শ অনুযায়ী শাসনকাজ চালাতে থাকেন। তাঁর রাজত্বকালে আরবে ঘটে যায় ঐতিহাসিক আরব বিপ্লব, যা ওয়াহাবিরাজ্য আমিরাতে দিরিয়ার পতন ঘটিয়ে দেয়।

৬৫. উনওয়ানুল মাজদ : ২৭৯

৬৬. প্রাগুক্ত : ২৮০

৬৭. Four Centuries of Modern Iraq আরবি অনুবাদ, জাফর আল খাইয়াত : ২১১

চতুর্থ অধ্যায়

আরব বিপ্লব

মক্কা হলো ইসলাম ও মুসলিমদের ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র। এখানে রয়েছে মুসলিমদের সর্বোচ্চ তীর্থস্থান কিবলা। মুসলিমরা হিজাজ বিশেষত মক্কা ও মদিনাকে পবিত্রভূমি গণ্য করেন। দিরিয়ার আমির আবদুল আজিজ হিজাজ দখলের কিছুদিন পরেই ১২১৮ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মসনদে বসেন তাঁর ছেলে সৌদ, যিনি সৌদ আল-আওয়াল বা প্রথম সৌদ নামে পরিচিত ছিলেন। সৌদ আল-আওয়াল মসনদে বসার পর মক্কায় ওয়াহাবি মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। তিনি বলপূর্বক মক্কাবাসীর ওপর একে চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। মক্কায় থাকা সাহাবিদের মাজারসমূহ ধ্বংস করা ছাড়াও যেসব মুসলিমরা ওয়াহাবি মতাদর্শ মেনে নিতে পারেননি, তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন, তাকফির ও হত্যা করতে লাগলেন।

মক্কা মুসলিমদের কিবলা হওয়ার ফলে প্রতিবছর বিভিন্ন দেশ থেকে হাজিরা এখানে আসতেন। কিন্তু সেখানে ইমারতে দিরিয়ার শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর হাজিদের ওপরও শুরু হয় নির্যাতন-নিপীড়ন। ভিনদেশি হাজিরা ওয়াহাবি মতাদর্শের সমর্থক ছিলেন না বিধায় ওয়াহাবিরা কাফির ও মুশরিক আখ্যা দিয়ে তাদের সঙ্গে জাহিলি যুগের মুশরিকদের মতো আচার আচরণ করতে থাকে। হজ করতে আসা মুসলিমদের হত্যা করা, তাদের মাহমালসমূহ ভেঙে ফেলা, মহিলাদের বলপূর্বক মাথা মুণ্ডন করিয়ে দেওয়াসহ বিভিন্নভাবে তারা হাজিদের উৎপীড়ন করতে থাকে।

১২১৭ হিজরিতে মক্কায় প্রথম প্রথম ওয়াহাবিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়তে থাকলে তারা হাজিদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন শুরু করে। এ বছর হাজিদের ওপর দমন-পীড়নের যে স্টিমরোলার চালানো হয়, তার প্রমাণ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। শুধু হাজিদের ওপরেই নয়; মক্কায় বসবাসকারী মুসলিমদের ওপরও চলে তাদের নির্যাতন। মিসরের বিখ্যাত আলিম ও ইতিহাসবিদ জাবারতি রাহ. ১২১৭ হিজরির একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যা থেকে মক্কাবাসীর ওপর ওয়াহাবিদের দমন-পীড়নের খণ্ডচিত্র পাওয়া যায়। ঘটনাটি ছিল এ রকম, ওই বছর আলিম ও নেতাদের একটি দল ওয়াহাবিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কা থেকে পালিয়ে দারুল খিলাফতে চলে যান খলিফাকে মক্কার দূরবস্থা সম্পর্কে জানাতে। পথিমধ্যে তারা মিসরে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। জাবারতি লিখেন, 'ওই মাসে (১২১৭ হিজরির শাবান) মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আলিমদের একটি দল ওয়াহাবিদের থেকে পালিয়ে ইসতাম্বুল চলে আসেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, খলিফাকে ওয়াহাবিদের উত্থানের বিষয়ে অবগত করে ওদের বিষয়ে তাদের (উসমানিদের) সহায়তা চাওয়া।'[৬৮]

এটা ছিল আবদুল আজিজের সময়ের ঘটনা। আবদুল আজিজের পর সৌদ ইবনু আবদুল আজিজ মসনদে বসেন। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, উসমানি যুগে তুর্কি ও বিভিন্ন আরবি দেশ থেকে হাজিরা যাত্রাকালে সম্মানার্থে কিংবা প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে মাহমাল বহন করতেন। এটি ছিল তাদের প্রাচীন রীতি; কিন্তু ১২২০ হিজরিতে সৌদ ইবনু আবদুল আজিজ শামি ও মিসরি হাজিরা আর মাহমাল বহন করতে পারবে না মর্মে নতুন আদেশ জারি করেন। তারা (ওয়াহাবিরা) সম্মান প্রদর্শনকে শিরক মনে করত বিধায় মাহমাল বহন করা ছিল তাদের কাছে শিরকের কারণ। ফলে তারা মাহমাল বহন নিষিদ্ধ করে ঘোষণা দেয়, যারা মাহমাল বহন করবে তাদের হত্যা করা হবে।

৬৮. আজায়িবুল আসার : ৩/৩৬৮

নাসির সায়িদ লিখেছেন, 'এরপর সৌদ মিসর ও শামবাসীকে এই বলে সতর্ক করেন, হে মিসর ও শামবাসী, তোমরা এ বছরের পর তা বহন করলে আমি ভেঙে ফেলব এবং সকল হাজিকে হত্যা করব।'[৬৯]

মাহমাল বহনে নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও সৌদ হাস্যকর আরও কিছু আদেশ জারি করেন। যেমন : শাম ও মিসরি হাজিরা দাড়ি মুণ্ডিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। মক্কায় উচ্চস্বরে ইয়া মুহাম্মাদ বলে নিদা করতে পারবে না। কারণ, ওয়াহাবিদের দর্শনে নিদা কবিরা গুনাহ ও শিরকি কাজ। এ কারণে মিসরি ও শামি হাজিদের তারা মুশরিক গণ্য করত। সৌদ মিসরি ও শামি হাজিদের ওপর জিজিয়াও আরোপ করেন, যার পরিমাণ ছিল ১০ স্বর্ণমুদ্রা। এ ছাড়া তিনি আদেশনামাতে এ-ও যোগ করেন যে, প্রতিবছর শামি ও মিসরি হজের আমিরকে দশ জন দাসী ও দশ জন শ্বেতাঙ্গ দাস উপহারস্বরূপ দিতে হবে।

নাসির সায়িদ সৌদের আদেশনামার কথা উল্লেখপূর্বক লেখেন, 'সৌদ বলেন, হে মিসর ও শামবাসী, আর এরকমভাবে তোমাদের ওপর আরও কিছু শর্ত রয়েছে। প্রথমত তোমরা দাড়ি মুণ্ডাবে না। দ্বিতীয়ত উচ্চস্বরে আল্লাহর জিকির করবে না এবং ইয়া মুহাম্মাদ বলে নিদা করবে না। তৃতীয়ত প্রত্যেক হাজি ১০ স্বর্ণমুদ্রা পরিমাণ জিজিয়া আদায় করবে...।'[৭০]

ওয়াহাবিরা দাড়িকাটা মুসলিমদের তাকফির করত। ইতিহাসবিদ জাবারতি তাঁর গ্রন্থে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, এক ওয়াহাবি মক্কায় হাজিদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় দাড়িকাটা মুসলিমদের হজে আসতে নিষেধ করে এবং তাদের সে মুশরিক অভিহিত করে।

জাবারতি ১২২২ হিজরির ১৫ সফর—২৪ এপ্রিল ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে হিজাজ থেকে সুইসে যাওয়া কিছু হাজির বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, 'তারা বর্ণনা করলেন, ওয়াহাবি লোকটি হজ শেষ হওয়ার পর আমাদের সম্বোধন করে বলল, "এ বছরের পর হারামাইনে কেউ দাড়ি মুণ্ডিয়ে আসবে না।" এরপর সে তিলাওয়াত করল, "হে ইমানদাররা, নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক; কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের কাছে না আসে।"'[৭১]

এখানে লক্ষ্যণীয়, ওয়াহাবিরা কুরআন মাজিদের একটি আয়াতের অপব্যবহার করল এবং মুশরিকিনদের বিষয়ে আসা আয়াতকে তারা আহলে কিবলা মুসলিমদের ওপর লাগিয়ে তাদের মুশরিক প্রতিপন্ন করল।

তদানীন্তন মক্কা শরিফের শাফিয়ি গ্র্যান্ড মুফতি শায়খুল ইসলাম জাইনি দাহলান রাহ. হাজিদের ওপর সৌদের দমন-পীড়নের আলোচনা এনে আরও যোগ করে বলেন, 'ওয়াহাবিরা তখন মিসরি হাজিদের আনা মাহমাল পুড়িয়ে ফেলে।'[৭২]

পরের বছর সৌদ আরও কঠোরতা অবলম্বন করেন। শাম, মিসর ও ইয়ামেনিদের হজে আসার ওপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞা জারি করে বসেন। তখন শামের হাজিদের আমির ছিলেন আবদুল্লাহ পাশা। ওয়াহাবিরা বার্তাবাহক পাঠিয়ে তাঁকে জানায়, গত বছরের চুক্তি অনুসরণ ছাড়া হাজিদের আর হজের অনুমতি দেওয়া হবে না। ফলে ওই বছর শামের হাজিরা অগত্যা হজ না করে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

জায়নি দাহলান লিখেছেন, '১২২১ খ্রিষ্টাব্দে শামি হাজিদের আমির ছিলেন আবদুল্লাহ পাশা। হাদিয়াতে পৌঁছুলে তাঁর কাছে এই মর্মে ওয়াহাবিদের কিছু চিঠি আসে যে, "গত বছর যেসব শর্তারোপ করেছি, সেগুলো পূরণ না করে তুমি হজ করতে এসো না।" এসব চিঠি পড়ে শামিরা হজ না করে হাদিয়া থেকে ফিরে যান।'[৭৩]

নাসির সায়িদ ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেন, 'আর ১২২১ হিজরিতে শামি হাজিদের আমির মদিনার কাছাকাছি এলে সৌদ আল-আওয়াল পত্রমারফত

৬৯. তারিখু আলে সৌদ : ৩৪

৭০. আজায়িবুল আসার

৭১. আজায়িবুল আসার : খন্ড ৪ পৃষ্টা : ৮৯

৭২.ও ৬৭. খুলাসাতুল কালাম : ৩৮১

৭৩. প্রাগুক্ত।

তাঁকে বলেন, "গত বছর আমরা যেসব শর্তারোপ করেছি, তা পূরণ না করে হিজাজে প্রবেশ করবেন না।"[৭৪]

শুধু শামই নয়, মক্কা দখলকারী ওয়াহাবি আমির সৌদ ইবনু আবদুল আজিজ ইয়ামেনি, তুর্কি আর মিসরি হাজিদেরও হজ থেকে বাধা দেন। ইবনু বিশর তাঁর 'উনওয়ানুল মাজদ' প্রথম খণ্ডের ২৯২ পৃষ্ঠায় শাম ছাড়াও ইসতাম্বুল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে হাজিদের আসতে সৌদের নিষেধ করার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

ওয়াহাবিদের নিষেধাজ্ঞার ফলে এভাবে প্রায় ছয় বছর শাম, মিসর, ইসতাম্বুল ও ইয়ামেনের লোকেরা হজ করতে পারেননি। মক্কায় ওয়াহাবিদের অত্যাচার দিনদিন বাড়তে থাকে। অনেক মুসলিম তখন হিজাজ ছেড়ে মিসর, শাম, ইয়ামেন, সুদান, তুর্কিসহ বিভিন্ন দেশে হিজরত করেন। ফলে হিজাজে ওয়াহাবিদের উত্থান ও ফিতনার খবর দ্রুত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

পুনরায় ইরাক আক্রমণ

১২২০ হিজরিতে দিরিয়ার শাসক সৌদ ইবনু আবদুল আজিজ স্বসৈন্য পুনরায় ইরাক আক্রমণ করেন। প্রথমে মাশহাদ প্রদেশে আক্রমণ চালালে তাদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে চলে যান ফুরাত তীরের ছোট্ট; অথচ সুরম্য শহর হিন্দিয়াতে। মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের উজির ইয়াহইয়া হিন্দির নামানুসারে শহরটির হিন্দিয়া নামকরণ করা হয়।

সৌদ হিন্দিয়াতে আক্রমণ করলে হিন্দিয়াবাসীর সঙ্গে দিরিয়াবাহিনীর লড়াই হয়। হিন্দিয়াকে তছনছ করার পর সৌদ তাঁর বাহিনী নিয়ে ঐতিহাসিক শহর বাগদাদ ও বসরার মধ্যখানে অবস্থিত সামাওয়াতে যান। ওয়াহাবিরা শহরটি অবরোধ করে ব্যাপক তাণ্ডব ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। এরপর তিনি বসরাতে কিছু ধ্বংস চালিয়ে দিরিয়াতে ফিরে আসেন।

বিলাদুশ শাম তথা সিরিয়াতে ওয়াহাবি তাণ্ডব

১২২৫ হিজরি সনে আরবকণ্যা বিলাদুশ শাম বা সিরিয়া ওয়াহাবিবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ বছর দক্ষিণ সিরিয়াতে অবস্থিত নান্দনিক হুরান অঞ্চলে ওয়াহাবিরা আক্রমণ করে এবং অঞ্চলটি বিধ্বস্ত করে দেয়। ঐতিহাসিক হায়দার আহমাদ শিহাবি প্রণীত ইতিহাস الغرر الحسان–এর মধ্যে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

> এ বছর আবদুল্লাহ ইবনু সৌদ ওয়াহহাবি বিলাদুল হুরানে আক্রমণ করে। অতঃপর সে (সেখানকার) সম্পদ লুণ্ঠন করে, ফসল পুড়িয়ে দেয়, জীবন হত্যা করে, মহিলাদের বন্দী করে, শিশুদের হত্যা করে, ঘরবাড়ি ধ্বংস করে।[৭৫]

আরব বিপ্লবের সূচনা

দিরিয়ার শাসক সৌদের আদেশে আরব, তুর্কি, মিসরসহ বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন হজ পালনে বাধা পেলে এবং হিজাজ, নজদ ও তার বাইরে ওয়াহাবিরা ফিতনা শুরু করলে মুসলিমদের মধ্যে ওয়াহাবিবিরোধী ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। প্রায় ছয় বছর পর ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিমদের ক্রোধের বাঁধ ভেঙে যায়। বিস্ফোরিত হয় দীর্ঘদিনের জমানো আক্রোশ।

এ সময় অন্যান্য আরবি অঞ্চলের মতো মিসর ছিল উসমানি খিলাফতের অধীনে। হজ পালনে বাধা আসায় মিসরি মুসলিমরা ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তাদের শাসকদের ওপর ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। অবশেষে মিসরের শাসক উসমানি খলিফাকে বিষয়টি জানালে খলিফা সেলিম মিসরি শাসক মুহাম্মাদ আলি পাশাকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আদেশ দেন। আলি পাশা ওয়াহাবিদের দমাতে তাঁর ছেলে তুসুন পাশার নেতৃত্বে নজদ অভিমুখে একটি বাহিনী পাঠান।

মিসরি, তুর্কি, মাগরিবি ও আরব সেনাবাহিনী নিয়ে তুসুন পাশা বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে। ইবনু বিশরের মতে, এ বাহিনীতে প্রায় 14 হাজার সেনা ছিল। বিপরীতে ওয়াহাবিদের বাহিনীতে ছিল 18 হাজার সেনা। ১২২৬ হিজরিতে তুসুন পাশা ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে হামলা

---

৭৪. তারিখু আলে সৌদ : ৩৫

৭৫. كشف الارتياب للعالمي، ص ٣٥-٣٦

চালিয়ে সহজেই তাদের থেকে ইয়াম্বু বন্দর মুক্ত করেন। ইবনু বিশর তাঁর গ্রন্থে এ যুদ্ধকে ওয়াহাবি মুসলিমদের সঙ্গে রোমান মুশরিকদের যুদ্ধ হিসেবে দেখিয়েছেন।

এদিকে ওয়াহাবিদের ব্যাপক হতাহতের মধ্য দিয়ে খিলাফতবাহিনী ইয়াম্বু দখল করলে ওয়াহাবিদের মধ্যে আতঙ্ক ছেয়ে যায়। তারা ভেবে দেখে, এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে আরব থেকে তাদের অস্তিত্ব মুছে যাবে। ফলে তারা উসমানিদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা উসমানিদের প্রতিশ্রুতি দেয়, হিজাজে তারা উসমানি কানুন বলবৎ করবে। এ ছাড়া উপহার বিনিময়ের মাধ্যমে উসমানিদের তারা তুষ্ট করে ফেলে। ফলে তুসুন পাশা যুদ্ধ বন্ধ করে ফিরে আসেন। তিনি এসে ঘোষণা দেন, 'ওয়াহাবিদের সম্মুখবাহিনীকে ধ্বংস করা হয়েছে।'

ঐতিহাসিক আরব বিপ্লব

কিন্তু ওয়াহাবিদের পুরোপুরি মূলোৎপাটন না করে ফিরে আসাটা আরবরা ভালো নজরে দেখেনি। কারণ, ইতিপূর্বে ওয়াহাবিরা অনুরূপ চুক্তির মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে পরে তা ভঙ্গ করেছিল। তাই আরবিদের ইচ্ছা ছিল, খিলাফতবাহিনী ওয়াহাবিদের সমূলে ধ্বংস করে ফেলুক; কিন্তু সেটা না হওয়ায় তাদের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দেয়। তুসুন পাশার ফিরে আসাটা তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। ফলে মিসরি শাসক মুহাম্মাদ আলি পাশার ওপর ফের ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আলি পাশা পুনরায় ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। এ লক্ষ্যে তিনি সেনাপ্রধানদের জড়ো করে তাদের মতামত জানাতে বলেন। এদের মধ্যে তাঁর ছেলে ইবরাহিম পাশাও ছিলেন। আলি পাশা তখন সেনাপ্রধানদের যাচাই করতে এক অভিনব পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। একটি বড় গালিচার মাঝখানে আপেল রেখে সবাইকে নির্দেশ দেন, কার্পেট না মাড়িয়ে সেটি তুলে নিতে হবে; কিন্তু কার্পেট না মাড়িয়ে কীভাবে আনা যেতে পারে, তা কেউ বুঝতে পারেননি। পালাক্রমে ব্যর্থ হন সবাই। বাকি থাকেন শুধু ইবরাহিম পাশা। তাঁর পালা এলে তিনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। কার্পেটের একপ্রান্ত থেকে গুটিয়ে গুটিয়ে মাঝখানে গিয়ে আপেলটি তুলে নিয়ে আসেন। ছেলের এমন চাতুর্য দেখে আলি পাশা যারপরনাই খুশি হন এবং তাঁর ওপরই ওয়াহাবিদের কবল থেকে জাজিরাতুল আরব মুক্ত করার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পেয়ে যুবক ইবরাহিম পাশা ১২২৮ হিজরিতে বিশাল আরববাহিনী নিয়ে হিজাজের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে পৌঁছে সুনিপুণ রণকৌশলের মাধ্যমে হারানো খিলাফতভূমি থেকে ওয়াহাবিদের উৎখাত করতে থাকেন। একের পর এক গ্রাম, শহর ও প্রদেশে তাদের বিনাশ ঘটান। এভাবেই তিনি মক্কা ও মদিনাকে ওয়াহাবিদের থেকে মুক্ত করেন।

হারামাইন শরিফাইনসহ জাজিরাতুল আরবের বড় একটা অংশ ওয়াহাবিদের হাতছাড়া হয়ে গেলে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং পুনরায় আহলুস সুন্নাতের অনুসারী মিসরি ও আরববাহিনীর সঙ্গে চুক্তি করতে উদ্যোগী হয়। পূর্বাভিজ্ঞতার ফলে এবার আরববাহিনী চুক্তি স্বাক্ষরের আগে সৌদকে বেশকিছু শর্ত দেয়। ষড়যন্ত্রী সৌদ সেসব শর্ত পূরণে অক্ষম হওয়ায় আমিরাতে দিরিয়া চুক্তি করতে ব্যর্থ হয়। আরববাহিনী তাই একের পর এক অঞ্চল ওয়াহাবি মুক্ত করতে করতে বিক্রমের সঙ্গে দিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে।

দিরিয়া আমির সৌদ (১২২৯ হি.) র মৃত্যু

এদিকে সৌদ রাজ্য হারিয়ে ওয়াহাবিদের সর্বশেষ কেন্দ্রভূমি দিরিয়াতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। ভীতসন্ত্রস্ত সৌদ দিরিয়াতে সুদৃঢ় প্রহরায় অবস্থান করছিলেন; কিন্তু হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তারিখে আলে সৌদে এসেছে, যে রোগে তাঁর দাদা মুহাম্মাদ ইবনু সৌদ আক্রান্ত হয়েছিলেন, তিনিও সে একই রোগে আক্রান্ত হন। কয়েকদিন কঠিন রোগে ভোগার পর ১২২৯ হিজরি—১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দের রবিউস সানি দিরিয়াতে ইনতিকাল করেন। ঐতিহাসিক ভাষ্যে জানা যায়, তিনি অত্যাধিক ভয় ও চিন্তার কারণে এ রোগে আক্রান্ত হন এবং তীব্র জ্বরাক্রান্ত হয়ে মারা যান।

সৌদের মৃত্যুর পর আরববাহিনীর দিরিয়া আক্রমণের ঠিক আগ মূহুর্তে ইমারতে দিরিয়ার মসনদে বসেন সৌদের ছেলে এবং আমিরাতে দিরিয়ার শেষ শাসক আবদুল্লাহ ইবনু সৌদ। সিংহাসনে বসার পর চিরাচরিত পদ্ধতিতে তাঁর পূর্বসূরিদের মতো তাঁর হাতে বায়আত হয়ে তাঁকে সহায়তা দেয় নজদির পরিবার। আরবি মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা বিভ্রান্তিকর ফাতওয়াবাজির মাধ্যমে তাদের উত্যক্ত করে পূর্বসূরিদের ধারা বজায় রাখেন তাঁরা।

www.muslimdm.com

তবে দিরিয়ার রাব্বানি আলিমরা নজদির ইলমি খিয়ানতে বিভ্রান্ত না হয়ে তাঁরা পক্ষ নেন ওয়াহাবিবিরোধী বিশাল আরববাহিনীর।

আমিরাতে দিরিয়ার অন্তিম পরিণতি

আরববাহিনী দিরিয়া অভিমুখে যাত্রাকালে ইয়ামেনের রাজা আরব, উসমানি ও মুসলিমদের সঙ্গে প্রতারণা করেন। বিশাল ইয়ামেনি জনগণ যখন আরববাহিনীকে সমর্থন করে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখন তিনি আলে সৌদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের সমর্থনে সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু বিক্ষুব্ধ ইয়ামেনবাসী আলে সৌদের পক্ষে যেতে আপত্তি জানায় এবং বিপুলসংখ্যক ইয়ামেনি সেনা যোগ দেয় মিসর নেতৃত্বাধীন আরববাহিনীতে। ইয়ামেনের পর বিক্ষুব্ধ ওমানবাসী আলে সৌদের প্রেরিত ওয়ালিকে হত্যা করে আরববাহিনীতে যোগ দেয়।

তখন নজদজুড়ে শুরু হয় ওয়াহাবি নিধনের ব্যাপক আয়োজন। আল-কাসিম ও নজদের রাব্বানি আলিমরা আলে সৌদ ও আলে শায়খ থেকে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করতে থাকেন। সেখানকার মসজিদগুলোতে ঘোষণা হতে থাকে,

لن يظهر دين الحق ما لم نطهر هذا الدين من هاتين العائلتين

আল্লাহর দীন ততক্ষণ বিজয়ী হবে না, যতক্ষণ না আমরা এই দীনকে দুই বংশ (আলে সৌদ ও আলে শায়খ) থেকে পবিত্র করব।

এদিকে নজদের আলিমদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়ে আলে শায়খ পরিবার। নিজেদের রক্ষার্থে তারা রাব্বানি আলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করে। তাঁদের তারা মিসরের দালাল বলে অপবাদ দিতে থাকে। নানান ফাতওয়া জারি করে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে থাকলেও তাদের ফাতওয়া কোনো কাজে আসেনি।

পরিশেষে আরববাহিনী দিরিয়া আক্রমণ করে। ব্যাপক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আরবরা প্রথম ওয়াহাবি রাষ্ট্র আমিরাতে দিরিয়ার পতন ঘটিয়ে একে ওয়াহাবিদের কবল থেকে মুক্ত ঘোষণা করে। ১২৩৪ হিজরিতে আমিরাতে দিরিয়ার শাসক আবদুল্লাহ ইবনু সৌদকে বন্দি করে মিসরে পাঠানো হয়। এদিকে ক্রুদ্ধ আরববাহিনী আলে শায়খ বংশকে আক্রমণ করে বেশ কজন ওয়াহাবিকে হত্যা করে। আবদুল্লাহ ইবনু সৌদকে বিচারের জন্য মিসর থেকে খিলাফতের রাজধানী ইসতাম্বুলে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর বিচার করা হয় এবং শরিয়ত মোতাবিক হদ কায়িমের মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করা হয়। এভাবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয় প্রথম ওয়াহাবিরাজ্য ইমারতে দিরিয়া।

www.muslimdm.com

পঞ্চম অধ্যায়

সৌদিআরবের প্রতিষ্ঠা

আরব বিপ্লবের পর কেটে যায় বেশকিছু দিন। নজদের বুকে ধীরে ধীরে ফিরে আসতে থাকে হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের দিনগুলো। দীর্ঘ জুলুম-নির্যাতনের অবসানের পর ছায়া ফেলতে থাকে শান্তি ও স্থিতিশীলতা, কিন্তু তা আর বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ, ওয়াহাবি আলে সৌদ নজদবাসীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে। রাজ্য হারানোর পর থেকে তারা আরও উগ্র হয়ে উঠতে থাকে। রাজ্য পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ স্বপ্ন নিয়ে তারা আবার

নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করতে শুরু করে। আরব বিপ্লব সমাপ্তির পরের বছর অর্থাৎ, ১২৩৫ হিজরির জুমাদাল উলায় প্রয়াত ওয়াহাবি শাসক সৌদের ছেলে মিশারি ইবনু সৌদ সদ্য পতন হওয়া ওয়াহাবি আমিরাত উদ্ধারের আশায় ফের দিরিয়ায় আক্রমণ করে বসেন। তিনি সফল হননি; নজদবাসী পুনরায় দুর্যোগের আশঙ্কা করে তাঁকে হত্যা করে ফেলে। মিশারির হত্যা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মতবিরোধ রয়েছে। কারও মতে, নজদবাসী তাঁকে হত্যা করে। আবার কারও মতে, তারা তাঁকে উসমানিদের হাতে তুলে দেয়। দেশদ্রোহিতা ও খারিজি মতাদর্শের অনুসারী হওয়ায় উসমানিরা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মিশারি ইবনু সৌদের মৃত্যুর পর কেটে যায় প্রায় এক মাস। এরপর আলে সৌদের তুর্কি ইবনু আবদুল্লাহ পুনরায় নজদ আক্রমণ করে বসেন। কিছুকাল হানাহানি ও হত্যাযজ্ঞের পর নজদে তিনি ফের ওয়াহাবিরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। নতুন ওয়াহাবি রাষ্ট্রটি ইতিহাসে ইমারতে নজদ নামে প্রসিদ্ধি পায়, কিন্তু নজদবাসী এই রাজ্যপ্রতিষ্ঠা মেনে নিতে পারেনি। কারণ, ওয়াহাবিদের দীনের মধ্যে বিকৃতি, উগ্রতা এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। ফলে ইমারাতে নজদ ঘোষণা দেওয়ার পরও তুর্কি নিস্তার পাননি; ক্রুদ্ধ নজদবাসী তাঁকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। প্রাণভয়ে তিনি নজদ থেকে পালিয়ে দারুল খিলাফত ইসতাম্বুল চলে যান। সেখানে আরবদের বিরুদ্ধে উসমানিদের সহায়তা চেয়ে তাদের অনুগত সৌদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ইতিপূর্বেও সৌদি ওয়াহাবিরা এ ধরনের চুক্তির পর নিজেরাই তা ভঙ্গ করে বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছিল। ফলে উসমানিরা নতুন করে সেই অভিজ্ঞতার পুনারাবৃত্তি চায়নি।

আবেদন মঞ্জুর না হওয়ায় অগত্যা তুর্কি ফিরে আসেন ইমারাতে নজদে। এরপর কিছুকাল সেখানে কাটান। তবে শেষ রক্ষা হয়নি তাঁরও। ১২৪৯ হিজরিতে নজদবাসী তাঁকে হত্যা করে ফেলে। এ সময় তুর্কির ছেলে ফায়সাল বর্তমান সৌদির দাম্মামের নিকটবর্তী আল-কাতিফ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। পিতৃহত্যার সংবাদ পেয়ে রিয়াদে ফিরে তিনি নজদের সিংহাসনে আসীন হন; কিন্তু ক্ষিপ্ত নজদবাসীর মন জয়ে ব্যর্থ হন ফায়সাল। ওয়াহাবিদের উগ্রতা দিনদিন বাড়তে থাকলে নজদবাসী তাঁর থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। নজদের রাজা হওয়ার স্বপ্ন মাঠে মারা যাচ্ছে দেখে চতুর ফায়সাল নতুন একটি ফন্দি আঁটেন। নজদবাসীর মনে জায়গা পেতে নিজেকে তিনি আলে সৌদ থেকে স্বাধীন হিসেবে তুলে ধরেন। ফলে পার্শ্ববর্তী আমিরাতে জাবাল শাম্মারের আমির আবদুল্লাহ তাঁর সহায়তায় অবতীর্ণ হন। আবদুল্লাহর সহযোগিতায় ফায়সাল আমিরাতে নজদের রাজধানী রিয়াদের মসনদে অধিষ্ঠিত হন এবং নিজেকে নজদের ইমাম ঘোষণা করেন।

আলে সৌদ ও ব্রিটিশ সম্পর্ক স্থাপন

রিয়াদের মসনদে ফায়সাল ইবনু তুর্কির আসীন হওয়ার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে আরবরা পুনরায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে ওয়াহাবিবাহিনী কর্তৃক হাজিদের দমন-পীড়নের স্মৃতি তারা তখনো ভুলতে পারেনি। ১২৫০ থেকে ১২৫৪ হিজরি পর্যন্ত ফায়সাল নজদ শাসন করেন। ১২৫৪ হিজরিতে মিসরি বাহিনী পুনরায় নজদ আক্রমণ করে ফায়সালসহ একাধিক আলে সৌদ ও আলে শায়খ সদস্য গ্রেপ্তার করে মিসরে নিয়ে যায়। ১২৫৪ থেকে ১২৫৯ হিজরি পর্যন্ত ফায়সাল মিসরে থাকেন। এরপর মিসরি খেদিব আব্বাস হিলমি পাশার কাছে উসমানি খিলাফতের পরিপূর্ণ আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিলে মিসর থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির পর পুনরায় তিনি রিয়াদের সিংহাসনে বসেন। নজদের মসনদে বসে ফায়সাল এবার নতুন করে ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করতে থাকেন। এবারের ষড়যন্ত্র ছিল উসমানি খিলাফত তথা সমগ্র আরব এবং উম্মতে মুসলিমার বিরুদ্ধে।

১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে ফায়সাল ইরানের বুশহরস্থ পারস্য উপসাগরের (একে আরব উপসাগরও বলা হয়) দায়িত্বে থাকা ব্রিটিশ কর্মকর্তা কর্নেল মিস্টার লুইস পিলির (Lewis Pelly) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নাসির সায়িদ তাঁর গ্রন্থে এ সাক্ষাৎকে ব্রিটিশ-সৌদির মধ্যে সম্পর্কের সূচনা হিসেবে দেখিয়েছেন। ১২৮১ হিজরি—১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের শাবানে ফায়সালকে পাঠানো পিলির একটি চিঠি থেকে ইমারতে নজদ ও ব্রিটিশের মধ্যেকার সুসম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। চিঠিটা কাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে Mss Eur F126/56, f 2 সংখ্যায় সংরক্ষিত রয়েছে। ফয়সালের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর পিলি জাজিরাতুল আরবে ওয়াহাবি সৌদি প্রভাব বিস্তারে ব্রিটিশ সহায়তার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বিভিন্ন সময় ওয়াহাবি-কুফফার জোট

আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য খিলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে বৃটিশদের সহায়তা নেওয়াটা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রথম আলে সৌদ-কুফফার জোট ছিল না। এ ঘটনার আগেও নিজেদের স্বার্থে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আলে সৌদ কর্তৃক কুফফারদের সহায়তা নেওয়ার বহু প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইতিহাস থেকে প্রথম ওয়াহাবিরাজ্য ইমারতে দিরিয়ার যুগে মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব কর্তৃক ইয়াহু কুহেন নামক এক ধনাঢ্য ইয়াহুদি ব্যক্তির সহায়তা নেওয়ার বিষয়ে একটি তথ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ওয়াহাবিবাহিনীতে একটি বিরাট সংখ্যক ছদ্মবেশী ইয়াহুদিদের উপস্থিতির বর্ণনা একাধিক গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। ইসরাইলের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আইজ্যাক বেন জেবি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Exiled and the Redeemed-এ ওয়াহাবিবাহিনীতে ইয়াহুদিদের যোগদানের কথা তুলে ধরেছেন। জেবির গ্রন্থটির ফারসি অনুবাদগ্রন্থে লিখেছেন,

এই শেষ অনুমানে আমরা স্বীকার করতে পারি, হিজাজের এ ইয়াহুদি গোত্রগুলো এমনকি ওয়াহাবিদের সঙ্গে যোগদানের পরেও তাদের বিশেষ কিছু ঐতিহ্য যেমন : নিজেদের মধ্যে বিবাহ করা, কোনোভাবে সাব্বাথ (তাদের ধর্মীয় রীতি) পালন করা এবং নিজেদের চাদ্দাই নামে ডাকা (ইত্যাদি) রক্ষা করে চলতে সক্ষম হয়েছিল, যেহেতু বলা হয়, বেদুইন উপজাতি যারা ইয়াহুদি বংশের দাবি করে থাকে, তাদের বিশদ জরিপই একটি সুনির্দিষ্ট মতামত গঠন করতে পারে। এমনকি আমরা আরও আগ বাড়াতে পারি এবং যুক্তি দিতে পারি যে, ডাউটির সিদ্ধান্তগুলো চূড়ান্ত নয়; সেগুলো পর্তুগাল ও স্পেনের ম্যারানোস বা পারস্যের মাশহাদের ক্রিপ্টো-ইয়াহুদিদের মতো একটি গোপন ইয়াহুদি ঐতিহ্যের ধারণাকে বাতিল করে না।[৭৬]

আমিরাতে জাবাল শাম্মার দখলের প্রচেষ্টা

লুইস পিলির মাধমে ব্রিটিশদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর ফায়সাল মনে বল পান। ফলে নতুন উদ্যোমে অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এবার তিনি অস্ত্রধারণ করেন খোদ ইমারতে জাবাল শাম্মারের বিরুদ্ধে, যে ইমারতের সহায়তায় তিনি একদা নজদের সিংহাসনে বসতে পেরেছিলেন। ওয়াহাবিরা এ ধরনের প্রতারণায় ছিল সিদ্ধহস্ত যেমনটি আমরা তাদের ইতিহাসের শুরু থেকে দেখে আসছি; বিপরীতে ইমারাতে জাবাল শাম্মারের শাসক ইবনু রশিদ ছিলেন সৎ। তিনি ওয়াহাবিদের ওপর আস্থা রেখে মূলত খাল কেটে কুমির ডেকে আনেন।

ইবনু রশিদের সততায় খোদ ফায়সাল এমনই বিস্মিত ছিলেন, সে বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞেস করে বসেন, 'হে আবদুল্লাহ ইবনু রশিদ, আপনার পক্ষে রিয়াদ শাসনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেননি কেন?' জবাবে ইবনু রশিদ বলেন, 'প্রতারণা আরবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়।'

যাইহোক, ব্রিটিশদের সহায়তা নিয়ে আমিরাতে জাবাল শাম্মারের বিরুদ্ধে বেশকটি হামলা চালিয়েও ফায়সাল সফল হননি। তবু তিনি দমে যাননি; বরং মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। কিছুদিনের মধ্যে জাবাল শাম্মারের আমির তালাল ইবনু রশিদ এক ষড়যন্ত্রে গুরুতর আহত হলে তাঁর সামনে সেই সুযোগটি এসে পড়ে। তিনি তালালের বিষয়টি ব্রিটিশদের জানালে তারা পারস্যের ভাড়াটে ডাকাত মাহমুদ জায়দানকে তাঁর কাছে পাঠায়। ফায়সাল এই ডাকাতকে ডাক্তারের ছদ্মবেশে তালালের কাছে পাঠান এবং বিষাক্ত ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁকে হত্যার পরামর্শ দেন। কিন্তু জায়দান বার বার চেষ্টা করেও যখন ওষুধ খাওয়াতে পারেনি, তখন মিছেমিছি তালালকে বলে, 'আপনি আমার ওষুধ না খেলে ভবিষ্যতে পাগল হয়ে যাবেন।' এ কথা শুনে তালাল মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে নিজের বন্দুক উঠিয়ে আত্মহত্যা করেন।

এ নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে ফায়সাল পৌঁছে যান তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে। তালালের মৃত্যুর পর ইমারাতে জাবাল শাম্মার দখলের স্বপ্ন নিয়ে বেশ কয়েকবার তিনি ইমারতটিতে আক্রমণ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে ১২৮২ হিজরি সনের ৪ শাবান ফায়সাল ইবনু তুর্কির মৃত্যু ঘটে যায়। তালালের মৃত্যু সন নিয়ে ইতিহাসের পাতায় মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সুলাইমান আদ দাখিল তাঁর তারিখু ইমারতিল আরব গ্রন্থে তালালের মৃত্যু সন ১২৮৫ হিজরি সন বলে উল্লেখ করেছেন।

অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন্দলে আলে সৌদ

ফায়সাল ইবনু তুর্কির মৃত্যুর পর নজদের সিংহাসন দখল নিয়ে আলে সৌদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ফায়সালের দুই ছেলে আবদুল্লাহ ও সৌদ নজদের মসনদ দখলের জন্য উঠে পড়ে লাগেন। প্রচলিত নিয়মানুসারে ফয়সালের জ্যেষ্ঠ ছেলে হিসেবে আবদুল্লাহ ইবনু ফায়সাল সিংহাসনে

৭৬. LES TRIBUS DISPERSÉES : 102

বসলেন; কিন্তু সিংহাসন দখলের লিপ্সা ফয়সালের কনিষ্ঠ ছেলে সৌদকে গ্রাস করল। তিনি নজদের সিংহাসনারোহণের অভিপ্রায়ে বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

এ সময় পুনরায় আলে সৌদের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহ চাগাড় দিয়ে ওঠে। ওয়াহাবিদের অত্যাচারে নিষ্পেষিত আরবরা পুনরায় ওয়াহাবিদের পতন ঘটানোর জন্য সচেষ্ট হয়। ইমারতে নজদ তখন উভয় সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক এমনি এক পরিস্থিতিতে বনু আজমান গোত্র আলে সৌদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। আজমান কবিলার বিখ্যাত নেতা রাকান ইবনু হিসালায়নের নেতৃত্বে তারা ওয়াহাবি ওয়ালি বা গভর্নর আহমাদ আস-সুদায়রিকে আক্রমণ করে পরাস্ত করে। ফলে আহসা ও আজমান অঞ্চল থেকে ওয়াহাবি কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে রাজ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আবদুল্লাহ ইবনু ফায়সাল আজমান গোত্রের ওপর আক্রমণ করলেন, কিন্তু আজমান গোত্র ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পরিণতিতে প্রায় ২৭০০ ওয়াহাবিকে তারা হত্যা করে এবং ইবনু ফায়সাল বাহিনীকে বিতাড়িত করে। আজমানের হারানোর স্মৃতি মুছতে না মুছতেই আবদুল্লাহের ঘাড়ে এসে পড়ল আরেকটি বিপদ। ১২৮৭ হিজরি—১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল্লাহ ইবনু ফায়সালের ভাই সৌদ ইবনু ফায়সাল স্বদলবলে রিয়াদ আক্রমণ করে নজদ দখল করেন এবং নিজেকে আমিরাতে নজদের ইমাম হিসেবে ঘোষণা দেন।

এদিকে আবদুল্লাহ ইবনু ফায়সাল সিংহাসনচ্যুত হয়ে একে একে আনায়জা, হায়িলসহ আরবের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে কনিষ্ঠ ভাইয়ের বিরুদ্ধে সহায়তা প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ আরববাসী আলে সৌদকে কোনোভাবেই ক্ষমতায় দেখতে চাইছিল না। তাই তারা কেউ আবদুল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিল না। ফলে আবদুল্লাহকে বিষন্নতার অন্ধকার ছেয়ে বসল। আবদুল্লাহ অবশেষে নিজের শেষ অস্ত্রটি প্রয়োগ করলেন। তিনি শেষবারের মতো বাগদাদে নিযুক্ত উসমানি ওয়ালি মিদহাত পাশার কাছে সহায়তা প্রার্থনা করলেন। এবার তিনি সফল হলেন। আবদুল্লাহর আহ্বানে মিদহাত পাশা সাড়া দিলেন, কিন্তু মিদহাতের হৃদয়পটে তখন অন্য পরিকল্পনা চলছিল। তিনি আহসাসহ কিছু এলাকার শাসকগোষ্ঠী যারা উসমানিদের সঙ্গে যোগ না দিয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব চালাচ্ছিলেন তাদের শায়েস্তা করার ছক কষছিলেন। আবদুল্লাহ যখন সহায়তা চাইল তখন তিনি সুযোগটা কাজে লাগালেন। পরিকল্পনামাফিক সৌদকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আহসা আক্রমণ করে সেটি দখল করে নেন। গুরুত্বপূর্ণ আহসা অঞ্চল দখল করার পর তিনি তার নাম রাখলেন ওয়ালায়াতু নজদ বা নজদ প্রদেশ। এরপর প্রয়োজন মিটে গেলে তিনি আবদুল্লাহকে বিতাড়িত করেন। কারণ, উসমানিরা ওয়াহাবিদের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিল। মিদহাত নতুন করে নজদে কোনো সমস্যা দেখতে প্রস্তুত ছিলেন না। মিদহাত কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে আবদুল্লাহ ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গেলেন। সৌদিআরবের রাষ্ট্রদূত হাফিজ ওয়াহবা তাঁর 'জাজিরাতুল আরব' এবং নাসির সায়িদ তাঁর বইয়ে ঘটনার বিষদ বিবরণ দিয়েছেন। এ ঘটনার মাত্র কয়েক বছর পর আইনিয়াবাসী মুসাল্লাত ইবনু রবিয়ান নামক তাদের বলিষ্ঠ এক নেতার নেতৃত্বে আলে সৌদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং রিয়াদ আক্রমণ করে। এ সংঘর্ষে সৌদ গুরুতরভাবে আহত হন এবং ১২৯১ হিজরি—১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আমিরাতে নজদের পতন

সৌদের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আবদুর রহমান আমিরাতে নজদের সিংহাসনে বসেন। আবদুর রহমানের সিংহাসনে বসার কিছু কাল পর সৌদের বড় ভাই আবদুল্লাহ রিয়াদে ফিরে আসেন। তিনি নিজেকে সিংহাসনের অধিক হকদার দাবি করে নিজেকে নজদের ইমাম হিসেবে ঘোষণা দেন। ফলে ওয়াহাবিবাদের জনক ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির বংশধর আলে শায়খের তথাকথিত মুফতিরা, যারা ইমারাতে নজদের ধর্মীয় মন্ত্রণালয়ের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তারা সুযোগ বুঝে আবদুল্লাহর পক্ষে ফাতওয়া দেওয়া শুরু করল, কিন্তু ১২ শাবান ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সৌদের ছেলেরা আবদুল্লাহকে বন্দি করে। ফলে চলমান আবদুল্লাহ নাটকের যবনিকাপাত ঘটে। ওয়াহাবি ধর্মব্যবসায়ী তথাকথিত মুফতিরাও অবস্থা বেগতিক দেখে উল্টো পথে হেঁটে এবার আবদুর রহমানের পক্ষে ফাতওয়া জারি করা শুরু করল।

এদিকে আবদুর রহমানের অপশাসন ও ওয়াহাবিদের তাকফির, জুলুম ও হত্যাকাণ্ডের ব্যাপক প্রসার ঘটলে তদানীন্তন নজদের কিছু উলামায়ে কিরাম ও গোত্রপতিরা হায়িলের শাসক মুহাম্মাদ আল-আবদুল্লাহ আলে রশিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আলে সৌদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে সহায়তা চান। মুহাম্মাদ আল-আবদুল্লাহ আলে রশিদ উলামায়ে কিরাম এবং গোত্রপতিদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইমারাতে নজদে আক্রমণ করেন। আলে রশিদও চাইছিল প্রতিবেশী শত্রুকে ধ্বংস করে ফেলতে। নজদ আক্রমণ করে ইমারতে জাবাল শাম্মারের আমির মুহাম্মাদ আল-আবদুল্লাহ আমিরাতে নজদকে পরাস্ত করেন। আবদুল্লাহ ইবনু ফায়সালসহ পরাস্ত আলে সৌদদের বন্দি করা হয়। এভাবে পতন ঘটে দ্বিতীয় সৌদি রাজ্য ইমারাতে নজদের।

কুয়েত থেকে নতুন ষড়যন্ত্র

ইমারতে নজদের পতন ঘটে গেলে সেখানকার শাসক আবদুর রহমান ইবনু ফায়সাল পালিয়ে কুয়েতে চলে আসেন। সেখানে তিনি উসমানিদের ছত্রছায়ায় শরণার্থী হিসেবে বসবাস করতে লাগলেন। পরবর্তী সময়ে কুয়েতের ওপর ব্রিটিশদের আধিপত্য স্থাপিত হলে ব্রিটিশদের সঙ্গে আবদুর রহমানের সম্পর্ক মজবুত হয় এবং ব্রিটিশদের প্রলোভনে তিনি পুনরায় নজদের আলে রাশিদ বংশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সম্মত হন।

ঠিক এমন সময় মাশহাদে উপস্থিত হন আবদুর রহমান ইবনু ফায়সাল ছেলে তরুণ আবদুল আজিজ ইবনু সৌদ। যিনি ইতিহাসে ইবনু সৌদ নামেও সমধিক পরিচিত। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি আমিরাতে নজদের দিরিয়াতে ইবনু সৌদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম হলো, আবদুল আজিজ ইবনু আবদির রহমান ইবনু ফায়সাল আলে সৌদ। তিনি ছিলেন পিতার চতুর্থ সন্তান এবং তৃতীয় ছেলে।

সুরাইফের গণহত্যা

১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশদের পরামর্শে আবদুর রহমান ও তদানীন্তন কুয়েত বাদশাহ মুবারক ব্রিটিশদের পরিকল্পিত নজদে আলে রশিদের বিরুদ্ধে আক্রমণে সম্মতি জানান। পরিকল্পনা অনুযায়ী আবদুর রহমান আলে সৌদ তাঁর ছেলে ইবনু সৌদকে নজদের রিয়াদ আক্রমণের উদ্যেশ্যে পাঠান। কিন্তু সৌভাগ্যবশত রিয়াদ আক্রমণের আগেই এ ষড়যন্ত্রের বিষয়ে জানতে পারলেন তদানীন্তন আমিরাতে জাবাল শাম্মারের আলে রশিদ পরিবারের আমির ইবনুর রশিদ। ফলে ইবনু সৌদ বাহিনী যখন দিরিয়াতে পৌঁছল তখন ইবনুর রশিদ বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দ্রুতই তাদের বিধ্বস্ত করে ফেলেন। ওয়াহাবিবাহিনী পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়ে পালিয়ে কুয়েতে চলে আসে।
ইবনু সৌদের পরামর্শদাতা ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সেন্ট জন ফিলবি তাঁর বইয়ে এ ব্যাপারে লিখেছেন, 'তারা (ওয়াহাবিরা) নিশ্চিতরূপে পরাজিত হলো এবং বিভ্রান্ত হয়ে কুয়েত পালিয়ে গেল, (তারা) শত্রুদের দ্বারা ধাবিত হলো যারা (আলে রশীদ বাহিনী) কোনো পলাতককে তাদের হাতের নাগালে পেল, তাদের প্রতি কোনোরূপ দয়া দেখাল না। ইবনু সৌদ এ বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে রিয়াদ থেকে তড়িঘড়ি সেনা প্রত্যাহার করলেন।'[৭৭]

এদিকে আলে রশিদ বাহিনী ওয়াহাবিদের ধাওয়া করতে করতে কুয়েতে পৌঁছে গেল। ইমারতে জাবাল শাম্মারের বাহিনীর আগমনের সংবাদে শঙ্কিত কুয়েত আমির মুবারক পলায়ন করলেন। জাবাল শাম্মার বাহিনী কুয়েতে ঢুকলে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়, যাতে গোটা কুয়েত তছনছ হয়ে যায়। কুয়েতের এমন কোনো ঘর বাদ গেল না যেটা এ সংঘর্ষ থেকে মুক্ত ছিল। আলে রশিদ বাহিনীর আক্রমণে বহু কুয়েতি নিহত হলেন। ইতিহাসের পাতায় এ রক্তাক্ত অধ্যায় মাজজারাতুস সুরাইফ বা সুরাইফ গণহত্যা নামে পরিচিত।

ব্রিটিশ ভৃত্য হিসেবে ইবনু সৌদ

ওয়াহাবি ইমাম আবদুল আজিজ ইবনু সৌদ ছিলেন বৃটিশদের হাতের পুতুল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ওয়াহাবি শাসকদের মধ্য থেকে বৃটিশ তথা পশ্চিমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এ ব্যক্তি। পশ্চিমারা আরবের ওপর তাদের আধিপত্য মজবুত করতে এ ব্যক্তিকে মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। ইবনু সৌদও স্বার্থ হাসিলের জন্য পশ্চিমাশক্তির প্রতি একান্ত আনুগত্য প্রদর্শন করেন। রাজনীতির প্রতিটি রঙ্গশালায় তিনি খলনায়কের চরিত্রে অবতীর্ণ হলেন, অবতীর্ণ হলেন বৃটিশদের একনিষ্ঠ ভৃত্য হিসেবে। জন ফিলবির ভাষায়, 'ব্রিটিশ তার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করল।'

হ্যারি সেন্ট জন ব্রিজার ফিলবি (১৮৮৫-১৯৬০) ছিলেন বিখ্যাত বৃটিশ গোয়েন্দা কিম ফিলবির পিতা যিনি কেমব্রিজ ফাইভ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে রাশিয়ার কাছে বহু গোপন তথ্য ফাঁস করেছিল। সেন্ট জন ফিলবি একজন পর্যটক, লেখক ও বৃটিশ রাজনৈতিক কর্মকর্তা হওয়ার পাশাপাশি একজন দক্ষ বৃটিশ গোয়েন্দাও ছিলেন, যাকে ওয়াহাবিদের জন্য খাস করে আরবে প্রেরণ করেছিল বৃটিশরা।

আধুনিক সৌদিআরব প্রতিষ্ঠার পেছনে এ ব্যক্তির বড় অবদান রয়েছে। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন কট্টর জায়নবাদি। আরবের বুকে ইয়াহুদিদের আশ্রয় পাইয়ে দিতে ওয়াহাবি রাজ ইবনু সৌদ যত ভূমিকা পালন করেন, তার পেছনের মাস্টারমাইন্ড ছিলেন এ ব্যক্তি। ব্রিটিশদের

৭৭. সৌদিআরব : সেন্ট জন ফিলবি : ২৩৮।

নির্দেশে ওয়াহাবিদের সহায়তা ও দিক নির্দেশনার লক্ষ্যে পরিব্রাজক বেশে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন নজদ ও হিজাজের বিভিন্ন প্রান্তে। ইবনু সৌদকে নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হন। একসময় প্রিয়বন্ধু ষাটোর্ধ্ব ফিলবিকে ইবনু সৌদ একটি জারিয়া বা দাসিও উপহার দিয়েছিলেন বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়, যাকে জন ফিলবি রুজি নামে ডাকতেন। ব্রিটিশ কর্ণেল জেরাল্ড থমসন তাঁর গবেষণাপত্রে এ বিষয়ে লিখেছেন,

> (১৯৪৫ এর জুলাই যখন জন ফিলবি জিদ্দাতে ফিরলেন, তাঁকে ইবনু সৌদের দরবারে তাঁর পদে পূনর্বহাল করার জন্য তলব করা হলো। রাজার (ইবনু সৌদ) কাছে তাঁর চাকরি তখনো গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যে কারণে তিনি তাঁকে একটি ষোড়শী রূপসী দাসি উপহার দিয়েছিলেন। ফিলবি তাকে রুজি নামে ডাকতেন।[৭৮]

উল্লেখ্য যে, ইবনু সৌদ একজন কট্টর তাকফিরি হওয়ার পাশাপাশি একজন নারীলোভী ব্যক্তি ছিলেন। নারীদের মোহে এতটাই অন্ধ ছিলেন যে, নিজের জীবদ্দশায় ইসলামের বিধান তোয়াক্কা না করে রেকর্ড পরিমাণ নারীকে বিয়ে করেছিলেন। ঐতিহাসিক নাসির সায়িদ প্রণীত তারিখু আলে সৌদ গ্রন্থ অনুসারে ইবনু সৌদ তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় চারশ বিয়ে করেন। বৃটিশ লেফটেন্যান্ট হেরল্ড ডিকসন যিনি ইবনু সৌদের সুপরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন তিনি ঠিক একই দাবি করেছেন। তিনি বলেন, ইবনু সৌদ স্বয়ং তাঁকে জানিয়েছেন, তিনি জীবদ্দশায় প্রায় চারশ বিয়ে করেছেন। তাঁর ভাষায়,

> সম্মানিত বাদশাহ ইবনু সৌদ আমাকে জানান যে, তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় চারশ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন।[৭৯]

জন ফিলবিও এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'ইবনু সৌদ তাঁকে বলেছেন, তিনি (যে সময় কথাটি বলেছেন ওই সময় পর্যন্ত) ১৩৫ জন কুমারি এবং আরও একশ জন অন্যান্য মহিলাকে বিয়ে করেছেন।' ফিলবির কথায়,

> ওই সময় বাদশাহ স্বীকার করেন যে, তিনি কুমারিদের বিয়ে করেছেন যা ১৩৫ এর কম হবে না। এ ছাড়াও তিনি আরও একশ মহিলাকে বিয়ে করেছেন। এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ভবিষ্যতে তিনি প্রতি বছরে কেবল দুইটি করে নতুন বিয়ে করবেন।[৮০]

এ সকল লাম্পট্য ছাড়াও তিনি ও জন ফিলবি আরবের বুকে নারীদের ধর্ষণও করেছেন বলে 'তারিখু আলে সৌদ' বইয়ে তথ্য পাওয়া যায়।

কালক্রমে ইবনু সৌদ তাঁকে নিজের পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করেন। ইবনু সৌদের পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি আবদুল্লাহ নাম ধারণ করেন। তাঁর ইসলামধর্ম গ্রহণের একটি অন্যতম কারণ ছিল, সৌদ-ব্রিটিশ সম্পর্ক ধরে রাখা এবং মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ কর্তৃক সৌদদের নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা। ১৩৪৯ হিজরির ১১ জুমাদাল উলা—৩ অক্টোবর ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিন থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা 'আল-হায়াত' এ জন ফিলবির একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়। আর্টিকেলটির শিরোনাম ছিল لماذا اعتنقت الوهابية বা কেন আমি ওয়াহাবিয়াত গ্রহণ করলাম?। উক্ত প্রবন্ধে জন ফিলবি যা লিখেছেন তা থেকে স্পষ্ট হয়, তাঁর ওয়াহাবিয়াত গ্রহণের কারণ ছিল নিতান্তই রাজনৈতিক। আর্টিকেলটির শেষের দিকে লিখেছেন, 'আজ পর্যন্ত আমি কেবল ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণেই ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করি...আর তাঁর (ইবনু সৌদের) কাছে আমার একমাত্র চাওয়া হলো, আরব ও ইংল্যান্ডের মধ্যে স্থায়ী পারস্পরিক সম্পর্ক।' সৌদি-ব্রিটিশ সম্পর্ক ছাড়াও আধুনিক ইসরাইল গঠনে জন ফিলবির বড় অবদান রয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিষদ আলোচনা করা হবে।

ইবনু সৌদের ওপর ব্রিটিশদের প্রভাব কতটুকু ছিল, তা তাঁর ও ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ পারসি কক্সের মধ্যে একটি কথোপকথন থেকে আঁচ করা যায়। ব্রিটিশ কর্ণেল লেফটেন্যান্ট ডিক্সন তাঁর Kuwait and her neighbors নামক বইয়ে ঘটনাটির স্মৃতিচারণ করেছেন। ব্রিটিশরা প্রথম থেকেই ইবনু সৌদকে প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা দিত। ইবনু সৌদ ও ওয়াহাবিরা তাদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করত। কোনো এক সময় ইবনু সৌদের কোনো এক পরিকল্পনার ওপর ব্রিটিশ মেজর জেনারেল পারসি কক্স নারাজ হন। তিনি ইবনু সৌদকে তলব করে ধমকাতে শুরু করেন। ঘটনাক্রমে ওই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডিক্সন। ইবনু সৌদ যখন দেখলেন ব্রিটিশ কর্ণেল তাঁর ওপর রাগন্বিত হয়েছেন, তখন তিনি আতঙ্কিত হয়ে প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থায় উপনীত হন। এ সময় পারসি কক্সকে তুষ্ট করতে তিনি যে কথাটি বললেন সেটা বেশ গুরুত্ববহ।

---

৭৮. H. St. John Philby, Ibn Saud and Palestine by Jerald Thompson : 34

৭৯. আরবুস সাহরা, হেরল্ড ডিকসন : ১৪৫

৮০. مذكراتي السياسية مع الملك عبد العزيز آل سعود لجون فيلبي، ص ١٧٥

তিনি অনুগত ভৃত্যের ন্যায় পারসি কক্সকে নিজের পিতা-মাতা হিসেবে সম্বোধন করে বললেন, তিনি তাঁকে সবকিছু দিয়েছেন এবং পারসি কক্স চাইলে তাঁর রাজত্ব সবটাই পারসি কক্সের হাতে অর্পণ করবেন। জেনারেল ডিক্সন লিখেছেন,

> ষষ্ঠ দিনে স্যার পারসি তালিকায় যুক্ত হলেন। তিনি উভয় পক্ষকে বলেছিলেন, তারা যেভাবে এগোচ্ছে, এক বছরে কিছুই নিষ্পত্তি হবে না। একটি গোপন বৈঠকে যেখানে শুধুমাত্র তিনি, ইবনে সৌদ ও আমি উপস্থিত ছিলাম সেখানে তিনি ইবনে সৌদের উপজাতীয়-সীমান্ত সংক্রান্ত শিশুসুলভ পরিকল্পনা দেখে তাঁর সকল ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। স্যার পারসির আরবি খুব একটা ভাল ছিল না, তাই আমি অনুবাদ করে দিচ্ছিলাম। নজদের সুলতানকে হাইকমিশনার কর্তৃক এমনভাবে দুষ্টু স্কুলবয়ের মতো তিরস্কৃত হতে দেখে এবং হাইকমিশনার কর্তৃক তাকে (তিরস্কারস্বরূপ) এটা বলতে দেখে, তিনি অর্থাৎ, স্যার পারসি কক্স নিজেই সীমান্তের ধরন ও জেনারেল লাইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন, আমি অবাক হচ্ছিলাম। এটি সংকটের অবসান ঘটল। ইবনু সৌদ প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং করুণভাবে বলতে লাগলেন, স্যার পারসি হলেন তার বাবা-মা, যিনি তাকে মানুষ করেছেন এবং শূন্য থেকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছেন এবং (ইবনে সৌদ আরও বলতে লাগলেন যে) স্যার পারসি আদেশ দিলে তিনি তার অর্ধেক রাজ্য, বরং পুরোটাই তাঁর হাতে সমর্পণ করবেন।[৮১]

উপরোক্ত কথোপকথন থেকে ওয়াহাবি ইমাম ইবনু সৌদের উপর বৃটিশদের প্রভাবের গভীরতা যে কতখানি ছিল, তা সহজে অনুধাবন করা যায়।

যাইহোক, আমিরাতে জাবাল শাম্মারের কাছে চরমভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার পর আবদুল আজিজ ইবনু সৌদ মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল, আমিরাতে জাবাল শাম্মার ধ্বংস করে সম্পূর্ণ নজদ অঞ্চলের ওপর নিজের একাধিপত্য কায়েম করা। যখন সে স্বপ্ন ভেঙে গেল, তখন তাঁকে ব্যর্থতার গ্লানি পেয়ে বসল। এদিকে নজদের ব্যর্থতার খবর পেয়ে ব্রিটিশরা তড়িঘড়ি আবদুর রহমান ইবনু ফয়সালের সঙ্গে দেখা করল। জন ফিলবি বলেন, 'আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা আবদুর রহমান আলে সৌদের কাছে তাঁকে পুণর্বার অনুরোধ করতে এলেন এই বলে যে, "আমরা আপনার কাছে এটা আশা করি না যে, আপনি কুয়েত থেকে বেরিয়ে যান। আপনি এখানে থাকবেন। আমরা যেটা চাই সেটা হলো, আমরা আমাদের এ আন্দোলনের জন্য কেবল আপনার নাম ব্যবহার করব... আর আপনি আমাদের হৃদয়ের সবথেকে কাছে তম ব্যক্তি।" প্রত্যুত্তরে আবদুর রহমান ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের তাঁর বার্ধক্যের কথা জানিয়ে বললেন, "আমার ব্যাপারে বলতে গেলে, আমি শেষ হয়েছি, কিন্তু আমি আমার ছেলেকে আপনাদের কাছে (এ কাজের জন্য) পেশ করব কারণ, সে তার বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও আপনাদের উপকার দিবে।"

এভাবে ইবনু সৌদের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়ে ক্ষান্ত হলেন পিতা আবদুর রহমান। এখান থেকে শুরু হলো, ইবনু সৌদের নেতৃত্বে ওয়াহাবি ও ব্রিটিশদের যৌথ উদ্যোগে নতুন ওয়াহাবি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যাত্রা।

ওয়াহাবিদের নির্দেশক হিসেবে ব্রিটিশ গোয়েন্দা উইলিয়াম হেনরি শেকসপিয়র

ব্রিটিশদের সঙ্গে নিয়ে ওয়াহাবি ইমাম ইবনু সৌদ এবার হিজাজ ও নজদ প্রদেশকে পরিপূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি সর্বাগ্রে উসমানিদের অধিনস্থ ওলায়াতে নজদ বা আহসা প্রদেশের দিকে মনোনিবেশ করলেন। 'দ্য বার্থ অফ সৌদিআরব' বই অনুসারে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে ইবনু সৌদ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে তাঁর এ ইচ্ছা জানিয়ে তাদের সহায়তা প্রার্থনা করেন। এ সময় ব্রিটিশ মেজর জেনারেল পারসি কক্স পারসিয়ান গাল্ফে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি ইবনু সৌদের আবেদন গুরুত্বসহকারে পর্যবেক্ষণ করেন এবং ওপর মহলকে বিষয়টি অবগত করেন। পারসি কক্সের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হেনরি শেকসপিয়রকে ইবনু সৌদের সহায়তার জন্য পাঠায়। শেকসপিয়র দায়িত্ব পেয়ে নজদে ওয়াহাবিদের খিদমতে হাজির হন। তিনি ক্রমশ ইবনু সৌদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন। এ ছাড়া ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইবনু সৌদের পরামর্শদাতা হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন। শেকসপিয়রের সহায়তায় ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ইবনু সৌদ উসমানিদের থেকে আহসা দখলে নেয়।

এভাবে ব্রিটিশরা সৌদিকে সহায়তা প্রদানের বিনিময়ে উসমানিয় খিলাফতের বিরুদ্ধে আলে সৌদকে ব্যবহার করতে শুরু করে। আহসা দখলের এক বছর পর অর্থাৎ, ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইবনু সৌদ ও ব্রিটিশদের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা ইতিহাসে দারিন চুক্তি বা The Treaty of Darin নামে পরিচিত। মূলত এ চুক্তি ছিল, উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ও সৌদদের ঐক্যের ঘোষণাপত্র। দারিন চুক্তির দুইটি

৮১. Kuwait and her Neighbors by Lt. Harold Richard Patrick Dickson : 274

গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল, ব্রিটিশরা সৌদদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করবে বিনিময়ে সৌদরা উসমানিদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের অনুগত বাহিনী হিসেবে সহায়তা করবে। দারিন চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশরা প্রত্যক্ষভাবে ইবনু সৌদ ও ওয়াহাবিদের সামরিক, আর্থিক ও অস্ত্র সহায়তা প্রদান শুরু করল। এদিকে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারিতে আমিরাতে জাবাল শাম্মার ও ওয়াহাবিদের মধ্যে জার্রাবের যুদ্ধ চলাকালীন জাবাল শাম্মারের একজন মুজাহিদ উইলিয়াম শেকসপিয়রের ওপর গুলি করে। গুলির আঘাতে শেকসপিয়রের মৃত্যু ঘটে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মৃত্যুর আগ মূহুর্তেও তিনি ইবনু সৌদ বাহিনীকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন।

ওয়াহাবিদের নির্দেশক হিসেবে গোয়েন্দা জন ফিলবি

ব্রিটিশ পরামর্শদাতা শেকসপিয়রের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে ইবনু সৌদ গভীর শোকের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। তিনি ব্রিটিশ মেজর জেনারেল পারসি কক্সকে শোকবার্তা পাঠিয়ে একটি পত্র লেখেন। পত্রে তিনি লেখেন,

> *হায়! আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী অল্পদূরত্ব থেকে আহত হলেন এবং মৃত্যু বরণ করলেন। আমরা যুদ্ধের আগে তাঁকে আমাদেরকে পরিত্যাগ করার জন্য চাপ দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি এ বলে উপস্থিত থাকার ওপর জিদ ধরলেন, 'আমার আদেশ-নিষেধ তোমাদের সঙ্গে থাকা উচিত, পরিত্যাগ করাটা হবে আমার মর্যাদা ও আদেশ নিষেধের পরিপন্থি। আমাকে অবশ্যই থাকতে হবে।' মহামান্য সরকারকে আমার শোক পৌঁছে দেওয়ার একান্ত অনুরোধ করছি*[৮২]

শেকসপিয়রকে হারানোর পর সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়ার জন্য ইবনু সৌদের নতুন এক ব্রিটিশ গোয়েন্দা অথবা নির্দেশকের প্রয়োজন পড়ল। ফলে তিনি পারসি কক্সকে একটি পত্রের মাধ্যমে নতুন একজন ব্রিটিশ নির্দেশক পাঠানোর অনুরোধ করলেন। ডেভিড হাওয়ার্থ বলেছেন, 'ইবনু সৌদ কক্সকে অন্য একজন অফিসার পাঠানোর অনুরোধ করলেন।'[৮৩]

একজন মূল্যবান অফিসার হারানোয় ব্রিটিশরা নতুন আরেকজন অফিসার প্রেরণের ক্ষেত্রে দ্বিধায় পড়ে গেল। ফলে প্রাথমিকভাবে ইবনু সৌদের আবেদনে তারা সাড়া দিল না। তবে পরবর্তী সময়ে তারা নতুন আরেকজন ব্রিটিশ অফিসার সৌদদের খিদমতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এবার শেকসপিয়রের জায়গায় নতুন অফিসার হিসেবে নিয়োগ পেলেন, স্যার জন ফিলবি যিনি পরবর্তীতে মুসলিম ছদ্মনাম ধারণ করেন আবদুল্লাহ ফিলবি।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে জন ফিলবি তাঁর আরব অ্যাডভেঞ্চার শুরু করলেন। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর আহসার কাছে স্থ উকায়র নামক এলাকায় ইবনু সৌদের স্থানীয় গভর্নর তাঁকে ওয়াহাবিভূমে অভ্যর্থনা জানান। এর প্রায় ১৫ দিন পর ৩০ নভেম্বরে ফিলবি নজদের রিয়াদে পৌঁছেন এবং নজদের মোড়ল ও ওয়াহাবিদের আমির ইবনু সৌদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফিলবি তাঁর 'রিপোর্ট অফ নজদ মিশন' এ বলেন, তিনি দীর্ঘ নয় দিন যাবৎ ইবনু সৌদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ বিষয়াদি ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। ইতিহাসবিদ ড্যানিয়েল সিলভারফার্ব লিখেছেন, 'ফিলবি ও ইবনু সৌদের মধ্যে প্রথম হায়িল (আমিরাতে জাবাল শাম্মার) আক্রমণে প্রয়োজনীয় ব্রিটিশ সামরিক ও আর্থিক সহায়তার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়।'[৮৪] হায়িল রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হওয়ায় ব্রিটিশ ও সৌদরা প্রথম হায়িল আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়।

মজলিসুর রুব

এরপর জন ফিলবি ইবনু সৌদের নেতৃত্বে একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কমিটি গঠন করেন। এ নব্যগঠিত কমিটির নাম দেওয়া হয় মজলিসুর রুব বা মজলিসুল জামাআ। কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ফিলবি নিজে। তাঁর অধীনে এ কমিটির সদস্যদের অন্যতমরা ছিলেন যথাক্রমে মিসর থেকে হাফিজ অহবা, মরক্কো থেকে খালিদ করকরি, সিরিয়া থেকে ফুআদ হামজা ও ইউসুফ, লিবিয়া থেকে বশির আস-সাদালবি, ইরাক থেকে আবদুল্লাহ আদ-দামলুজি, লেবানন থেকে হুসাইন আল-উয়াইনি প্রমূখ। মজলিসুল জামাআকে নিয়ন্ত্রণ করত তদানীন্তন ভারতীয় ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা। তাদের নির্দেশ মোতাবিক এ কমিটি নানা বিভ্রান্তিকর ফাতওয়া জারি করত এবং তদানীন্তন ওয়াহাবিবাহিনী বিশেষ করে ইখওয়ানবাহিনী এসব ফাতওয়া বিনা যাচাই-বাছাইয়ে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল। তারিখু আলে সৌদে বর্ণিত হয়েছে, 'একদা এ মজলিস উদ্ভট

৮২. দ্য ডেজার্ট কিং : ১০৪

৮৩. দ্য ডেজার্ট কিং : ১০৪

৮৪. The Philby Mission to Ibn Sa'ūd : 273

একটি ফাতওয়া জারি করল যে, যারা আমিরাতে জাবাল শাম্মার বা হায়িলবাসী অথবা ইবনু সৌদের বিরোধীদের মধ্যে থেকে দশজনকে হত্যা করবে তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ওয়াহাবিরা এ ফাতওয়া সত্য ভেবে নজদে হত্যাকাণ্ড শুরু করে।' এ সকল বিভ্রান্তিকর ফাতওয়াগুলো তারা যেসব কারণে হক মনে করেছিল, তার মধ্যে একটি অন্যতম কারণ ছিল, তারা ওয়াহাবি মতাদর্শ ছাড়া অন্য সব মুসলিমকে কাফির গণ্য করত, যেমনটা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি এবং পরবর্তী পর্বে বিষদ আলোচনা করব।

ওয়াহাবিদের নিকৃষ্ট তাকফিরি মনোভাবের একটি নমুনা হলো, ওয়াহাবিরা তাদের মতাদর্শের বাইরের মুসলিমদের ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের থেকেও নিকৃষ্টতর কাফির মনে করত। জন ফিলবি তাঁর Arabia of the Wahhabis নামক বইয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে ইবনু সৌদের একটি কথোপকথন উল্লেখ করেছেন যেখানে ইবনু সৌদ স্পষ্ট বলেন যে, ওয়াহাবিরা ব্রিটিশ মেয়েদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত, কিন্তু ওয়াহাবি মতাদর্শের বাইরের মুসলিম যাদের তারা মুশরিক হিসেবে গণ্য করত, তাদের মেয়েদের বিয়ে করতে তারা প্রস্তুত নয়। কারণ, ব্রিটিশরা তাদের কাছে আহলে বই হলেও ওয়াহাবি মতাদর্শের বাইরের মুসলিমরা ছিল তাদের কাছে অপবিত্র মুশরিক। জন ফিলবি লেখেন,

> ইবনু সৌদ তড়িৎ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন যে, অধিকাংশ সময় তাদের ইংরেজ হোস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে কেটেছে এবং তারা খুবই আঞ্চলিক মুসলিমদের দেখেছে। এরপর তিনি তাঁর প্রিয় বিষয় খৃষ্টান ও ওয়াহাবি নয় এমন মুসলিম যাদের (ওয়াহাবি কর্তৃক) মুশরিকিনদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক খাঁটিত্বের আলোচনা টানার সুযোগটি হাতিয়ে নিলেন। 'কেন!' তিনি বললেন, 'যদি তোমরা ইংরেজরা আমায় তোমাদের কন্যাদের বিয়ের প্রস্তাব দাও, আমি তাদের একটি শর্তে তাদের গ্রহণ করব যে, বিয়ের ফলে জন্ম নেওয়া সন্তান মুসলিম হবে। কিন্তু আমি শরিফ বা মক্কাবাসীর অথবা অন্য মুসলিম কন্যাদের (স্ত্রী হিসেবে) গ্রহণ করব না, যাদের আমরা মুশরিক হিসেবে গণ্য করি।[৮৫]

জন ফিলবির নেতৃত্বাধীন দাজ্জালি কমিটির ফিতনায় নজদ ও হিজাজ ফিতনার আমানিশায় ঢেকে গেল। অজ্ঞ ওয়াহাবিরা নির্বোধের মতো তাদের বিভ্রান্তিকর ফাতওয়ার ওপর অন্ধভাবে ইমান এনে বসল। তাদের এমনভাবে মগজধোলাই করা হয়েছিল যে, তারা মজলিসের ফাতওয়ায় নিজেদের ইমান বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিল। তবে মজলিসের ভণ্ডামি নজদের সাধারণ মানুষ এবং যারা দীন সম্পর্কে ধারণা রাখেন তাদের দৃষ্টিতে ঠিকই ধরা পড়েছিল। ব্রিটিশ কর্ণেল এইচ আর পি ডিকসন তাঁর বই Kuwait and her Neighbors-এর মধ্যে তদানীন্তন একজন শায়খ ইবনু সুহমা নামক গোত্রনেতার একটি কথা নকল করেছেন। শায়খ আলে সৌদের এ ধরনের কার্যকলাপ দেখার পর ওয়াহাবিদের সমালোচনা করে বলেন, তারা জানতেন না যে ব্রিটিশরা ইবনু সৌদ ও জন ফিলবির মাধ্যমে ইসলামকে নতুন করে চেনাতে শুরু করে অর্থাৎ, ইসলামকে বিকৃতভাবে প্রচার করা শুরু করে।

ইমারতে জাবাল শাম্মার দখল

ফিলবি আলে সৌদ শিবিরে যোগদানের পর ইবনু সৌদের বিপ্লবে নতুন করে প্রাণসঞ্চার ঘটল। জন ফিলবির নির্দেশ অনুযায়ী নতুন করে রণসজ্জায় সজ্জিত হতে শুরু করল ওয়াহাবিবাহিনী। ইবনু সৌদের এবারের লক্ষ্য ছিল, নজদ ও হিজাজের বিরোধীপক্ষের শেষ শক্তিশালী ঘাঁটি ও ওয়াহাবিদের পুরোনো শত্রু ইমারতে জাবাল শাম্মার। ভৌগোলিক দিক থেকেও জাবাল শাম্মার ছিল কৌশলগত অবস্থানে। ইবনু সৌদ জাবাল শাম্মার দখলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়ার কারণ ছিল, জাবাল শাম্মার দখলে এলে তিনি নজদ ও হিজাজের মোড়ল হওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবেন। কিন্তু এ সময় ইবনু সৌদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আর্থিক সমস্যা। আর্থিক ঘাটতির ফলে সৌদপক্ষ ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছিল। পরিস্থিতি উপলব্ধি করে জন ফিলবি সত্বর ব্রিটিশ সরকারের কাছে ইবনু সৌদের জন্য মাসিক ৫ হাজার ইউরো ভাতার ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন করেন। Report on the Najd Mission-এর মধ্যে জন ফিলবি এ কথা উল্লেখ করেছেন।

এদিকে পারসি কক্স ও ইবনু সৌদের আমিরাতে জাবাল শাম্মার আক্রমণের পরিকল্পনাকে স্বাগত জানান। তিনি চাইছিলেন, উসমানি প্রভাবিত আমিরাতে জাবাল শাম্মার মানচিত্র থেকে মুছে দিয়ে সেখানে ব্রিটিশ সমর্থিত ইবনু সৌদের কর্তৃত্ব মজবুত করতে। ফিলবি উল্লেখ করেন, 'পারসি কক্স জানান ইবনু সৌদকে এ হামলার জন্য বৃটেন ১ হাজার রাইফেল ও ১০ হাজার রাউন্ড গুলি সরবরাহ করবে এবং ইবনু সৌদ এ অভিযানে সফল হলে ব্রিটিশরা তাঁর মাসিক অনুদান ৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার ইউরো প্রদান করবে।'[৮৬]

---

৮৫. Arabia of the Wahhabis : 22-23

৮৬. অ্যারাবিয়ান জুবিলি : ৫৮

পরিকল্পনামাফিক ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ইবনু সৌদের ওয়াহাবিবাহিনী ব্রিটিশদের সহায়তায় ইমারতে জাবাল শাম্মার আক্রমণ করে বসে। দীর্ঘ যুদ্ধ ও তান্ডবের পর ওই বছর নভেম্বর মাসের ২ তারিখে পতন ঘটে যায় নজদের ঐতিহাসিক স্বাধীনচেতা ইমারতে জাবাল শাম্মারের। ইমারতটির শেষ শাসক আমির মুহাম্মাদ ইবনু তালাল বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে করতে একপর্যায়ে জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক গুপ্তহত্যায় শহিদ হন। পরিশেষে হায়িলও আলে সৌদদের দখলে চলে আসল। ফলে জাবাল শাম্মার ও নজদের ওপর ইবনু সৌদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হলো। তারিখু আলে সৌদে ইবনু সৌদের হায়িল সফরের একটি লোমহর্ষক বিবরণী উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবনু সৌদ ও ফিলবি প্রথমবারের মতো হায়িলে প্রবেশ করার পর বিবাহের নামে হায়িলের একাধিক নারীকে ধর্ষণ করেন, যাদের মধ্যে ছিল ইমারতে জাবাল শাম্মারের আমিরের পরিবার আলে রশিদের কিছু সদস্যবর্গও।

ইয়েমেনি হাজিদের গণহত্যা

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ওয়াহাবিদের কর্তৃক সবচেয়ে নিকৃষ্টতম গণহত্যাটি সংঘটিত হয়েছিল ১৩৪১ হিজরি—১৯২৩ সনে। ওই বছর জিলকদ মাসের ১৬ তারিখ শনিবার দিন পবিত্র হিজাজের তানুমা নামক জায়গায় হজের উদ্দেশ্যে আগত ইয়েমেনি এক বিশাল সংখ্যক হাজিদের ওপর হঠাৎ চড়াও হয় ওয়াহাবিবাহিনী। এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে তারা হত্যা করে প্রায় ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার নিরপরাধ হাজি।

শাহাদাতপ্রাপ্ত হাজিদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এক গ্রন্থের তথ্যমতে তানুমা গণহত্যায় শাহাদাতপ্রাপ্ত হাজিদের সংখ্যা ১ হাজার বলা হয়েছে।[৮৭] অন্য গ্রন্থের তথ্যমতে শহিদ হাজিদের মোট সংখ্যা দুই হাজার অতিক্রম করেছিল, যার মধ্যে ৯০০ জনের ধড় থেকে মাথা আলাদা করা হয়েছিল।[৮৮] রশিদ রিদার তথ্য অনুযায়ী এ হত্যাকাণ্ডে ৩ হাজার হাজি শহিদ হন, যাদের জুলুম করে হত্যা করা হয়েছিল।[৮৯] কোনো কোনো মতে উক্ত হত্যায় ৬ হাজার, আবার কোনো কোনো মতে ৮ হাজার জন হাজি শহিদ হন।

তানুমা গণহত্যার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল আহনুমি বলেন, 'ওয়াহাবিরা তাদের ছাড়া বাকি সকল মুসলিমদের তাকফির করত এবং তাদের মুশরিক হিসেবে পরিগণিত করত।[৯০]

তায়েফ গণহত্যা

ওয়াহাবিদের কলঙ্কিত ইতিহাসের রক্তাক্ত অধ্যায়গুলোর একটি হলো তায়েফ গণহত্যা। তানুমা গণহত্যার ঠিক পরের বছর অর্থাৎ, ১৩৪২ হিজরি—১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে তায়েফে ওয়াহাবিরা নতুন করে আরও একটি গণহত্যা চালায়। ওই বছরের আগস্টের শেষের দিকে অথবা সেপ্টেম্বরের শুরুতে ইবনু সৌদের নেতৃত্বাধীন 'ইখওয়ান মান আতাআল্লাহ' নামক ওয়াহাবি দল, তায়েফ আক্রমণ করে এবং হাশিমি বংশের পতন ঘটায়। হাশিমি বংশের পতন ঘটলে ওয়াহাবিরা তায়েফ দখলের পর পুরো তায়েফ জুড়ে তান্ডব চালিয়ে ব্যাপকসংখ্যক মানুষ হত্যা করে। এক গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী উক্ত গণহত্যায় প্রায় ২ হাজার মুসলিম শহিদ হন যাদের মধ্যে উলামা, সুলাহা ও নারী-পুরুষ রয়েছেন।[৯১] মক্কা থেকে প্রকাশিত 'আল-ফালাহ' পত্রিকার ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় উক্ত গণহত্যায় শহিদের সংখ্যা ৫ হাজারের বেশি বলা হয়েছে। পত্রিকায় শহিদদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন, সত্তরোর্ধ শাফিয়ি মুফতি শায়খ আবদুল্লাহ আজ-জাওয়াবি, তায়েফের কাজি শায়খ আবদুস সালাম মুরাদ ও তায়েফের বরিষ্ঠ আলিম ও কাজি শায়খ আবদুর রহমান।

আলি আল-ওয়ারদি ওয়াহাবিদের তায়েফ আক্রমণের বিভৎসতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

> (তারা) খালি আকাশে গুলি ছুঁড়ছিল এরপর তারা শহরটির রাস্তা ও গলিসমূহে ঘুরতে লাগল, আর তাদের রাস্তায় যাকে দেখছিল তাকে গুলি ছুঁড়ছিল, এরপর অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকল, ইখওয়ান ঘরবাড়ির দরজা ভাঙতে লাগল, তার মধ্যে বলপূর্বক প্রবেশ করতে

৮৭. কাশফুল ইরতিআব : ৫৪

৮৮. জারিদাতুল কিবলাহ, সংখ্যা ৭০৩, পৃষ্ঠা ১, এবং সংখ্যা ৭০৫, পৃষ্ঠা ৪

৮৯. মাজাল্লাতুল মানার, সংখ্যা ২৭, পৃষ্ঠা ১৮; ১৩৫২ হিজরি

৯০. মাজযারাতুল হিজায আল কুবরা, ডক্টর আল আহনুমি, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০

৯১. কাশফুল ইরতিয়াব, আমিলি, পৃষ্ঠা ৫৫

লাগল এবং লুণ্ঠন ও হত্যা করতে লাগল। তারা তাদের ছাড়া সবাইকে কাফির বলে মনে করত এবং তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল মনে করত।[৯২]

ফিলিস্তিন থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত এক পত্রিকায় ঘটনাটির খবর استيلاء الوهابيين علي الطائف শিরোনামে প্রকাশিত হয়। উক্ত খবরে ওয়াহাবিদের তায়েফে তাণ্ডবের বিভৎসতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

> ওয়াহাবিরা তায়েফ শহরে হানা দিয়েছে, জ্ঞানসমৃদ্ধ গ্রন্থাগারসমূহ ও গৃহগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে, আউলিয়াদের মাজারসমূহ ধ্বংস করেছে, যাদের মধ্যে হিবরুল উম্মাহ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর মাজার রয়েছে, তারা সম্পদ লুঠ করেছে, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক ও উলামাদের হত্যা করেছে, মহিলাদের থেকে গর্ভবতীদের পেট চিরে ফেলেছে, তাদের হত্যা করেছে এবং তাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে।[৯৩]

হায়িল দখলের কয়েক বছর পর ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশদের সাহায্যে ওয়াহাবিরা হিজাজি হাশিমি রাজবংশের পতন ঘটায়। ফলে নজদ ও হিজাজে সৌদদের বিরোধিতা করার মতো আর কোনো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ থাকল না। নজদ ও হিজাজে ওয়াহাবিদের আধিপত্য বিস্তার ঘটল। এ ঘটনার কয়েক বছর পর ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশদের সহায়তায় আলে সৌদরা হিজাজ ও নজদে তাদের রাষ্ট্র কায়িম করে। যা তাদের নামানুসারে নামকরণ করা হয় সৌদিআরব। এভাবে আরবের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়, পশ্চিমের একান্ত অনুগত সৌদি রাষ্ট্রের।

www.muslimdm.com

৯২. কিসসাতুল আশরাফ ওয়া ইবনু সৌদ : ২৩২

৯৩. ফিলিস্তিন : ১৬ সফর ১৩৪৬ হিজরি, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ সংখ্যা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিলামে ফিলিস্তিন

www.muslimah.com

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিরাট এক পরিবর্তন আসে। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে খলিফাতুল মুসলিমিন সুলতান আবদুল হামিদ খান আস-সানির অপসারণের পর উসমানি সাম্রাজ্য অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে পড়ে খিলাফতের সীমারেখা। এরপর ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের মুসলিম জাহানের সর্বশেষ খিলাফত উসমানি খিলাফতের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমবিশ্বের মানচিত্র সম্পূর্ণরূপে বদলে যায়। ইউরোপ সীমান্ত থেকে নিয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া জুড়ে সুবিস্তৃত মুসলিম খিলাফত ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আরব জাহান পরিণত হয় ব্রিটিশ অথবা ফ্রেঞ্চ কলোনিতে। ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে মুসলিম সাম্রাজ্য। পিতৃহারা কৃশকায় সন্তান যেমন ভবলেশহীন জনাকীর্ণ পথের এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়, মানুষের দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়ায়, তেমনি খলিফা নামক মাথার ছাতাটি সরে যাওয়ার ফলে মুসলিম উম্মাহ পিতৃহারা ও দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সেই মোক্ষম সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শত্রুরা তাদের ওপর আক্রমণ করতে শুরু করে, ঠিক যেমনভাবে ক্ষুধার্ত পশুরা খাদ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখন আর মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ রইল না। আরব ও মুসলিমবিশ্বকে দাসে পরিণত করতে উঠেপড়ে লাগল সম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারীরা। কিন্তু স্বাধীনচেতা আরবদের যে বেশিদিন ঔপনিবেশিক শাসন দ্বারা অবদমিত করে রাখা যাবে না, এটা পশ্চিমের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো বেশ ভালো করেই বুঝত। তাই তারা চলে যাওয়ার পর মুসলিমরা আবার যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে এবং প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের ওপর অন্য শক্তি এসে ভাগ বসাতে না পারে—নজরদারির জন্য মধ্যপ্রাচ্যে তাদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটির প্রয়োজন ছিল। আলে সৌদদের মতো কিছু ভৃত্য তৈরিতে সক্ষম হলেও তারা এসব দুর্বল রাজবংশগুলির ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করতে অথবা আস্থা রাখতে পারল না। তাই মধ্যপ্রাচ্যে তাদের জন্য দরকার ছিল একটি নিজস্ব মানমন্দির। আর এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য জায়নবাদের কোনো বিকল্প ছিল না। তারা বুঝতে পারল যে, বিতাড়িত ছন্নছাড়া ইয়াহুদিদের মধ্যপ্রাচ্যে যদি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়ে দেওয়া যায়, সেটা পরবর্তীতে তাদের জন্য একটি শক্তিশালী দূর্গে রূপান্তরিত হবে। তা ছাড়া সে ভূমি ব্যবহার করে তারা আরবদের উপর নজরদারি চালাতে পারবে এবং আরবদেরকে নিজেদের আয়ত্তে রাখতে পারবে। এ জন্য পশ্চিমারা আরবদেরকে তাদের আয়ত্তে রাখতে মধ্যপ্রাচ্যে নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডে ইয়াহুদিদের আবাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ঘাঁটি হিসেবে তারা বেছে নেয় ফিলিস্তিনের পবিত্র জমিনকে। কারণ, ইয়াহুদিরা ফিলিস্তিনকে পবিত্র জমিন ও তাদের পিতৃভূমি হিসেবে মনে করত এবং সেখানে ফিরে যাওয়ার জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় দেশগুলোতে ইয়াহুদিশক্তি ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। মানেসসেহ বেন ইসরাইল (১৬০৬-১৬৫৭ খৃ.) নামক আমস্টারডাম নিবাসী একজন পর্তুগিজ কাব্বালিস্ট ইয়াহুদি রাব্বির নেতৃত্বে খ্রিষ্টান প্রভাবিত ইউরোপে ইয়াহুদিবাদী একটি সুপ্ত আন্দোলন জন্ম নেয়। প্রাথমিক যুগে এ বিপ্লব সুপ্ত অবস্থায় থাকলেও পরে সেটা বৃহদাকার রূপ নেয়। মধ্যযুগে ইউরোপীয় ইয়াহুদিরা ছিল খ্রিষ্টানদের কর্তৃক নির্যাতিত ও নিপীড়িত। তারা সমাজচ্যুত বিচ্ছিন্ন যাযাবরদের মতো কালাতিপাত করত। ইতিহাস থেকে আমরা চতুর্দশ শতাব্দীর ইউরোপীয় খ্রিষ্টান কর্তৃক নির্যাতিত ইয়াহুদিদের বিবরণী পেয়ে থাকি। বিখ্যাত ইংলিশ ঔপন্যাসিক উইলিয়াম শেকসপিয়র তাঁর বিখ্যাত 'দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস'

নাটকে তৎকালীন ইউরোপে ইয়াহুদিদের ওপর নির্যাতনের বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের কাছে ইয়াহুদিরা এতটাই ঘৃণিত ছিল যে, খ্রিষ্টানরা তাদের ওপর থুতু নিক্ষেপ করতেও দ্বিধাবোধ করত না। যদিও ইয়াহুদিদের প্রতি এমন অত্যাচারের পেছনে সম্পূর্ণ দায় খ্রিষ্টানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা অন্যায় হবে। কারণ, ইয়াহুদিরাই তাদের এমন পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। যুগে যুগে তাদের অবাধ্যতা ও অশিষ্টাচার ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ। পবিত্র কুরআন মাজিদ ও বাইবেলে তাদের অবাধ্যতার বহু নমুনা পাওয়া যায়।

যাইহোক, এমনি এক অত্যাচারিত ইয়াহুদি পরিবেশে বেড়ে ওঠা বেন ইসরাইল সর্বদা মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্ন দেখতেন, শিঘ্রই কোনো ইয়াহুদি রক্ষাকর্তার আবির্ভাব ঘটবে, যার নেতৃত্বে ইয়াহুদিদের পুনরুত্থান ঘটবে। তিনি মনে করতেন, ইয়াহুদিদের হারিয়ে যাওয়া দশটি গোত্র যারা ইতিহাসে The Lost Ten Tribes নামে পরিচিত, তারা অদূর ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি ইসরাইল জাতির জন্ম দেবে এবং ফিলিস্তিনে ইয়াহুদিরা পুনরায় আবাদ হবে। এ স্বপ্ন নিয়ে তিনি ইয়াহুদিদের মধ্যে নবজাগরণ ঘটাতে চাইলেন। ইয়াহুদিদের স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। এ লক্ষ্যে তিনি একের পর এক বই প্রকাশ করে ইয়াহুদিদের নতুন করে আশা ও অনুপ্রেরণা যোগাতে শুরু করলেন। বেন ইসরাইলের বইগুলো তদানীন্তন প্রচলিত রাব্বিদের বই থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিল। তিনি তাঁর বইগুলোকে কাব্য, সাহিত্য ও আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া লাগিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে পরিবেশন করতেন, ফলে তদানীন্তন ইউরোপীয় ইয়াহুদিদের ওপর তিনি ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হন। ইয়াহুদিরা দলে দলে তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে শুরু করে। চতুর বেন ইসরাইল মনে করতেন, ইয়াহুদিদের ফিলিস্তিন দখলের জন্য ইংল্যান্ডকে প্রথম কব্জায় আনতে হবে এবং সেখানে তাদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে, যেহেতু ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড ছিল ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র। ইংল্যান্ডে বসতি স্থাপনের স্বপ্ন নিয়ে তিনি ১৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর শ্যালক ডেভিড আব্রাবানেলকে বৃটেনে পাঠান সেখানে ইয়াহুদিদের পুনর্বাসনের আর্জি জানিয়ে। সর্বজনবিদিত ইয়াহুদিবাদী মতবাদ জায়নবাদের ধারণাটি ইংল্যান্ডে ইয়াহুদিদের পুনর্বাসনের সূচনালগ্নে রাব্বি বেন ইসরাইলের হাত ধরে ধরাবক্ষে আগমন করে। বলা যায়, তিনিই ছিলেন জায়নবাদ আন্দোলনের অগ্রদূত।

বেন ইসরাইলের পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ছিল ইয়াহুদিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় ইয়াহুদিদের জায়নবাদী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয় ইউরোপের একশ্রেণির খ্রিষ্টান যাদের মধ্যে ছিলেন, বুদ্ধিজীবী, উকিল, দার্শনিক ও সাহিত্যিকরা। ইয়াহুদিবাদী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা ইউরোপে ইয়াহুদিদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে শুরু করেন। তারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে সাহিত্যিক ও দার্শনিক ভঙ্গিমায় ইয়াহুদিদের অধিকারের জন্য সরব হন। তাদের মাধ্যমে ইয়াহুদিবিদ্বেষী ইউরোপের বুকে গড়ে ওঠে জায়নবাদী খ্রিষ্টান সাহিত্য (Zionist Christian Literature)। এ জায়নবাদী খ্রিষ্টান সাহিত্যের বিকাশে যারা মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন, রেভারেন্ড জেমস বিশেনো (১৭৫১-১৮৩১)। তিনি ভবিষ্যতে ইসরাইলের মুক্তি ও ফিলিস্তিনে তাদের পুণর্বাসন স্থাপনের বিষয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। বিশেনো লিখিত দুইটি বই 'The Restoration of the Jews ও The Crisis of all Nations'-এর মধ্যে তিনি ইয়াহুদিদের অধিকার ও তাদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপীয়দের মধ্যে জায়নবাদী আন্দোলন ব্যাপক প্রভাব ফেলতে শুরু করে। খ্রিষ্টানদের সমর্থন জোরদার করার উদ্দেশ্যে সে সময় ধর্মভীরু ইউরোপে জায়নবাদীরা প্রচার করতে শুরু করল যে, ইয়াহুদিদেরকে ফিলিস্তিনে পূণর্বাসনের মধ্যে খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদিদের সাফল্য নিহিত রয়েছে। এ বিষয়ে তারা বাইবেলের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্‌বাণী উদ্ধৃত করে খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করল। খ্রিষ্টানরাও জায়নবাদীদের এ ধরনের প্রচারণায় প্রভাবিত হতে লাগল। ঠিক এমন সময় থমাস উইদারবাই (১৭৬০-১৮২০) নামক একজন খ্রিষ্টান জায়নবাদী উকিল ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের থেকে ইয়াহুদিবিদ্বেষ প্রশমনের লক্ষ্যে ময়দানে অবতীর্ণ হন। তিনি An attempt to remove prejudices concerning the Jews Nation নামক একটি বই রচনা করেন। এর মধ্যে সমসাময়িক ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের মধ্যে ইয়াহুদিদের ব্যাপারে প্রচলিত ধারণা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সরব হন। এ ছাড়া একটি স্বাধীন ইয়াহুদি রাষ্ট্রের পক্ষে ওকালতি করেন। উক্ত বইয়ে তিনি ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের দুঃখজনক আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। উইদারবাই ছিলেন প্রথম ব্রিটিশ খ্রিষ্টান জায়নবাদী লেখক যিনি ইয়াহুদিদের ফিলিস্তিনের ভূমির দাবির সঙ্গে ইয়াহুদি নাগরিকত্বের সমন্বয়সাধন করেন।

অপর একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ খ্রিষ্টান জায়নবাদী ছিলেন জোসেফ প্রিস্টলি। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ এবং রসায়নবিদ। প্রিস্টলি তাঁর রচিত চিঠি এবং A comparison of the installations of Moses বইয়ে ইসরাইলের মর্যাদা রক্ষার্থে জোর সাওয়াল করেন। এ ছাড়া

উইলিয়াম হুইস্টন ও বিশপ রবার্ট লথ ছিলেন ব্রিটিশ খ্রিষ্টান জায়নবাদী বুদ্ধিজীবী। যারা ব্রিটিশদের মধ্যে জায়নবাদ প্রচার ও প্রসারে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন।

এ সময় অর্থাৎ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ইংলিশ সাহিত্যিকদের মধ্যেও জায়নবাদী চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটে। তারা ইংলিশ সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্য দিয়ে জায়নবাদের প্রচার-প্রসার ঘটানো এবং ইয়াহুদিদের অধিকার আদায়ে জনমত গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ইংলিশ দিকপাল কবি ও সাহিত্যিকরা তাদের সাহিত্যশিল্পের মধ্য দিয়ে জায়নবাদী ধ্যানধারণার প্রচার-প্রসার ঘটাতে থাকেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলিশ সাহিত্যিকদের অন্যতম জর্জ গর্ডন বায়রন তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে জায়নবাদী চিন্তা-চেতনা প্রসারে বড় ভূমিকা রাখেন। তাঁর লিখিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'হিব্রু মেলোডিজ' (Hebrew Melodies) তাঁর জায়নবাদী চিন্তা-চেতনার অন্যতম প্রমাণ। তিনি এ বইটিকে আল-কুদসের (ইয়াহুদিদের কাছে The Holy Temple) প্রতি খিদমতস্বরূপ মনে করতেন। এ ছাড়া তাঁর রচিত নাটক 'কাইন জায়নবাদ' প্রচার-প্রসারের অন্যতম আরও একটি নিদর্শন।

এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অস্ট্রিয়-হাঙ্গেরিয়ান সাংবাদিক থিওডর হারজেল ইউরোপীয় ইয়াহুদি জায়নবাদী আন্দোলনে নতুন করে প্রাণসঞ্চার করেন। তিনিই মূলত প্রথম জায়নবাদী আন্দোলনের পূর্ণতা দান করেন। এ জন্য তাঁকে দ্য ফাদার অফ জায়নিজমও বলা হয়ে থাকে। তিনি ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদিরাষ্ট্র বানানোর জন্য কার্যকরী ভূমিকা নিতে শুরু করেন। থিওডর হারজেল সর্বদা একটি স্বাধীন ইয়াহুদি ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি মনে করতেন ইয়াহুদিবিদ্বেষ পরিপূর্ণরূপে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। তবে এটাকে একপ্রকার এড়িয়ে চলা সম্ভব, এটা তখন সম্ভব হবে যখন ইয়াহুদিরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে পারবে। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'ডের জুদেনস্টাট' নামে হারজেলের একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটিতে তিনি ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদিদের দেশ আখ্যায়িত করে ইয়াহুদিদের ইউরোপ ছেড়ে ফিলিস্তিনে হিজরত করার পরামর্শ দেন। তাঁর চিন্তাধারা তড়িচুম্বকের মতো ইয়াহুদিদের আকৃষ্ট করতে থাকে এবং বিভিন্ন ইয়াহুদি সংগঠন তাঁর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। এদের মধ্যে অন্যতম ইয়াহুদি সংগঠন ছিল হোভেভেই জিওন—ইসরাইল দেশের প্রেমিকরা। এটি কয়েকটি ইয়াহুদি সংগঠনের সমষ্টি যা ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াহুদা লেইব পিনস্কারের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়। এ সংঘ প্রতিষ্ঠার পেছনেও রয়েছে ইয়াহুদিবিদ্বেষ।

ইউরোপীয় দেশগুলোর মতো রাশিয়ায়ও ইয়াহুদিরা ছিল চরম নির্যাতিত। রাশিয়ার খ্রিষ্টানরা সেখানকার ইয়াহুদিদের এক নজরে দেখতে পারত না। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ বিদ্বেষ প্রকটরূপে দেখা দেয়। রাশিয়ায় ইয়াহুদিদের ব্যাপক গণহত্যা ও অত্যাচার শুরু হয়। ইয়াহুদিরা প্রাণভয়ে রাশিয়া থেকে পালিয়ে বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমায়। এ সময় খলিফাতুল মুসলিমিন মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে একটি বড় সংখ্যক নির্যাতিত ইয়াহুদিদের উসমানি খিলাফতের অভ্যন্তরে আশ্রয় দেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রকটভাবে দেখা দিলে ইয়াহুদিরা এর মোকাবেলা করতে হোভেভেই জিওন সংগঠনটির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। হোভেভেই জিওন সংগঠনটিকে আধুনিক জায়নবাদের অগ্রপথিক হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

থিওডর হারজেল তাঁর ইয়াহুদি রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান ও মুসলিম খলিফার কাছে সহায়তা প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদি রাষ্ট্র বানানোর লক্ষ্যে তিনি উসমানিদের দারস্থ হতেও পিছপা হননি। উসমানি সুলতানের কাছে তিনি ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদিদের জন্য ক্রয় করার প্রস্তাব দেন, কিন্তু ফিলিস্তিনের ভূমি মুসলিমদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। হিজাজের পর প্রথম কিবলার দেশ ফিলিস্তিন মুসলিমদের পবিত্রতম জায়গা। সে কারণে মুসলিম জাহানের খলিফা সুলতান আবদুল হামিদ খান এ পবিত্র জায়গা ক্রয়বিক্রয় অযোগ্য মনে করতেন। হারজেল ১৮৯৬ এবং ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে সুলতানের কাছে তাঁর প্রস্তাব রাখেন; কিন্তু সুলতান প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে হারজেল যখন ইসতাম্বুলে খলিফার কাছে যান, তখন খলিফা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাননি বিধায় তিনি একজন উসমানি কর্মকর্তার মাধ্যমে খলিফার কাছে সহায়তা প্রার্থনা করেন; কিন্তু খলিফা সরাসরি তাঁর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। হারজেল তাঁর দিনলিপিতে সুলতান আবদুল হামিদ খানের ঐতিহাসিক একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, যেখান থেকে উসমানিদের কাছে ফিলিস্তিনের ভূমি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা অনুমান করা যায়। হারজেল লিখেছেন,

> সন্ধ্যায় নিউলিনস্কি হতাশাগ্রস্ত মুখ ও দুঃসংবাদ নিয়ে ইলদিজ প্রাসাদ থেকে ফিরে এলেন। তিনি মাত্র অর্ধেক বোতল শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলেন এন সাইন ডে ডুইল (শোকের চিহ্ন হিসেবে) এবং আমাকে দুটি বাক্যে বললেন, 'কিছুই হচ্ছে না। মহান লর্ড এটা শুনবেনই না!' আমি মনেপ্রাণে আহত হলাম।
>
> (এরপর তিনি বললেন যে) সুলতান বললেন, মিস্টার হারজেল যদি আপনার ততটুকু বন্ধু হন, যতটুকু আপনি আমার, তাহলে তাঁকে এ বিষয়ে আর কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার পরামর্শ দিন। আমি (ফিলিস্তিনের) এক ফুট জমিনও বিক্রি করতে পারব না কারণ, এটা

> আমার (সম্পত্তি) নয়, এটা আমার জনগণের (সম্পত্তি)। আমার জনগণ এ সাম্রাজ্যকে তাদের রক্ত দিয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় করেছে এবং তাদের রক্ত দিয়ে এটিকে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা এটিকে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার আগে আবার এটিকে আমাদের রক্ত দিয়ে মুড়ে দেব... আমি এর (এ জমিনের) কোনো অংশ বিক্রি করতে পারি না। ইয়াহুদিরা তাদের বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা বাঁচিয়ে নিক (অর্থাৎ, আমাদের বিলিয়ন বিলিয়ন টাকার দরকার নেই)।[৯৪]

উসমানিদের থেকে আশাহত হওয়ার পর তিনি ব্রিটিশদের দারস্থ হলে ব্রিটিশরা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য হারজেল ও তাঁর জায়নবাদী আন্দোলন লুফে নিল। তারা জায়নবাদীদের মধ্যে তাদের মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনার সফলতা লক্ষ্য করল। ইতিমধ্যে (১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে) থিওডর হারজেলের মৃত্যু ঘটে; কিন্তু থিওডরের মৃত্যু জায়নবাদী আন্দোলনে ভাঁটা সৃষ্টি করল না। তা দিনদিন বিকশিত হতে থাকল।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ফিলিস্তিন যুদ্ধের পর ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি উসমানি খিলাফতের হাতছাড়া হয়। জামাল পাশার নেতৃতাধীন উসমানিবাহিনী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও ফিলিস্তিনভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ ও ফরাসি জোট হুসাইন ইবনু আলি নামক হাশিমি গোত্রের আরবি শরিকে সঙ্গে নিয়ে উসমানিদের ফিলিস্তিন থেকে হঠিয়ে ফেলার পর ব্রিটিশরা ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনে ওয়েটা (Occupied Enemy Territory Organization) শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

ইতিপূর্বে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ম্যাকমাহন উসমানিদের বিরুদ্ধে তাদের বিজয় নিশ্চিত করতে এবং আরবিদের বাগে পেতে একটি ধুরন্ধর পরিকল্পনা করেন। আরব মক্কার আমির হুসাইন ইবনু আলির সঙ্গে তিনি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ব্রিটিশরা হুসাইনকে আরবের রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখায় এবং জাতীয়তাবাদী আরবদের স্বপ্ন দেখায় একটি স্বাধীন সার্বভৌম ঐক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্রের।

এভাবে তারা উসমানিদের বিরুদ্ধে আরবদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়। হুসাইনকে ব্রিটিশদের পক্ষে আনার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেন, দ্য লরেন্স অফ আরবিয়া নামে খ্যাত ব্রিটিশ কর্ণেল থমাস এডওয়ার্ড লরেন্স। ব্রিটিশদের প্রলোভনে ধোঁকা খেয়ে হুসাইনসহ একটি বড় সংখ্যক আরববাহিনী উসমানিদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষে ফিলিস্তিনের যুদ্ধে যোগদান করে। কিন্তু উসমানিরা যখন ফিলিস্তিন থেকে সরে গেল এবং ব্রিটিশরা যখন দেখল, তাদের স্বার্থসিদ্ধি সম্পন্ন তখন তারা ছলেবলে আরবদের ধোঁকা দিয়ে দিল। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২ নভেম্বর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বালফোর জায়নবাদী নেতা রথচাইল্ডকে একটি পত্র লেখেন। যাতে তিনি ফিলিস্তিনে ইয়াহুদিদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সমর্থন জানান। এ সিদ্ধান্তটি ইতিহাসে বালফোর ঘোষণাপত্র বা The Balfour Declaration নামে খ্যাত।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের বালফোর ঘোষণাপত্র মক্কার বিদ্রোহী হুসাইনের সকল আশায় পানি ঢেলে দিল। উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের সহায়তা করলেও ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদিদের হাতে তুলে দেওয়া তিনি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারলেন না। ফলে হুসাইন ব্রিটিশদের বিরোধী হতে শুরু করলেন। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ভার্সাই চুক্তিপত্রে তিনি ব্রিটিশদের পক্ষে স্বাক্ষর প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশরা যখন ফিলিস্তিনের ওপর তাদের ম্যান্ডেট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছিল, তখন তারা হুসাইনকে এ শাসন মেনে নেওয়ার অনুরোধ করে। হুসাইন ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদিদের হাতে তুলে দেওয়ার ঘোরবিরোধীতা করে এ চুক্তিতে অসম্মতি জানান। ফলে ব্রিটিশরা যখন দেখল, হুসাইন তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করছেন তখন তারা পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাদের একান্ত অনুগত অপর আরবি শাসক ইবনু সৌদকে মক্কার হাশিমি শাসন উৎখাতে সহায়তা দেয়। ইতিমধ্যে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইবনু সৌদ ব্রিটিশদের সঙ্গে দারিন চুক্তি সাক্ষর করে তাদের একান্ত ভৃত্যে পরিণত হয়েছেন। ফিলিস্তিন নিয়ে ইবনু সৌদের কোনোপ্রকার মাথাব্যথা ছিল না। তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন সমগ্র হিজাজ ও নজদের রাজা হওয়ার। এ জন্য ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদিদের হাতে উপহারস্বরূপ তুলে দিতেও তিনি দ্বিধা করেননি। ব্রিটিশরা যখন ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদিদের হাতে তুলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখছিল, তখন ব্রিটিশদের সাহায্যদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তিনি। শুরু হয় ফিলিস্তিনকে নিলামে তোলার খেলা।

এদিকে ব্রিটিশরা তাদের স্বাধীন আরব রাষ্ট্রের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করায় আরবি জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশদের ওপর মনোক্ষুন্ন হয়। ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদিদের ভূমি হিসেবে ঘোষণা করায় আরবরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফিলিস্তিনের বিষয়ে কোনোপ্রকার আপসে যেতে তারা রাজি ছিল না। ১৯২০, ১৯২১ ও ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনি আরবদের সঙ্গে জায়নবাদী ইয়াহুদিদের বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট জেরুজালেমের হায়িতুল বুরাক (Wailing Wall)-এর ওপর বাতার যুব আন্দোলন নামক একটি জায়নবাদী সংগঠন তাদের পতাকা উত্থাপন করে। ইয়াহুদিদের ধৃষ্টতায় আরবরা চরম বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ফিলিস্তিনজুড়ে ইয়াহুদিদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। আক্রমণ

৯৪. The Complete Diaries of Theodor Herzl : 378

চলাকালীন কেবল হেবরন নামক অঞ্চলে ৬৪ জন ইয়াহুদির প্রাণনাশ হয়। তবে আরবিরা যখন ফিলিস্তিনের ইয়াহুদিদের ওপর আক্রমণ শুরু করে, তখন প্রতিবেশী মুসলিমরা ইয়াহুদিদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। গবেষক জোয়েল বেনিন এবং লিসা হাজ্জার উল্লেখ করেন, 'সংঘর্ষ চলাকালীন হেবরনের মুসলিমরা ইয়াহুদি প্রতিবেশীদের আশ্রয় দিয়ে তাদের প্রাণরক্ষা করেছিলেন। প্রায় একসপ্তাহ ধরে চলা এ দাঙ্গাতে ১১৫ জন আরব ও ১৩৩ জন ইয়াহুদি নিহত হয়।'[৯৫]

ফিলিস্তিনি আরব ও ইয়াহুদিবাদীদের মধ্যে বড় ধরনের সমস্যার সূত্রপাত ঘটে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে যখন জার্মানির নাৎসি নেতা এডলফ হিটলার মসনদে বসেন। হিটলার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর ইউরোপীয় ইয়াহুদিদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার ও গণহত্যা শুরু করেন। তিনি ইয়াহুদিদের জগতের উচ্ছিষ্ট মনে করতেন, যাদের পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। ফলে ব্যাপক সংখ্যক ইয়াহুদি হিটলারের হাত থেকে রক্ষা পেতে পালিয়ে ফিলিস্তিন চলে আসে এবং সেখানে বসতি গেড়ে বসে। কেবল ১৯৩৩-৩৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় একলক্ষ তেষট্টি হাজার ইয়াহুদি পালিয়ে আসে। বিপুল সংখ্যক ইয়াহুদি আগমনের ফলে আরবরা জায়নবাদীদের কর্তৃক নতুন ইয়াহুদি জায়নবাদী রাষ্ট্রের উত্থান ও ফিলিস্তিন দখলের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কারণ, তারা ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্যক অবগত। তারা ভয়ে ছিল যে, ব্রিটিশরা একদিন তাদের মাতৃভূমিকে একটি বহিরাগত জাতির হাতে তুলে দেবে। ফলে তারা হয়ে পড়বে গৃহহীন ও বাস্তুহারা। তাই ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে আরবরা ফিলিস্তিনে ইয়াহুদিদের অতিরিক্ত বসতি স্থাপনের বিরোধিতা করতে শুরু করে।

১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল আল-কুদসের মুফতি মুহাম্মাদ আমিন আল-হুসাইনি আল-হানাফি রাহ.-এর নেতৃত্বে আরবরা আল-লাজনাতুল আরবিয়াতুল উলয়া বা Arab Higher Committee প্রতিষ্ঠা করে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিনের জমিতে অতিরিক্ত ইয়াহুদি যাতে বসতি গেড়ে না বসতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা, আরবরা যাতে জায়নবাদীদের কাছে আর জমি না বিক্রি করে সেটা নিশ্চিত করা এবং ফিলিস্তিনের ওপর থেকে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট বাতিল করে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করা। এসব দাবি-দাওয়া নিয়ে আল-লাজনাতুল আরবিয়াতুল উলয়া ব্যাপক আন্দোলন ও ধর্মঘট শুরু করে। প্রথমদিকে এ আন্দোলন সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ব্রিটিশরা আরবদের ভয়ে ১১ হাজার ইয়াহুদি থেকে কেবল ৪ হাজার পাঁচশ জনের ভিসার অনুমোদন দেয়। এ ঘটনা থেকে ব্রিটিশদের মধ্যে যে আরব আন্দোলন ভীতি সঞ্চার করেছিল, তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এদিকে ফিলিস্তিনে আরবরা ইয়াহুদিদের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করলে ইয়াহুদিরা আর্থিক সংকটে পড়ে। আরবদের ধর্মঘট ও জায়নবাদীদের উস্কানি ধীরে ধীরে গেরিলা যুদ্ধের রূপ ধারণ করে। ফিলিস্তিন হয়ে ওঠে আরব ও ইয়াহুদি জায়নবাদীদের রঙ্গভূমি। এমনি এক স্পর্শকাতর মূহুর্তে ব্রিটিশ ও জায়নবাদীদের সমর্থনে অবতীর্ণ হন ওয়াহাবিরাজ ইবনু সৌদ। ফিলিস্তিনের মধ্যে একটি স্বাধীন ইয়াহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি তৎপরতা শুরু করেন।

১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি ইবনু সৌদ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটির মূল বিষয়বস্তু ছিল সৌদ রাজের ফিলিস্তিন বিষয়ে নাক গলানোর মূল উদ্দেশ্য। ইবনু সৌদ তাঁর উক্ত চিঠিতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন,

> আমরা ব্রিটিশ হুকুমতকে অবগত করতে চাই যে, ফিলিস্তিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছি কেবল আমাদের সঙ্গে ব্রিটিশদের বন্ধুত্বের কারণে এবং সমগ্র আরব ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে শান্তি ও পারস্পরিক সহায়তার পরিবেশ তৈরির—আমাদের আকাঙ্ক্ষার জন্য।[৯৬]

এদিকে ফিলিস্তিনে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ ও তৎপরবর্তী সময়গুলোতে আরব ও জায়নবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে। আরবরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আমিন আল-হুসাইনের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে ব্যাপক গণধর্মঘট শুরু হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকার ও জায়নবাদীরা পশ্চাৎপসরণ করতে শুরু করে। ব্রিটিশরা দেখল যে, আরবদের সরিয়ে পুরো ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদিদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা ফিলিস্তিন বিভাগনীতি গ্রহণ করে। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুলাই রবার্ট ওয়েলেসলি পিলের নেতৃত্বে পিল কমিশনের রিপোর্ট নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এ রিপোর্টে ফিলিস্তিনে চলমান অশান্তি থামাতে ফিলিস্তিনকে দ্বিখন্ডিত করে একটি ইয়াহুদি রাষ্ট্র ও একটি আরব রাষ্ট্র তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়; কিন্তু আরবরা কোনোমতেই তাদের জন্মভূমির এক ইঞ্চিও বহিরাগতদের হাতে তুলে দিতে রাজি ছিল না। আরবরা পিল কমিশনের ঘোর বিরোধিতা শুরু করে। তারা তাদের ধর্মঘটের ধারা জারি রাখে।

---

৯৫. Palestine, Israel and the Arab-Israel Conflict

৯৬. বারিতনিয়া ওয়া ইবনু সয়ুদ : ৭৭; শিবহুল জাজিরা ফি আহদিল মালিক আবদুল আজিজ : ১০৮১

এ সময় আরবদের বিরোধিতার মুখে ব্রিটিশরা ইবনু সৌদের দারস্থ হয়। বন্ধুবর বৃটেনের বিপদ লক্ষ্য করে ইবনু সৌদ আরব বিপ্লব থামাতে ব্রিটিশদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। ইবনু সৌদ তাঁর প্রভু ব্রিটিশদের বিরোধী কোনোপ্রকার তৎপরতা বরদাস্ত করতেন না। ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ আলি, ইবনু সৌদের এ বিষয়টি কৌতুকচ্ছলে তাঁর বইয়ে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ইবনু সৌদ যেকোনো পরিস্থিতিতে যেকোনো বিপ্লব দমনে এগিয়ে আসতেন হোক সেটা ইসলামি বা দেশাত্মবোধক, শর্ত হলো সেই আন্দোলন পশ্চিমাবিরোধী হতে হবে।'[৯৭]

আরব বিপ্লব ও জায়নবাদবিরোধী ধর্মঘট ও সামরিক তৎপরতা স্তব্ধ করে দিতে ব্রিটিশদের হয়ে ইবনু সৌদ ফিলিস্তিনের বিপ্লবী আমিনকে একটি চিঠি পাঠান। তিনি ফিলিস্তিনিদেরকে ব্রিটিশদের নেক নিয়তের ওপর আস্থা রেখে, বিপ্লব বন্ধ রেখে ব্রিটিশদের সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান। চিঠিতে তিনি লেখেন,

> আমরা তোমাদের আল্লাহর ওপর, আমাদের বন্ধু ব্রিটেনের নেক নিয়ত ও তাদের ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট ইচ্ছার প্রতি আস্থা রেখে শান্তি স্থাপন এবং রক্তপাত থেকে নিবৃত হতে ধর্মঘট বন্ধ করার দিকে আহ্বান করছি।[৯৮]

ফিলিস্তিনের বিপ্লবী গাসসান কানাফানি তাঁর বইয়ে চিঠিটির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে সেখানে কিছু শব্দে পার্থক্য রয়েছে। তিনি লিখেছেন,

> King Abdul Aziz Al Sa'ud and King Ghazi wrote letters to Hajj Amin al-Hussaini saying: "In view of our confidence in the good intentions of the British government to do justice to the Arabs, it is our opinion that your interest requires that you should meet the Royal Commission.[৯৯]

এ সময় আরব বিপ্লবীরা আর্থিক সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। তার ওপর ইবনু সৌদের চিঠি পেয়ে একদিকে ব্রিটিশদের চাপ অপরদিকে আরবি রাজবংশগুলোর বিরোধিতা তাদের সিদ্ধান্ত বদলে বাধ্য করল। অগত্যা আরবরা ধর্মঘট বন্ধ করে ব্রিটিশদের সঙ্গে পরামর্শে রাজি হয়। এভাবে ১৯৩৬-৩৯-এর বিপ্লব যা জায়নবাদীদের সমাধিস্থ করতে চলেছিল, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

এদিকে ব্রিটিশ ও আলে সৌদরা ফিলিস্তিন বিক্রির গোপন কর্মতৎপরতা জারি রেখেছিল। ইবনু সৌদের জায়নবাদী পরামর্শদাতা জন ফিলবি ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনে অবস্থিত অ্যাথেনিউম ক্লাবে ইয়াহুদি নেতাদের সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে তিনি বিশিষ্ট জায়নবাদী নেতা চেম উইজম্যান (যিনি পরবর্তীতে ১৯৪৯-১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইসরাইলের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন) ও ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইতিহাসের অধ্যাপক লুইস নেমিয়ারের সঙ্গে একটি মধ্যাহ্নভোজ চলাকালীন তাদের সম্মুখে ইসরাইল নিয়ে কিছু প্রস্তাব সমন্বিত খসড়া পেশ করেন।

এ পরিকল্পনাটি তিনি ব্রিটেন ও আমেরিকা সরকারের পক্ষ থেকে ইবনু সৌদের সামনে পেশ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ফিলবি তাঁর 'Arabian Jubilee' বইয়ে এ বিষয়ে বিষদ আলোচনা করেছেন। ফিলবির এ খসড়া অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয়, সমগ্র ফিলিস্তিন ইয়াহুদিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং ফিলিস্তিনে বসবাসরত আরবদের ফিলিস্তিন থেকে উচ্ছেদ করে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হবে। বিনিময়ে ব্রিটেন ইবনু সৌদকে ২০ মিলিয়ন ইউরো আদায় করবে।

ফিলবি এ প্রস্তাবের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

> সমগ্র ফিলিস্তিন ইয়াহুদিদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। সেখান থেকে বাস্তুচ্যুত সমস্ত আরবকে ইয়াহুদিদের খরচে অন্যত্র পুনর্বাসিত করতে হবে, এ উদ্দেশ্যে বাদশাহ ইবনু সৌদের এ বিষয়টি নিষ্পত্তিতে (ব্রিটেন) ২০ মিলিয়ন পাউন্ড দেবে। শুধু 'আদন' বাদ দিয়ে অন্যান্য আরব দেশগুলোকে যথাযথ অর্থে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।[১০০]

পরবর্তী বছর অর্থাৎ, ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারি জন ফিলবি তাঁর সে ঐতিহাসিক প্রতারণামূলক প্রস্তাবটি ইবনু সৌদের সম্মুখে পেশ করেন।

---

৯৭. বারিতানিয়া ওয়া ইবনু সৌদ : ৮৪

৯৮. তারিখু আলে সৌদ : ৮৬৮; বারিতানিয়া ওয়া ইবনু সৌদ : ৮৩; H. St. John Philby, Ibn Saud and Palestine : ৪৭

৯৯. The 1936-39 Revolt in Palestine : 46

১০০. Arabian Jubilee : 212-213

আরবের 'খাদিমুল হারামাইন' উপাধিধারী ওয়াহাবিরাজ ইবনু সৌদ যখন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানলেন, তখন তাঁর উচিত ছিল চুক্তিটি প্রত্যখ্যান করা; কিন্তু ব্রিটিশদের একান্ত অনুগত ভৃত্য হিসেবে তিনি প্রভু ব্রিটেনের পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করলেন। তিনি জন ফিলবির এ ধরনের ন্যাক্কারজনক প্রস্তাবেও সম্মতি প্রকাশ করলেন। জন ফিলবি ইবনু সৌদের সম্মতির বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন,

> বাদশাহ তাঁকে বললেন যে, ভবিষ্যতে যথাযথ পরিস্থিতিতে কোনো বন্দোবস্ত করা সম্ভব, তিনি বিষয়টি মাথায় রাখবেন এবং যথাযথ সময়ে তিনি আমায় যথাযথ জবাবটি দেবেন। এবং এ সময়ে আমি যেন বিশেষ করে কোনো আরবের কাছে এ বিষয়টি সম্পর্কে একটি টু শব্দও না করি। পরিশেষে প্রস্তাবগুলো যদি মানুষের চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে তাঁর অনুমোদনের কোনো উল্লেখ থাকে তাহলে, যাইহোক না কেন তিনি আমার ইখতিয়ার বাতিল করতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করবেন না।[১০১]

ইতিহাসবিদ নাসির সায়িদ জন ফিলবির বই থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে লেখা ইবনু সৌদের একটি চিঠি নকল করেছেন। উক্ত চিঠি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইবনু সৌদের কাছে ফিলিস্তিন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা মুখ্য বিষয় ছিল না। তাঁর কাছে মুখ্য বিষয় ছিল, ব্রিটিশদের সন্তুষ্টি। উক্ত চিঠিতে ইবনু সৌদ ব্রিটিশদের প্রস্তাবের জবাবে বলেন,

> আমার কাছে ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদি মিসকিনদের দিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। [১০২]

এভাবে একজন মুসলিম শাসক ও পবিত্র হিজাজের ইমাম উপাধি ধারণ করার পরেও কেবল ব্রিটিশদের তুষ্ট করার জন্য ইবনু সৌদ সকলপ্রকার সততা বিসর্জন দিয়ে ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদিদের কাছে বিক্রয় করে দিলেন, সেই সঙ্গে প্রতারণা করলেন শত-হাজার ফিলিস্তিনির পবিত্র রক্তের সঙ্গে।

ইবনু সৌদ ফিলিস্তিনে ১৯৩৬-৩৯ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবকে ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হলেন না। পরবর্তীতে ইসরাইলকে নানান ভাবে সহায়তা করে গেছেন তিনি। ফিলিস্তিন নিয়ে আলে সৌদদের প্রতারণা গোপন ছিল না ফিলিস্তিনিদের কাছে। একের পর এক ধোঁকাবাজি ও ষঠতাপূর্ণ আচরণের কারণে আলে সৌদ ও ওয়াহাবিদের মুখোশ খুলে পড়ে ফিলিস্তিনিদের কাছে। সৌদি-ইসরাইল সম্পর্ক হয়ে উঠে একটি ওপেন সিক্রেট বিষয়। ইবনু সৌদ ও ওয়াহাবিদের সকলপ্রকার মুনাফিকি দুই মলাটের মধ্যে সংরক্ষিত করে গেছেন ফিলিস্তিনের বিপ্লবী থেকে শুরু করে কবি ও সাহিত্যিকরাও।

ফিলিস্তিনের বিখ্যাত বিপ্লবী ও সাহিত্যিক গাসসান কানাফানি (১৯৩৬-১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর বই, প্রবন্ধ ও নিবন্ধে ফিলিস্তিন নিয়ে আলে সৌদের প্রতারণা সবিষদে লিপিবদ্ধ করেছেন। কানাফানি ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক আক্কা বা আকরা অঞ্চলে একটি সুন্নি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য ফিলিস্তিনিদের মতো তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা পুরুষ। শৈশব থেকেই পরাধীনতার জিঞ্জির ভেঙে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। যৌবনে পদার্পণ করার পর তিনি জায়নবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, যোগ দেন বিপ্লবী সংগঠন আল-জাবহাতুশ শাবিয়াতু লিতাহরিরি ফিলিস্তিন নামক সংগঠনে। পরবর্তীতে ইয়াহুদিবাদীরা যখন দেখল তিনি জনগণের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছেন, তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুলাই ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ তাঁকে হত্যা করে।

গাসসান কানাফানি ফিলিস্তিন নিয়ে ওয়াহাবিদের ষঠতাপূর্ণ আচরণের কথা তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। তিনি ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ফিলিস্তিনি বিপ্লব ধ্বংসে আরবি রাজবংশগুলির নিফাক তুলে ধরেছেন এবং আরবদের প্রতারণার বিষয়ে লিখেছেন,

> ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনকে ঘিরে থাকা আরব দেশগুলি দুটি পরস্পরবিরোধী ভূমিকা পালন করছিল। একদিকে, প্যান-আরব গণ-আন্দোলন ফিলিস্তিনি জনগণের বিপ্লবী চেতনার জন্য একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করছিল, যেহেতু ফিলিস্তিনি এবং সামগ্রিক আরব সংগ্রামের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে, এ আরব দেশগুলিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারগুলি ফিলিস্তিনি গণ-আন্দোলন দমন ও দুর্বল করার জন্য তাদের শক্তিতে থাকা সবকিছুই করছিল।[১০৩]

---

১০১. H. St. John Philby. Note on interview with Colonel Hoskins, November Il, 1943. Philby Papers, St. Anthony's College, Oxford, (Hereafter listed as 'Note on Hoskins'); H. St. John Philby, Ibn Saud and Palestine : 83

১০২. তারিখু আলে সৌদ : ৯৫১

১০৩. The 1936-39 Revolt in Palestine by Ghassan Kanafani : 11

১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে গাসসান লেবাননের বৈরুত থেকে আল-হাদাফ নামে একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন চালু করেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জুলাই এ ম্যগাজিনের ১ম ভলিউমের ৫০তম সংখ্যার ৮ ও ৯ নম্বর পৃষ্ঠায় النفط السعودي يتدفق عبر اسرائيل শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাতে সৌদি-ইসরাইলের মধ্যকার সম্পর্ক ও ফিলিস্তিন নিয়ে তাদের খিয়ানত প্রভৃতি বিষয়ে হাড় হিম করা তথ্য তুলে ধরা হয়। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসের ১৫ তারিখে একই ম্যগাজিনের দ্বিতীয় ভলিউমের ৫৫তম সংখ্যায় الخيانة العظمي النظام السعودي নামে আরও একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে সৌদি-ইসরাইলের গোপন বানিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়। একই বছর জানুয়ারি মাসের ১০ তারিখে ওই ম্যগাজিনের ৬-৭ পৃষ্ঠায় গাসসান কানাফানির লেখা একটি বিস্ফোরক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল الحلف السري بين السعودية و اسرائيل বা সৌদি ও ইসরাইলের মধ্যে গোপন মৈত্রী। এ প্রবন্ধে সৌদি-ইসরাইলের গোপন সম্পর্ক এবং আরব উপদ্বীপকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করার উদ্দেশ্যে সৌদি ও ইরানের নাস্তিক শাহদের মধ্যে চুক্তিসহ বিভিন্ন গোপন ষড়যন্ত্রের তথ্য তিনি তুলে ধরেন।

ফিলিস্তিনের বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে একজন হলেন, বিপ্লবী কবি আবদুর রাহিম মাহমুদ। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে উসমানি খিলাফতের অধীনস্থ ফিলিস্তিনের আনাবতা শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিটিশরা যখন প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে উসমানিদের হঠিয়ে ফিলিস্তিন জবরদখল করল এবং ইয়াহুদিবাদীদের হাতে ফিলিস্তিনকে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করল, তখন এ তরুণ তুর্কি কবি ব্রিটিশ ও জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে এ ক্ষণজন্মা কবি শাজারার যুদ্ধে নিহত হন। আলে সৌদ ও ব্রিটিশদের সম্পর্ক এবং ফিলিস্তিনের সঙ্গে সৌদদের মুনাফিকি আবদুর রাহিমের কাছে গোপন ছিল না। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ইবনু সৌদের ছেলে বাদশাহ ফায়সাল ইবনু আবদুল আজিজ ও ইবনু সৌদের পরামর্শদাতা জন ফিলবি আল-কুদস সফরে এলে তিনি তাদের সামনেই আফসোস করে একটি কাব্য রচনা করেন। সে কাব্যটি নাজমুস সৌদ নামে খ্যাত। কবি কবিতাটির মধ্যে সৌদদের আচরণে আক্ষেপ করে বলেন,

يا ذا الأَميرِ أَمامَ عَينِكَ شاعِرٌ ضُمَّت عَلى الشَكوى المَريرَةِ أَضلُعُهْ
المَسجِدُ الأَقصى أجئتَ تَزورُهُ أَم جِئتَ مِن قَبلِ الضَياعِ تُوَدِّعُهْ
حَرمٌ تُباحُ لِكُلِّ أَوكعَ آبِقٍ وَلِكُلِّ أَفّاقٍ شَريدٍ أربُعُهْ
وَالطاعِنونَ وَبورِكَت جَنباتُهُ أَبناؤُهُ الظِئَم بِطَعنٍ يوجِعُهْ
وَغَداً وَما أَدناهُ لا يَبقى سِوى دَمعٍ لَنا يَهمي وَسِنٌّ نَقرَعُهْ
وَيُقرِّبُ الأَمرَ العَصيبَ أسافلٌ عَجِلوا عَلَينا بِالَّذي نَتَوَقَّعُهْ

তাঁর দিওয়ানে আজও কাব্যটি সংরক্ষিত আছে। ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য এবং আরবের বুকে ইয়াহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ওয়াহাবিরাজ ইবনু সৌদের সমর্থন ইত্যাদির কারণে ব্রিটিশরা ইবনু সৌদের ওপর পরিপূর্ণ আস্থাবান হয়ে পড়ে। মধ্যপ্রাচ্যে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারে ইবনু সৌদ যে অবদান রেখেছেন, তার প্রতিদান ব্রিটিশরা ইবনু সৌদকে দিয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশরা আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য ইবনু সৌদের মতোই একজন অনুগত ভৃত্যের অনুসন্ধান করছিল। তাই তারা ইবনু সৌদকে আরববিশ্বের বসের বস বানানোর সিদ্ধান্ত নিল। খোদ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের কথায় এর প্রমাণ মেলে।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চ চার্চিল ইসরাইলের রাষ্ট্রপতি এবং তদানীন্তন একজন কট্টর জায়নবাদী সক্রিয় কর্মী ড. চেম উইজম্যানের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে বলেন,

> আমি চাই আপনি এটা জেনে রাখুন যে, আমার একটি পরিকল্পনা রয়েছে যেটা অবশ্য যুদ্ধের পর মঞ্চস্থ করা যেতে পারে। আমি দেখতে চাই ইবনে সৌদকে মধ্যপ্রাচ্যের প্রভু বসের বস বানানো হয়েছে।[১০৪]

এভাবে ফিলিস্তিনকে ইসরাইলের হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেওয়ার পর ব্রিটিশদের সহায়তায় আরবের মোড়ল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ওয়াহাবি ইমাম ইবনু সৌদ। ব্রিটিশ ও পশ্চিমের সহায়তায় মুসলিমদের প্রাণকেন্দ্র হিজাজ ও নজদের সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি তাঁর প্রভুদের হয়ে মুসলিম উম্মাহর ওপর ছড়ি ঘোরাতে শুরু করলেন। তাঁর সিংহাসনারোহণের মাধ্যমে শুরু হলো আহদু ইনহিতাতিল মুসলিমিন বা মুসলিমদের পতনের যুগ। শুরু হলো, মদিনা শরিফের পতন ও জেরুজালেমের উত্থানের যুগ।

১০৪. H. St. John Philby Ibn Saud and Palestine by Jerald L. Thompson : 98

দ্বিতীয় পর্ব

www.muslimdm.com

প্রথম অধ্যায়

খারিজিদের পরিচয় এবং ওয়াহাবি ও খারিজিদের মধ্যে সাযুজ্য

দ্বিতীয় পর্বে আমরা আলোচনা করতে চলেছি মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি প্রবর্তিত নজদি মতাদর্শের ধর্মতত্ত্বগত ত্রুটি ও তাদের মতাদর্শের সঙ্গে আল্লাহর দীন ইসলামের বিবিধ বিরোধ ও ফারাক নিয়ে। এ পর্বে আমরা ওয়াহাবি মতাদর্শের বিকৃতি ও উম্মতে মুহাম্মাদির ওপর তা কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেগুলো সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করব এবং এ মতাদর্শের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের

অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ওয়াহাবি মতাদর্শকে আহলুস সুন্নাতের আইম্মায়ে কিরামরা কখনো সুনজরে দেখেননি। তাদের উগ্রতা, হত্যাকাণ্ড, অবৈধ তাকফির ও ইসলামি খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রভৃতি অবলোকন করে আহলুস সুন্নাতের ইমামরা এ সম্প্রদায়কে খাওয়ারিজ সম্প্রদায় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ জন্য ওয়াহাবিদের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে বিশ্লেষণের আগে আমরা জানব খারিজি সম্প্রদায় কারা, তাদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং তাদের সঙ্গে ওয়াহাবিদের সম্পর্ক নিয়ে।

খারিজি কারা? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ইসলামের প্রথম যুগে। প্রিয়নবি সাঃ-এর ইনতিকালের পর শায়খাইন বা প্রথম দুই খলিফা—আবু বকর সিদ্দিক ও উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যুগ পর্যন্ত উম্মতে মুসলিমা অন্তর্বর্তী বড় বড় ফিতনা-ফাসাদ থেকে মুক্ত ছিল। হাদিসে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর সময়কাল পর্যন্ত এ উম্মত ফাসাদমুক্ত থাকার বিষয়টি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাঃ। যেমন : এক রিওয়ায়াতে উমর রা.-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে 'তোমার ও তার (ফিতনার) মধ্যে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে।'[১০৫]

খলিফাতুল মুসলিমিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর ইনতিকালের পর উসমান রা.-এর যুগ থেকে মুসলিমদের ওপর বড় বড় ফিতনা আপতিত হতে শুরু করল, যা মুসলিমদের লৌহবৎ ঐক্যের প্রাচীরে ফাটল তৈরি করল। এসব ফিতনার মধ্যে একটি অন্যতম ফিতনা ছিল খারিজিদের ফিতনা। যে ফিতনা ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই মুসলিমদের বড় বড় ক্ষতিসাধন করে এসেছে। মলিন করে দিয়েছে বহু সুসমৃদ্ধ ইসলামি সাম্রাজ্যের ইমারত। ইতিহাসবিদদের মতে, উম্মতে মুসলিমার মধ্যে প্রথম যে ফিতনা সংঘটিত হয়েছিল তা হলো খারিজি ফিতনা।

খারিজি কারা

খাওয়ারিজ আরবি শব্দ খারিজের বহুবচন। শব্দটির বুৎপত্তি খুরুজ থেকে। খুরুজের শাব্দিক অর্থ—বেরিয়ে যাওয়া। আর যে বেরিয়ে যায় তাকে বলা হয় খারিজ। খারিজিদের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত আরবি ভাষাতত্ত্ববিদ ইমাম আবুল হাসান আলি আল-হুনায়ি রাহ. খারিজি শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুলতান ও জামাআতের সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করে তাকে খারিজি বলা হয়।'[১০৬] অর্থাৎ, যে বা যারা বায়আতবদ্ধ মুসলিম জামাআত থেকে বেরিয়ে সুলতান বা জামাআতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, সে বা তারা হলো খারিজি।

শরিয়তের পরিভাষায় খারিজির সংজ্ঞায়নে একাধিক মত লক্ষ্য করা যায়। আহলুস সুন্নাতের ইমামরা খারিজির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত প্রদান করেছেন। ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. খারিজিদের বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তাদের এ নামে নামকরণের কারণ হলো তাদের দীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং মুসলিমদের শ্রেষ্ঠাংশের বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্রধারণ।'[১০৭] ইমাম নববি রাহ. খারিজির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের কারণে তাদের খারিজি বলা হয়, এটাও বলা হয় যে, (তাদের খারিজি নামকরণের কারণ হলো) তাদের আহলুস সুন্নাতের মত-পথ থেকে বেরিয়ে যাওয়া।'[১০৮]

ইমাম আবুল ফাতাহ আশ-শাহরিস্তানি রাহ. খারিজি সম্প্রদায়ের বিষয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, 'যে ব্যক্তি ওই হকপন্থি ইমামের (শাসকের) বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে যার (শাসনের বিষয়ে) আহলুস সুন্নাহ একমত তাকে খারিজি বলা হয়, হোক সেটা সাহাবিদের যুগে, আইম্মায়ে রাশিদা (চার

১০৫. সহিহ বুখারি

১০৬. المنجد الابجدي

১০৭. ফাতহুল বারি : ১২/২৮২

১০৮. আল-মানহাজ ফি শারহি মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : ৭/১৬৪

www.muslimdn.com

খলিফার) বিরুদ্ধে বা তাদের পরবর্তী সময়ে তাবিয়িনদের বিরুদ্ধে অথবা প্রত্যেক যুগের ইমামদের বিরুদ্ধে।[১০৯]

এক কথায় শরিয়তের পরিভাষায় খারিজি বা খাওয়ারিজ বলা হয়, ওই সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে যারা তাদের বিকৃত আকিদা ও বিশ্বাসের কারণে খলিফা অথবা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে থাকে বা বিদ্রোহ করে। তারা তাদের বিকৃত মতাদর্শ ও উসুলের ওপর ভিত্তি করে অপর মুসলিমকে কাফির তকমা দিয়ে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। খারিজি নামটি যেমন আগের খায়রুল কুরুনের পথভ্রষ্ট খারিজি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি প্রত্যেক এমন ব্যক্তি বা দলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যে বা যারা তাদের নীতি গ্রহণ করে এবং তাদের মত-পথ অনুসরণ করে থাকে।

কেউ কেউ মনে করেন, খারিজি বলতে আলি রা.-এর সমসাময়িক যে বিদ্রোহী দলের উদ্ভব ঘটেছিল কেবল তাদেরই বোঝায়; কিন্তু এটা সঠিক ব্যাখ্যা নয়। খারিজিরা কোনো নির্দিষ্ট যুগ বা জামানা অথবা স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। এর দলিল হলো রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর হাদিস। রাসুল সাঃ বলেছেন, يخرجون علي حين فرقة من الناس।[১১০] অপর একটি রিওয়ায়াত অনুসারে যুগের পর যুগ ধরে খারিজিরা বের হতে থাকবে, এমনকি তাদের শেষ দলের মধ্য থেকে দাজ্জালের প্রকাশ ঘটবে। বর্ণনাটি হলো,

> عن عبد الله بن عمرو ﷺ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما قطع قرن، نشأ قرن، كلما قطع قرن نشأ قرن، كلما قطع قرن نشأ قرن، حتى يخرج في بقيتهم الدجال »، وفي رواية أخرى : « كلما طلع قرن قطعه الله « ...[১১১]

এসব হাদিস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, খারিজি বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে আবির্ভূত কোনো নির্দিষ্ট দলকে বোঝায় না। খারিজিদের উৎপত্তি যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে ঘটতে পারে।

খারিজিদের বিভিন্ন নাম

খাওয়ারিজ বা খারিজি ছাড়া এ উগ্রপন্থি বিদআতি সম্প্রদায়ের আরও কিছু নাম বিভিন্ন ইতিহাস ও শরয়ি বইয়ে পাওয়া যায়। তাদের বিশেষ বিশেষ কিছু নাম নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. খাওয়ারিজ

এ সম্প্রদায়কে নির্দেশ করতে সব থেকে বেশি যে নামটি ব্যবহার করা হয়, সেটি হলো খাওয়ারিজ। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, يخرجون علي حين فرقة من المسلمين। এ হাদিস থেকে যুগে যুগে খারিজি সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং এ হাদিসকে সত্যায়িত করে যুগে যুগে বিভিন্ন খাওয়ারিজ দলের আবির্ভাব হয়, যারা মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যেহেতু দলটি মুসলিম শাসক ও জামাআতের বিরুদ্ধে খুরুজ (আবির্ভাব) হয়ে থাকে, তাই তাদের খাওয়ারিজ বলা হয়।

২.আল–মুহাক্কিমা

খাওয়ারিজদের আরও একটি নাম হলো আল-মুহাক্কিমা। এ নামে বিশেষিত করার কারণ হলো, তারা তাহকিমের মাসআলায় আলি রা. ও মুসলিমদের সঙ্গে মতবিরোধ করেছিল। তারা মনে করত, আল্লাহ তাআলা ছাড়া হুকুম প্রদানের অধিকার আর কারও নেই। তাদের একটি স্লোগান ছিল لا حكم إلا لله অর্থাৎ, হুকুমদানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। কুরআন মাজিদের আয়াত 'হুকুম দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নেই'[১১২] উদ্ধৃত করে মুসলিম হাকিম আর যারা তাহকিমের প্রবক্তা তাদের তাকফির করত। এমনকি আহলে বায়তের শিরোমণি আলি রা.-কে পর্যন্ত তাকফির করতে তারা পিছপা হয়নি।

---

১০৯. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল

১১০. সহিহ বুখারি : ৬১৬৩

১১১. মুসনাদু আহমাদ : ৬৯৫২

১১২. সুরা ইউসুফ : ৪০

তাকফিরিরা কুরআন মাজিদের আয়াত তাদের মতের পক্ষে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে, যে আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আর যারা আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারা কাফির।[১১৩]

মুফাসসিরিনদের মতে এখানে কুফুর বলতে ছোট কুফুর বোঝানো হয়েছে যা একজন মুসলিমকে দীন থেকে বের করে দেয় না। তাফসিরে ইবনু কাসিরে এ আয়াতে বর্ণিত কুফরের বিষয়ে বলা হয়েছে, ليس كمن كفر بالله و ملائكته و كتبه و رسله অর্থাৎ, ওই ব্যক্তির মতো নয় (বা তার মতো কাফির হবে না) যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর বইসমূহ ও তাঁর রাসুলগণকে অস্বীকার করেছে।[১১৪] অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, ليس بكفر ينقل عن الملة অর্থাৎ, এমন কুফুরি নয় যা মিল্লাত থেকে বের করে দেবে।[১১৫]

ইসলামি শরিয়তের বিধান হলো, যখন কোনো শাসক শাসনের ক্ষেত্রে ইসলামি বিজাতীয়দের আইন দ্বারা শাসন করে তবে শরিয়তকে বাতিল হিসেবে গণ্য করে না অথবা শরিয়ত বহির্ভূত আইনকে শরিয়তের সমকক্ষ বলে মনে করে না অথবা শরিয়তের কোনো আইন অস্বীকার করে না বা তা যুগোপযোগী নয় এমন ধারণা রাখে না, সে কেবল ভিন্ন আইনে শাসনের কারণে কাফির হবে না। তবে যদি সে ইসলামি শরিয়তকে যুগোপযোগী মনে না করে অথবা তা অস্বীকার করে অথবা তাকে অনৈসলামিক সংবিধানের সমপর্যায়ের বলে মনে করে সে ক্ষেত্রে শরীয়তকে অস্বীকার করার কারণে কাফির হয়ে যাবে। তাফসিরে রুহুল বায়ানে এ বিষয়ে সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে,

তাদের কুফুরি হলো, তাকে (শরিয়তকে) অস্বীকার করা এবং তাদের জুলুম হলো, তার বিরোধী কিছু দিয়ে হুকুম করা আর তাদের ফিসক হলো তা থেকে বের হয়ে যাওয়া।[১১৬]

তবে আইন প্রণয়ন বা Legislation-এর ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। কোনো ব্যক্তি যদি সকল ক্ষমতা থাকার পরেও স্বেচ্ছায় ইসলামি শরিয়ত বাদ দিয়ে ভিন্ন আইন প্রণয়ন করে। আহলুস সুন্নাহর ইমামদের মতে সে কাফির হয়ে যাবে।

খারিজিরা যেহেতু কেবল ভিন্ন আইনে শাসনের কারণেই তাকফির করত ও তাকফিরের বিধিবিধান প্রয়োগ করত, তাই এদেরকে আল-মুহাক্কিমা বলা হতো যদিও মুহাক্কিমা বলতে প্রথম যুগের খারিজিদের বোঝানো হয়, তবে বর্তমান সময়েও একশ্রেণির খাওয়ারিজ পরিলক্ষিত হয়, যারা একই কারণে একই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে ফিকহ ও উসুল বিসর্জন দিয়ে মুসলিম শাসকদের ও মুসলিম দেশের সেনাবাহিনীকে কাফির ও মুরতাদ বলে থাকে। এদেরকেও একপ্রকারের মুহাক্কিমা বলা যেতে পারে।

৩. আশ–শুরাত

শুরাত আরবি শব্দ শারির বহুবচন। এর অর্থ হলো ক্রয়কারি। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

এবং (অপর দিকে) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজ প্রাণকে বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ (এরূপ) বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু।[১১৭]

আগের যুগের খারিজি সম্প্রদায় মনে করত, তারা প্রাণের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ক্রয় করেছে অর্থাৎ, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জনের মধ্যে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অভিপ্রায় রাখত। এ জন্য তাদের শুরাত বলা হত।

৪. মারিকা

আরবি মারাকা শব্দের অর্থ হলো, কোথাও থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা ভেদ করা অথবা অবাধ্য হওয়া। প্রিয়নবি সাঃ খারিজিদের বিষয়ে বলেছেন

---

১১৩. সুরা মায়িদা : ৪৪

১১৪. تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، ج ٣، ص ١٢٠

১১৫. تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، ج ٣، ص ١٢٠

১১৬. تفسير روح البيان للإمام اسماعيل حقي الحنفي الخلوتي البروسوي ج ٢، ص ٤٠٣

১১৭. সুরা বাকারা : ২০৭

ইয়ামরুকুনা মিনাদ দীন। এ হাদিসে বর্ণিত ইয়ামরুকুনা শব্দটি থেকে খারিজিদের নামকরণ করা হয় মারিকা। ইমাম আবুল হাসান মালাতি রাহ. বলেছেন, 'এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে এবং এটা এমন ইজমা যাতে কোনো নকলকারী অথবা বর্ণনাকারী মতভেদ করেননি যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ তাদের (খারিজিদের) মারিকা বলেছেন।[১১৮]

৫. আল–মুকাফফিরা

মুকাফফিরা শব্দটি কাফফারা থেকে এসেছে। এর অর্থ তাকফিরকারী। খারিজিদের একটি বড় ত্রুটি হলো, তারা কাবিরা গুনাহ বা বড় পাপের কারণে মুসলিমদের কাফির বলে। এ জন্য তাদের আল-মুকাফফিরা বা তাকফিরি বলা হয়ে থাকে।

৬. আস–সাবইয়া

খারিজিদের ফিতনার সূচনা যে ব্যক্তির হাত ধরে হয়েছিল, তার নাম ছিল ইবনু সাবা। ইবনু সাবা ছিল একজন ইয়াহুদি নরপিশাচ। সে ছদ্মবেশে মুসলিমদের মধ্যে প্রবেশ করে এবং খারিজি ফিতনা প্রসারে সহায়তা করে। এ কারণে তার নামানুসারে খারিজিদের সাবইয়া বলা হয়ে থাকে।

৭. নাসিবি

খারিজিরা আলি রা.-এর প্রতি ও আহলুল বাইতদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করত। এ জন্য তাদের নাসিবি বলা হয়।

খারিজিদের উৎপত্তি

খারিজিদের উৎপত্তি নিয়ে উলামায়ে কিরাম ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর মতভেদ। কারও মতে খারিজিদের উৎপত্তি হয়েছিল রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর যুগে। আবার কারও মতে তাদের উৎপত্তি ঘটে উসমান গনি রা.-এর জামানায়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, খারিজিদের উদ্ভব ঘটে আলি রা.-এর জামানায়।

যারা বলেন খারিজিদের উৎপত্তি রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর জামানায় তাদের মতে, প্রথম যে ব্যক্তি খারিজি মতাদর্শ গ্রহণ করে সে হলো, বনু তামিম গোত্রের আবু আবদুহ ইবনু জিল খুয়াইসিরা। জুল খুয়ায়সিরা নামে তিনি সম্যক পরিচিত। সহিহ বুখারির একটি রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, জুল খুয়াইসিরা নামক ব্যক্তিটি প্রথম রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর সঙ্গে ফাই-এর সম্পদ নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয়। জুল খুয়াইসিরা প্রথম খারিজি ছিলেন, এ ব্যাপারে একাধিক আইম্মায়ে আহলুস সুন্নাহ মতপ্রকাশ করেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন, ইমাম ইবনুল জাউজি, ইবনু হাজম, শাহরিস্তানি রাহ. প্রমুখ।

ইমাম ইবনুল জাউজি রাহ. জুল খুয়াইসিরার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'প্রথম এবং কুৎসিত অবস্থার খারিজি হলো, জুল খুয়াইসিরা।'119 ইমাম শাহরিস্তানি রাহ. খারিজিদের বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'আর তাদের প্রথম ছিল জুল খুয়ায়সিরা।'[১২০]

অপর পক্ষের মতে, খাওয়ারিজদের উত্থান ঘটে উসমান রা.-এর সময়। যারা শেষপর্যন্ত তার শাহাদতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ মত প্রকাশ করেছেন ইমাম আলি ইবনু আলি আল-হানাফি রাহ. তাঁর শারহু তাহাবিতে। ইবনু কাসিরও উসমান রা.-কে যারা শহিদ করেছিল, তাদের খাওয়ারিজ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

১১৮. আত-তানবিহ : ৫৪

১১৯. তালবিসু ইবলিস

১২০. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল : ১/১১৬

তৃতীয় মতটি হলো, আলি রা.-এর বিরুদ্ধে যেসব খারিজি অস্ত্রধারণ করেছিল, তারা হলো প্রথম খারিজি। এ মতের পক্ষে বহু ইমাম রয়েছেন। ইমামু আহলিস সুন্নাহ আবুল হাসান আশআরি রাহ. বলেন, 'তাদের খাওয়ারিজ নামকরণের কারণ হলো, আলি ইবনু আবি তালিব রা.-এর বিরুদ্ধে তাদের আবির্ভাব।'[১২১] ইমাম আবদুল কাহির আল-বাগদাদি রাহ. তাঁর 'আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক' বইয়ে খারিজিদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে প্রথম আলি রা.-এর বিরুদ্ধে খারিজিদের অস্ত্রধারণের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন।

তবে উপরোক্ত তিনটি মতের মধ্যে উসমান রা.-এর সময় খারিজিদের উত্থান হওয়ার মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আমার মনে হয়।

খারিজিদের বৈশিষ্ট্য

খারিজিদের কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলোর কারণে খারিজিদের চেনা যায়। বিভিন্ন রিওয়ায়াতের আলোকে আইম্মায়ে আহলুস সুন্নাহ খারিজিদের সেসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিরুপণ করেছেন। তাদের কিতাবাদিতে সেসব গুণাবলী নিয়ে সবিশেষ আলোচনা করেছেন। সেসব বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে কিছু বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে,

ক. এরা হবে সীমালঙ্ঘনকারী

খারিজিদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এরা সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে থাকে। তাদের কাজের মধ্যে ভয়াবহ বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়। মূর্খতা ও ধৃষ্টতা প্রদর্শনপূর্বক তারা শরয়ি বিষয়াবলীকে বিকৃত করে, তা দিয়ে মুসলিমদের কাফির ও মুশরিক প্রতিপন্ন করে থাকে। মুসলিম শাসক ও নিরীহ মুসলিমদের অবৈধভাবে হত্যা করে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, উম্মতে মুসলিমার মধ্যে তারাই প্রথম তাকফিরি মতাদর্শের মতো সীমালঙ্ঘনকারী মতাদর্শের প্রবর্তন ঘটায় এবং কবিরা গুনাহসমূহকে কুফুর বলে তা দিয়ে মুসলিমদের তাকফির করে থাকে।

তাকফির শব্দটির বুৎপত্তি كفر থেকে। আরবি ব্যকরণ অনুসারে বাবু তাফয়িল ও খাসিয়াতে নিসবত অনুসারে এর অর্থ হলো, কাউকে কাফির আখ্যায়িত করা। কোনো মুসলিম যখন দীন থেকে খারিজ হয়ে যায়, তখন সুস্পষ্ট কারণের ওপর ভিত্তি করে শরিয়তের প্রমাণের ভিত্তিতে—উম্মতের আইম্মায়ে কিরামরা বা মুফতিরা উক্ত ব্যক্তিকে কাফির হিসেবে ঘোষণা দেন। এ প্রক্রিয়াকে শরিয়তের পরিভাষায় তাকফির বলা হয়ে থাকে। তবে খারিজিরা স্পষ্ট কারণ ছাড়া, কুরআন-সুন্নাহর বিকৃত ব্যাখ্যা ও তাদের মনগড়া উসুলের ওপর ভিত্তি করে—কাফিরদের বিষয়ে নাজিল হওয়া আয়াত ও হাদিসকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে, অবৈধভাবে মুসলিমদের কাফির বলে থাকে। এ জন্য তাদের মুকাফফিরা বা তাকফিরি বলা হয় এবং তাদের মতাদর্শকে তাকফিরি মতাদর্শ বলা হয়।

ইবনু তাইমিয়া রাহ. তাঁর খারিজিদের তাকফিরি হওয়া এবং উম্মতের মধ্যে তারা প্রথম তাকফিরি মতাদর্শ আমদানি করার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'খাওয়ারিজরাই প্রথম আহলুস সুন্নাহকে পাপের কারণে তাকফির করেছিল, বরং তারা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা পাপ মনে করত (সেটা দিয়ে তারা তাকফির করত) এবং তা দ্বারা আহলে কিবলার রক্ত হালাল মনে করত।'[১২২]

খারিজিরা এতটাই উগ্র তাকফিরি ছিল যে, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি ও আহলে বায়তদের অন্যতম আলি ইবনু আবি তালিব রা.-কে তাকফির করেছিল। তাহকিমের মাসআলায় খারিজিরা তাদের মতের সঙ্গে দ্বিমত হওয়ার কারণে তারা সুরা আনআমে বর্ণিত ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ আয়াতটি আলি রা.-এর বিরুদ্ধে অপপ্রয়োগ করে তাঁকে মুরতাদ ফাতওয়া দেয়। নাউজুবিল্লাহ।

খারিজিরা সবাই আলি রা.-এর তাকফিরের বিষয়ে একমত ছিল, এমনকি তাদের একটি অংশ আলি রা.-কে শিরকের দায়ে অভিযুক্ত করে। ইমামু আহলিস সুন্নাহ আবুল হাসান আল-আশআরি এ বিষয়টি উল্লেখপূর্বক বলেন, 'খারিজিরা আলি ইবনু আবি তালিব রা.-এর তাকফিরের বিষয়ে একমত ছিল, একই সঙ্গে তারা এ বিষয়ে মতপার্থক্য করেছিল যে, তাঁর কুফুরটি শিরক ছিল কি না এ বিষয়ে।'[১২৩]

---

১২১. মাকালাতুল আশয়ারি : ১/২০৭

১২২. মাজমুয়ুল ফাতাওয়া : ৭/৪৮১

১২৩. মাকালাতুল ইসলামিইয়িন : ৮৬

খ. তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে কিন্তু মুশরিকদের ছেড়ে দিবে

খারিজিদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা মুসলিমদেরকে তাদের বিকৃত মতাদর্শের মাধ্যমে তাকফির করে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। কিন্তু কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে তারা কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য করবে না বা হাজার কারণ থাকলেও তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না। এক রিওয়ায়াতে এসেছে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,

> তারা মুসলিমদের হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজকদের ছেড়ে দেবে।[১২৪]

তাদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কুরআনে কাফির ও মুশরিকদের ব্যাপারে আয়াত উদ্ধৃত করে সেগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে তাকফির করে থাকে। ইবনু উমর রা. খারিজিদের এ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন,

انهم انطلقوا الي آيات نزلت في الكفار فجعلوها علي المؤمنين (رواه البخاري)

গ. তারা অত্যাধিক ইবাদতকারী হবে কিন্তু তাদের ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না

খারিজি সম্প্রদায়ের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা প্রচুর ইবাদতগুজার হবে। তাদের ইবাদতের আধিক্যতা এবং ইবাদতবন্দেগীর প্রতি অনুরাগ এত তীব্র হবে যে, তাদের কাছে মুসলিমদের ইবাদত যেন কিছুই না, মনে হবে। অত্যাধিক ইবাদতবন্দেগীর মাধ্যমে তারা মানুষকে দেখানোর চেষ্টা করবে, তারা হকের সবথেকে নিকটবর্তী। মানুষ যাতে বিভ্রান্ত হয়ে তাদের আকিদা গ্রহণ করে, তাই তারা বিকৃত কর্মকাণ্ডকে সুন্নাহ সম্মত বা সহিহ আকিদা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করবে; কিন্তু তাদের কোনো ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, ফলে তারা জাহান্নামের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে।

হাদিসে তাদের অত্যাধিক ইবাদতবন্দেগীর বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাঃ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন। বনু তামিম গোত্রের জুল খুয়াইসিরার ব্যাপারে বর্ণিত একটি হাদিস নিম্নে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা থেকে খারিজিদের এ বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়। আবু সায়িদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত,

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ. فَقَالَ وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ، فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ، وَهُوَ قِدْحُهُ، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ-

> আমরা রাসুল সাঃ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম এ অবস্থায় যে, তিনি কিছু গনিমতের মাল বন্টন করছিলেন। তখন বনু তামিম গোত্রের জুল খুয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি ইনসাফ করুন। রাসুল সাঃ বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি ইনসাফ না করি, তাহলে কে ইনসাফ করবে? আমি যদি ইনসাফ না করতাম, তাহলে তুমি নিষ্ফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে। উমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন, ওকে যেতে দাও। তার কিছু সঙ্গীসাথি রয়েছে। তোমাদের কেউ তাদের নামাজের তুলনায় নিজের নামাজ এবং তাদের রোজার তুলনায় নিজের রোজাকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নদেশে প্রবেশ করবে না। তারা দীন থেকে এত দ্রুত বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।[১২৫]

ঘ. তাদের কথাবার্তা সুন্দর হবে কিন্তু কর্মকাণ্ড হবে ইসলামবিরোধী

খারিজিদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা অনেক সময় হকের আওয়াজ উঁচু করে থাকে। তারা কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস উদ্ধৃত করে সুন্দর সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় সেগুলো প্রচার করে থাকে। তাদের কথাবার্তা এতটাই আকর্ষণীয় যে, মানুষ তাদের কথাবার্তায় অতিসহজেই মোহাবিষ্ট

১২৪. বুখারি : ৩৩৪৪

১২৫. বুখারি : ৩৬১০; মুসলিম : ১০৬৪; মিশকাত : ৫৮৯৪।

হতে পারে। তারা বলে, তারাই একমাত্র সহিহ আকিদা ও দীন অনুসরণ করে এবং তাদের ব্যাখ্যাটাই হলো ইসলামের ব্যাখ্যা। এভাবে সুন্দর করে তাদের মতাদর্শকে মানুষের কাছে উপস্থাপন করে; কিন্তু তাদের কাজ হয় পরিপূর্ণ ইসলামবিরোধী। তারা হক কথা বলে; কিন্তু কাজে-কর্মে-আমলে বাতিলের অনুসরণ করে। কুরআন ও সুন্নাহ উদ্ধৃত করে; কিন্তু তার অর্থ ও মর্মার্থ বিকৃত করে ফেলে। তারা নিজেদের মতকে সহিহ আকিদা ও সহিহ দীন বলে প্রচার করে; কিন্তু তাদের বিদআতি মতাদর্শবিরোধী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতকে কাফির, মুশরিক, বিদআতি, জাহমি বলে দেয় এবং তাদের রক্ত ও সম্পদকে হালাল মনে করে। তারা তাওহিদ প্রতিষ্ঠার ডাক দেয় এবং শিরক ধ্বংসের নামে মুসলিমদের হত্যা করে বেড়ায়। এ জন্য রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, يحسنون القول و يسيئون الفعل অর্থাৎ, তারা কথাবার্তা সুন্দর বলবে কিন্তু কাজ খারাপ করবে।

ঙ. তারা অল্পবয়সী হবে এবং তাদের দীন সম্পর্কে জ্ঞান কম হবে

খারিজিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা বয়োবৃদ্ধ হবে না। অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ হবে তরুণ ও যুবক শ্রেণির লোক। আর তারা হবে অবুঝ। শরিয়তের উসুলি ও ফুরুয়ি বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের গভীর ইলম থাকবে না, ফলে তারা দীন ও শরিয়তের ভুল ব্যাখ্যা করবে। হাদিসে তাদের বিষয়ে এ জন্য সুফাহাউল আহলাম ও হুদাসাউল আসনান নামদ্বয় দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। সুফাহাউল আহলাম বলতে অবুঝ ও নির্বোধ বোঝানো হয় আর হুদাসাউল আসনান বলতে বোঝানো হয় অল্প জ্ঞানীকে। বর্তমান যুগের খারিজিদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে দেখা যায়। তাদের অধিকাংশই হয় অল্পবয়সী। দীন সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা না থাকার পরও দীনের বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয়ে মতামত দিতে যায় এবং এর মাধ্যমে নিজে পথভ্রষ্ট হয়, অপরকে পথভ্রষ্ট করে।

চ. বনু তামিম গোত্র থেকে খারিজিদের বের হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী

বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে আরবের বনু তামিম থেকে খারিজিদের আবির্ভাব হওয়ার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বিশেষত জুল খুয়ায়সিরার ব্যাপারে একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে, তাতে বনু তামিম গোত্র থেকে খারিজিদের আবির্ভাবের বিষয়ে ইঙ্গিত মেলে। রিওয়ায়াতটির অংশবিশেষ নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

> فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ-
>
> লোকটি ফিরে যাওয়ার পর নবি সাঃ বললেন, এসব ব্যক্তির বংশ থেকে এমন কিছু লোক আসবে যারা কুরআন পড়বে; কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম শিকারের দেহ ভেদ করে তীর বের হয়ে যাওয়ার মতো বেরিয়ে যাবে। তারা মুসলিমদের হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজারীদের ছেড়ে দিবে। যদি আমি তাদের পাই তাহলে আদ জাতির মতো হত্যা করব।[১২৬]

পরবর্তীতে হাদিসটির সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং যুগে যুগে বনু তামিম গোত্র থেকে বিভিন্ন খারিজিগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে।

ছ. নজদ অঞ্চল থেকে খারিজিদের উৎপত্তি হবে

বিভিন্ন হাদিস থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, খারিজিদের আবির্ভাব ঘটবে মাশরিক তথা পূর্বদিক থেকে। আবার কিছু হাদিসে নির্দিষ্ট করে নজদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে,

> পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে ধনুক শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারা আর দীনের মধ্যে ফিরে আসবে না, যেমনভাবে ধনুক ছিলায় ফিরে আসে না। বলা হলো, তাদের আলামত কি? তিনি বললেন, 'তাদের আলামত হচ্ছে, মাথা মুন্ডন করা।'[১২৭]

---

১২৬. বুখারি : ৭৪৩২; মুসলিম : ১০৬৪; মিশকাত : ৫৮৯৪।

১২৭. বুখারি : ৭৫৬২।

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেছেন,

ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟ فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

একদা আল্লাহর নবি সাঃ দুআ করলেন, হে আল্লাহ, আমাদের জন্য বরকত দাও শামে (সিরিয়াতে)। হে আল্লাহ, বরকত দাও আমাদের জন্য ইয়ামেনে। তারা (সাহাবিরা) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আর আমাদের নাজদের (ইরাকের) জন্য (দুআ করুন)? তিনি বললেন, হে আল্লাহ, আমাদের জন্য বরকত নাজিল করো শামে। হে আল্লাহ, আমাদের জন্য বরকত দাও ইয়ামেনে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের নজদের মধ্যেও? আমার ধারণা তিনি তৃতীয়বারে বললেন, সেখান থেকে ভূমিকম্প, ফিতনা হবে এবং শয়তানের শিং উদিত হবে।[১২৮]

রাসুলুল্লাহ সাঃ আরও বলেছেন, رأس الكفر نحو المشرق অর্থাৎ, কুফুরের শির পূর্ব দিকে। সাইয়িদ হাবিব আলাবি একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, যে রিওয়ায়াতটি অত্যন্ত বিস্ময়কর। সেখানে একেবারে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, নজদের ইয়ামামা থেকে ফিতনা প্রকাশ হবে। রিওয়ায়াতটি এরকম,

يخرج في آخر الزمان في بلد مسيلمة رجل يغير دين الاسلام

শেষ জামানায় মুসায়লামার দেশে এমন একজন লোক বের হবে, যে ইসলাম ধর্মকে পরিবর্তন করে ফেলবে।[১২৯]

সব হাদিস একত্রিত করলে খারিজিদের নজদ অঞ্চল থেকে বেরোনোর বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। নজদ বলতে ঠিক কোন অঞ্চলকে বোঝানো হয় তা আমরা নজদের ইতিবৃত্ত শীর্ষক অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করেছি। আমরা যদি খারিজিদের ইতিহাস গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখব যে, অধিকাংশ খারিজি দল বা তাদের নেতাদের উদ্ভব ঘটেছিল নজদ অঞ্চল থেকে।

জ. তারা কুরআনের দিকে আহ্বান করবে যার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই

খারিজিদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কথায় কথায় বলে থাকে, তারা কুরআন অথবা কুরআন-সুন্নাহর দিকে আহ্বান করে। এ কথা দ্বারা তারা কুরআন-সুন্নাহর মনগড়া ব্যাখ্যা নিয়ে থাকে। আবু দাউদের একটি হাদিসে খারিজিদের বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে বলা হয়েছে যে,

يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء

তারা কিতাবুল্লাহর দিকে আহ্বান করে কিন্তু তাদের সাথে তার (অর্থাৎ কুরআনের) কোনো সম্পর্ক নেই।[১৩০]

ঝ. তারা সৃষ্টিকুলের নিকৃষ্ট জীব

খারিজিরা সৃষ্টিকুলের নিকৃষ্টতম জীব। হাদিসে তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে هم شر الخلق والخليقة।[131] আরবি ভাষায় খালক শব্দের অর্থ সৃষ্টি। আর খালিকা শব্দের অর্থ সৃষ্টিজগৎ। এখানে অর্থ بهيمة বা পুশুকূল অর্থাৎ, তারা হলো মানুষ ও সৃষ্টিজগতের নিকৃষ্টতম। ইমাম তিবি রাহ.-এর ব্যাখ্যায় বলেন,

فاستبطنوا الكفر و زعموا انهم اعرف الناس بالايمان و اشدهم تمسكا بالقرآن فضلوا و اضلوا

তারা কুফুরিকে ধারণ করেছিল আর মনে করেছিল যে, তারা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আকিদার জ্ঞান রাখে এবং সবচেয়ে বেশি কুরআন মেনে চলে। এভাবে তারা পথভ্রষ্ট হলো এবং অপরকে পথভ্রষ্ট করল।[১৩২]

---

১২৮. বুখারি : ৭০৯৪

১২৯. মিসবাহুল আনাম

১৩০. আবু দাউদ : ৪৭৬৫

১৩১. আবু দাউদ : ৪৭৬৫

১৩২. শারহুল মিশকাত : ৮/২৫০৩

ঞ. তাদের কথা হবে ভালো কিন্তু কাজ হবে মন্দ

খারিজিদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তারা কথায় পাকা। তাদের কথাবার্তা শুনলে মনে হবে, তারাই মনে হয় যুগের শ্রেষ্ঠতম মানুষ; কিন্তু তাদের কাজ হয় কথার বিপরীত। কাজে তারা অত্যন্ত বর্বর ও জঘন্য। আবু দাউদে খারেজিদের বিষয়ে বলা হয়েছে,

قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ

তারা সুন্দর কথা বলে ও মন্দ কাজ করে বেড়ায়।[১৩৩]

যুগে যুগে আবির্ভূত হওয়া বিভিন্ন খারিজি দল

খায়রুল কুরুন থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে খারিজি সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটেছে। ইতিহাসবিদদের মতে, ইসলামের প্রথম যুগ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২০টি খারিজি সম্প্রদায় আবির্ভূত হয়েছে। এসব খারিজি দলগুলোর চরিত্রে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও মৌলিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অমিল নেই। এসব গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য খাওয়ারিজ সম্প্রদায় হলো, আজারিকা, নাজদাত, সুফরিয়া, ইবাজিয়া প্রভৃতি।

১. আজারিকা

ইরাকের সুফিদের পদধূলি বিধৌত পুণ্যভূমি, ইবাদতকারীদের দেশ, সমৃদ্ধ বসরা নগরীর বুকে উমাইয়া যুগে আজারিকা নামক একটি খারিজি দল আবির্ভূত হয়। আবু রাশিদ নাফি ইবনুল আজরাক নামক এক ব্যক্তির হাত ধরে এ খারিজি গোষ্ঠীর উত্থান হয়। এ জন্য তাদেরকে আজারিকা বলা হয়। প্রথমে নাফি উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এরপর আলি রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এরপর উমাইয়া যুগে উমাইয়াবাহিনীর হাতে তাদের পতন ঘটে।

২. নাজদাত

নাজদাত নামক ফিরকাটি নজদের ইয়ামামার বনু হানাফিয়া থেকে উদ্ভূত হয়। নাজদা ইবনু আমির নামক এক খারিজির নেতৃত্বে এ দলটির আবির্ভাব ঘটে বিধায় তাঁর নামানুযায়ী দলটির নাম হয় নাজদাত। নাজদা ইবনু আমির ছিলেন বনু হানাফিয়ার সন্তান। মাতৃগতভাবে তাঁর দেহে বনু তামিমের রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল। নাজদাত খারিজিদের আবির্ভাবস্থল নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম ইবনুল আসির রাহ. প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ 'আল-কামিল ফিত তারিখ' এবং ইমাম শাহরিস্তানি রাহ. প্রণীত 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল' অনুসারে এ খারিজিদের উদ্ভব ঘটে নজদের ইয়ামামা থেকে। এ মতটি প্রসিদ্ধ। ইমাম মালাতিসহ কারও কারও মতে নাজদাতদের উদ্ভব জাবালে উমান থেকে।

অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সঙ্গে ইবনু আমিরের বংশগত এবং জন্মস্থানগত বেশ মিল পাওয়া যায়। ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নাজদাতের মতো বনু হানাফিয়ার সন্তান ও তাঁর দেহে বনু তামিমের রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল। তিনিও নজদের ইয়ামামাতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমদিকে নাজদা নাফি ইবনুল আজরাকের সঙ্গে ছিল; কিন্তু পরবর্তীতে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধকে কেন্দ্র করে উভয়ে আলাদা হয়ে যান। নাজদাত ইসলামি সাম্রাজ্যের একটি বড় অংশ দখল করে তার ওপর তাঁর আমল জারি করেছিল, যার পরিধি সানা, বাহরাইন ও কাতিফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৬৮ হিজরিতে মক্কা-মদিনা দখলের প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে তাঁরই অনুসারীদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে এবং তাঁর অনুসারীরা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। ফলে প্রাণ বাঁচাতে তিনি আত্মগোপন করেন; কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ৭২ হিজরিতে আবু ফুদায়ক নামক এক খারিজির অনুসারীরা তাকে হত্যা করে ফেলে। হত্যার সময় তিনি নিচের বাইতটি পাঠ করেন,

وإن جر مولانا علينا جريرةً
صبرنا لها إن الكرام الدعائم

৩. সুফরিয়া

১৩৩. আবু দাউদ : ৪৭৬৫

এ দলটি জিয়াদ ইবনুল আসফারের নেতৃত্বে মাগরিব থেকে প্রকাশ পায়। এরা আজারিকা গোষ্ঠীর থেকে কম উগ্র হলেও অন্যান্যদের থেকে যথেষ্ট উগ্র ছিল। এরা সব গুনাহ দ্বারা তাকফির করত না; কিন্তু যেসব গুনাহে দণ্ডবিধি রয়েছে সেগুলো দ্বারা তাকফির করত। এ ছাড়া এরা শিশু হত্যা করত না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তারা সিজিলমাসাতে (অধুনা মরক্কো) মিদরারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

৪. ইবাজিয়া

এ ফিরকার নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইবনু ইবাজ আত-তামিমি। নজদের ইয়ামামার বনু তামিম গোত্রে তার জন্ম। এ দলটি অপর তিন দলের তুলনায় তাকফিরের ক্ষেত্রে অনেকটা শীথিল ছিল। ওমানের বর্তমান রাজবংশ ইবাজিয়া মতাদর্শের অনুসারী।

খারিজিদের সঙ্গে ওয়াহাবিদের সাযুজ্য

প্রথম পর্বে ওয়াহাবি আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে আমরা বিষদ আলোচনা করেছি। ওয়াহাবিদের উগ্রতা এবং তাদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় আহলুস সুন্নাতের আইম্মায়ে কিরামদের একটি বৃহদাংশ তাদের খারিজি হিসেবে অভিহিত করেছেন। হানাফি মাজহাবের বিশিষ্ট ইমাম ইবনু আবিদিন রাহ. তাঁর 'ফাতওয়ায়ে শামি' বইয়ের ষষ্ঠ খণ্ডের ৪১৩ পৃষ্ঠায়, কিতাবুল জিহাদের বাবুল বুগাত নামক অধ্যায়ে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবকে খারিজি হিসেবে অভিহিত করে—একটি অধ্যায় তৈরি করেছেন যার শিরোনাম হলো, 'মাতলাবুন ফি আতবায়ি আবদুল ওয়াহহাব আল-খাওয়ারিজ ফি জামানিনা।'

শাফিয়ি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম ও ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সমসাময়িক মক্কার গ্র্যান্ড মুফতি জাইনি দাহলান রাহ. ওয়াবিয়াতের রদ্দ করে একাধিক বই রচনা করেছেন। তিনি তাঁর 'তারিখু খুলাসাতুল কালাম' এ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবকে খারিজি প্রতিপন্ন করেছেন।

ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সমসাময়িক নজদের বিখ্যাত হাম্বলি মাজহাবের ইমাম মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুহ ইবনু ফিরুজ আল-হাম্বলি আত-তামিমি আল-আহসায়ি রাহ. তাঁর ওয়াহাবিদের খন্ডনে লেখা রিসালা 'আর রাদ্দু আলা মান কাফফারা আহলার রিয়াজ ওয়া মান হাউলাহুম মিনাল মুসলিমিন'-এর মধ্যে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবকে মুকাফফির এবং জাহিলে মুরাক্কাব নামে বিশেষিত করে তাকে খারিজি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মালিকি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আস-সাবি রাহ. তাঁর 'শারহু তাফসিরিল জালালাইন'-এর মধ্যে সুরা আল-ফাতিরের ৬ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় ওয়াহাবিদের খারিজি হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ ছাড়া আহলুস সুন্নাতের চার মাজহাবের আরও বহু প্রণিধানযোগ্য আইম্মায়ে কিরাম ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে অসি ও মসি দিয়ে সংগ্রাম করেছেন। তাদের বিবরণী পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হবে।
আহলুস সুন্নাহর আইম্মায়ে কিরাম ওয়াহাবিদের খাওয়ারিজ আখ্যায়িত করার কারণ হলো, ওয়াহাবিদের মধ্যে খারিজিয়াতের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে ওয়াহাবিদের সঙ্গে খারিজিদের বৈশিষ্ট্যগত কিছু সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. ওয়াহাবিরা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী

প্রথম পর্বে ওয়াহাবিদের ইতিহাস আলোচনার সময় আমরা দেখেছি ওয়াহাবিরা কতটা সীমালঙ্ঘনকারী ছিল। আমরা দেখেছি যে, কেবল ওয়াহাবিদের মতাদর্শ পরিত্যাগ করার কারণে অথবা ওয়াহাবিদের বিরোধিতা করার কারণে তারা নিরীহ মুসলিমদের তাকফির করত এবং মুরতাদ বলে তাদের রক্তকে হালাল মনে করত। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ওয়াহাবিদের অবৈধ তাকফির নিয়ে আমরা সবিষদে আলোচনা করব। এখানে তাদের নীরিহ মুসলিমদের তাকফিরের আরও কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হলো।

ওয়াহাবিদের একটি নির্ভরযোগ্য ফাতওয়ার বই হলো, 'আদ-দুরাসুস সানিয়া ফিল আজওয়াবাতিন নজদিয়া'। বইটি থেকে ইতিপূর্বে অন্যান্য অধ্যায়ে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে ওয়াহাবিদের গুরু মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের বিভিন্ন ফাতওয়ার সমাহার ঘটানো হয়েছে। গ্রন্থটির দশম খণ্ডের ১৪৩-১৪৪ পৃষ্ঠায় একটি মাসআলা বর্ণিত হয়েছে, যেটা থেকে ওয়াহাবিদের অবৈধ তাকফিরের নগ্ন নিদর্শন পাওয়া যায়। তাতে একটি প্রশ্ন করা হয় এ মর্মে যে, কোনো ব্যক্তি যদি ইসলাম (ওয়াহাবি মতাদর্শ) গ্রহণ করে, এরপর তার আগের ধর্মের (অর্থাৎ, তারা আগে আহলুস সুন্নাতের যে মাজহাবের ওপর ছিল) আমল জারি রাখে এবং দাবি করে যে, তার পিতামাতা ইসলামের ওপর ইনতিকাল করেছে। সে মুসলিম থাকবে নাকি মুরতাদ হয়ে যাবে? এখানে প্রশ্নটি সুক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, প্রশ্নটা আসলে কোনো কাফিরের বিষয়ে করা হয় নাই।

কারণ, কোনো কাফির বা অমুসলিম কখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর এ আকিদা রাখতে পারে না যে, তার পিতামাতা ইসলামের ওপর ছিল। এখানে প্রশ্নটি ওয়াহাবি মতাদর্শের বাইরের মুসলিমদের বিষয়ে করা হয়, যারা ওয়াহাবিদের কাছে অমুসলিম হিসেবে গণ্য ছিল। তারা কেউ কেউ ওয়াহাবিদের মতাদর্শ গ্রহণের পরেও স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস রাখত যে, তাদের পিতামাতা মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। ফলে ওয়াহাবিদের কাছে এদের বিষয়ে ফাতওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিল। কারণ, ইসলামের মধ্যে কোনো কুফর বৈধ মনে করা কুফুরি। তাই তারা এসব নব্য ওয়াহাবিদের বিষয়ে প্রশ্নটি করেছিল। প্রশ্নটির উত্তরে বলা হচ্ছে,

> الجواب : إن هذا الرجل، إن اعتقد أن آباءه ماتوا على الإسلام، ولم يفعلوا الشّرك الذي نهيناالنّاس-فإنه لا يحكم بكفره، وإن كان مراده أن هذا الشرك الذي نهينا النّاس عنه، هو دين الإسلام، فهذا كافر
>
> উত্তর : এ ব্যক্তি যদি এটা বিশ্বাস করে যে, তার পিতামাতা ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছে; কিন্তু যেসব শিরকের বিষয়ে আমরা নিষেধ করেছি (ওয়াহাবিরা নিদা, তাওয়াসসুল, তাবাররুক, শাফাআত ইত্যাদি বৈধ জিনিসকে শিরক বলত। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিশদ আলোচনা করা হবে) তা না করে, তাহলে তার কুফুরের হুকুম দেওয়া হবে না। আর যদি তার উদ্দেশ্য এটা হয় যে, এ শিরক যা থেকে আমরা মানুষকে নিষেধ করেছি সেটা ইসলাম, তাহলে সে কাফির।

এখানে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমটি হলো, ওয়াহাবিরা তাদের সময়ে যারা এ বাতিল মতাদর্শ গ্রহণ না করত তাদের এবং তার পূর্ববর্তী সময়ে যারা ওয়াহাবি মতাদর্শ গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করেছিল, তাদের অমুসলিম মনে করত। একই সঙ্গে তারা তাদের মতাদর্শবিরোধী কিছু বিষয় যেমন : তাওয়াসসুল, তাবাররুক, ইসতিগাসা ইত্যাদি বিষয় যেগুলো তারা শিরক মনে করত; অথচ ইসলামে যেগুলো বৈধ এমন জিনিসগুলোকে বৈধ মনে করলে তারা নব্য ওয়াহাবিদেরকে কাফির বলত।

ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থাবলী সুগভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে তাঁর মারাত্মক তাকফিরি চিন্তাধারার বিষয়ে আমরা জানতে পারি। পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে আমরা ইবনু আব্দিল ওয়াহহাবের লিখিত কাশফুশ শুবুহাত নামক পুস্তিকা হতে একটি উদাহরণ পেশ করছি। ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব তাঁর কাশফুশ শুবুহাত পুস্তিকার ১৬ নম্বর অধ্যায়ে শাফায়াত সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন,

"তার উপমা হল যেমনটি কতিপয় মুশরিক বলে থাকে, **(শুনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না।)** [ইউনুসঃ ৬২] আর শাফায়াত হল সত্য।"

এখানে ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব মুশরিক বলতে মূলতঃ মুসলিমদের তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে বুঝিয়েছেন যাঁরা আম্বিয়া, পরলোকগত আওলিয়া ও সালিহিনদিগের নিকট শাফায়াতকে বৈধজ্ঞান করে থাকেন। কারণ আহলে সুন্নাতের চার মাযহাবের নিকট দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে এই প্রকার শাফায়াত বৈধ হলেও মহাপণ্ডিত ইবনু আব্দিল ওয়াহহাবের নিকট শাফায়াতের এই প্রকারটি শিরক হিসেবে পরিগণিত ছিল। ইবনু আব্দিল ওয়াহহাবের লিখিত কিতাবাদী এধরনের তাকফিরী চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ। যা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ। ইবনু আব্দিল ওয়াহহাবের সমসাময়িক নজদের বিদগ্ধ হাম্বলী ইমাম হযরত ইবনু আফালিক আল হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর রিসালা ' جواب ابن عفالق علي رسالة ابن معمر' এর মধ্যে লিখেছেনঃ

"এই ব্যক্তিটি (ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব) সমগ্র উম্মতকে তাকফির করেছে, বরং আল্লাহর কসম রসুলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তাঁদের ও তাঁদের উম্মাহগণকে শিরকের দায়ে দায়ী করেছে।"[১৩৪]

খোদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাবের ভাই এবং তদানীন্তন নজদের বিশিষ্ট হাম্বলী আলিম ও কাজী হযরত সুলাইমান ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন নজদী রাহিমাহুল্লাহ ওয়াহহাবী মতাদর্শ রদে লিখিত তাঁর গ্রন্থ 'আস সাওয়াইকুল ইলাহিয়্যাহ ফির রাদ্দি আলাল ওয়াহহাবিয়া'র ১৪৩ পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে, ওয়াহহাবীরা তাদের ভূমি ব্যতীত বাকি সমগ্র মুসলিমদের মুশরিক জ্ঞান করত ও তাঁদের দেশসমূহকে দারুল হরব বলত।

ওয়াহাবিদের অবৈধ তাকফিরের আরও একটি নিদর্শন হলো, তারা উসমানিদের আমভাবে তাকফির করত এবং উসমানি সেনাবাহিনীকে মুশরিকবাহিনী মনে করত। ওয়াহাবিদের স্বনামধন্য ইমাম এবং ইবনু আবদুল ওয়াহাবের প্রপৌত্র আবদুল লতিফ ইবনু আবদির রাহমান আলে

১৩৪. পৃষ্ঠাঃ ৫৮

শায়খ তাঁর *উয়ুনুর রাসায়েল* বইয়ে উসমানিদেরকে ইসলামের শত্রু এবং মুশরিক হিসেবে অভিহিত করেছেন। হুতাবাসীকে উদ্দেশ্য করে তাঁর একটি রিসালাতে তিনি বলেন,

> ওই সকল ফিতনার মধ্যে একটি হলো মহা ফিতনা এবং বড় মুসিবত, জাতি ও ধর্মের শত্রু মুশরিক সেনাবাহিনীর ফিতনা।[১৩৫]

উক্ত পৃষ্ঠার টিকায় মুশরিকদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তারা হলো উসমানি সেনাবাহিনী। ওয়াহাবিরা বিশ্বাস করত, তারা যে মতাদর্শের উপর রয়েছে, সে মতাদর্শটাই হলো ইসলাম। তার বাইরে যারা রয়েছেন তারা যদিও মুসলিম হন, ওয়াহাবিদের কাছে তারা ছিলেন মুশরিক ও কাফির। ওয়াহাবিরা দীনের বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি কুফুর ও তাকফিরের বিষয়ে চরম সীমালংঘন করেছিল।

২. ওয়াহাবিদের লড়াই ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে

প্রথম পর্বে আমরা ওয়াহাবিদের ইতিহাস থেকে দেখেছি, ওয়াহাবিদের লড়াই ছিল মূলত নজদ, হিজাজ ও ফিলিস্তিনসহ উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে। তাদের ইতিহাস পড়লে দেখা যাবে, তারা কখনো কোনো কাফির বা অমুসলিম অথবা তাগুতের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি; বরং বিভিন্ন সময় তারা ব্রিটিশ দখলদার বাহিনী, ইয়াহুদি জায়নবাদী এবং আমেরিকার সঙ্গে জোট বেঁধে মুসলিম উম্মাহ ও উসমানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এমনকি আমরা প্রথম পর্বে জন ফিলবির বইয়ে দেখেছি, ওয়াহাবিরা ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের তদানীন্তন মুসলিম ইমারতগুলো থেকে উত্তম মনে করত। শুধু ইয়াহুদি অথবা খ্রিষ্টান নয়, তারা রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর যুগের মক্কার মুশরিকদের থেকে উসমানি যুগের মুসলিম—যাদের তারা মুশরিক মনে করত—নিকৃষ্টতর মনে করত। ওয়াহাবিরা রাফিজি মুশরিক, যারা আলি রা.-কে আল্লাহ মনে করত, তাদের থেকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতকে নিকৃষ্টতর মনে করত। বিখ্যাত হাম্বলি আলিম ইমাম আবদুল্লাহ ইবনু দাউদ হাম্বলি রাহ. যিনি নজদি হাম্বলি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুহ ইবনু ফিরুজ হাম্বলি রাহ.-এর ছাত্র ছিলেন, তাঁর বইয়ে আবদুল আজিজ নামক ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের ঘনিষ্ঠতম একটি ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কথপোকথনের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

> এরপর আমি তাঁকে আলি রা.-এর মাশহাদের কাছে রাফিজিদের শিরকি কার্যক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যেমন : তার মধ্যে একটি আমি এক রাফিজিকে বলতে শুনেছি, 'হে আলি, আপনিই হচ্ছেন আল্লাহ, হে আলি, আপনিই হচ্ছেন মাবুদ, হে আলি, আপনিই হচ্ছেন মাওজুদ ইত্যাদি।'...তো তিনি (ওয়াহাবি আবদুল আজিজ) বললেন, 'তাদের সেসব করতে দাও। তোমরা তাদের থেকে নিকৃষ্ট।'[১৩৬]

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, খারিজিদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা মুশরিকদের জুরম-জুলুম ও পাপ সত্ত্বেও তাদের ছেড়ে দেয় কিন্তু নিরপরাধ মুসলিমদের মুশরিক বলে তাদের সঙ্গে লড়াই করে। ওয়াহাবিদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যটি পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল।

৩. তাওহিদের দাওয়াতের মোড়কে বাতিল মতাদর্শ

ওয়াহাবিরা তাদের মতাদর্শের প্রতি আহ্বানকে তাওহিদের প্রতি আহ্বান বলে প্রচার করত। তারা তাদের দাওয়াতকে সহিহ আকিদার দিকে দাওয়াত বলে প্রচার করত এবং তাদের দাওয়াতকে হক প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে কুরআন ও হাদিসের কিতাবাদি থেকে উদ্ধৃত করত। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি কর্ম ছিল বাতিল। তারা সহিহ আকিদার মোড়কে প্রচার করত খারিজি তাকফিরি মতাদর্শ। কুরআন-সুন্নাহর অর্থ ও মর্মার্থ বিকৃত করত, তা দিয়ে মুসলিমদের তাকফির করত এবং তাদের জান-মালকে হালাল মনে করত। নজদের নাবাতি কবি হুমাইদান আশ-শুআইয়ির তাঁর কাব্যে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির ব্যাপারে বলেছেন, قوله حق و فعله باطل অর্থাৎ, তাঁর কথাবার্তা ছিল হক, কিন্তু কর্মকাণ্ড ছিল বাতিল। ওয়াহাবিরা আইম্মা ও ফুকাহাদের উসুল ও বিধানের ধার ধারত না। স্বয়ং ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি মনে করতেন, ফিকাহ শাস্ত্র শিরক। ইবনু আবদুল ওয়াহহাব বলেন,

> ...اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) الآية [التوبة : 31] فسرها رسول الله ﷺ والأئمة بعده، بهذا الذي تسمونه الفقه، وهو الذي سماه الله شركاً ...
>
> ...তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পণ্ডিত ও ধর্ম যাজকদের রব বানিয়ে নিয়েছে। সুরা তাওবা : ৩১; রাসুলুল্লাহ সাঃ ও তাঁর পরবর্তী

১৩৫. উয়ুনুর রাসায়িল : ২/৯৪০-৯৪১

১৩৬. আস-সাওয়ায়িকু ওয়ার রুয়ুদ : ৫১-৫২।

> সময়ে ইমামরা আয়াতটি ওটা দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন যেটাকে তোমরা ফিকহ বলো, এ অবস্থায় যে সেটাকে আল্লাহ তাআলা শিরক বলেছেন...[১৩৭]

ইবনু আবদুল ওয়াহহাব মূলত এখানে কাফিরদের বিষয়ে নাজিল হওয়া আয়াত ইলমুল ফিকহের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে আয়াতটির অপব্যাখ্যা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি মুফাসসিরিনদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করেছেন। কোনো কালে কোনো মুফাসসিরিন উক্ত আয়াতকে ফিকহ দ্বারা তাফসির করেননি। ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির শৈশব থেকেই ইলমুল ফিকহের প্রতি বিরাগ ছিল। এ কারণে তাঁর পিতা তাঁর প্রতি বরাবরই রাগন্বিত ছিলেন। নজদির সমসাময়িক বিশিষ্ট হাম্বলি ইমাম ইবনু হুমায়দ রাহ. বলেন,

> শায়খ আবদুল ওয়াহহাবের সমসাময়িক কিছু আহলে ইলম যাদের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছি তারা আমাকে জানিয়েছেন, তিনি (আবদুল ওয়াহহাব) তাঁর ছেলে মুহাম্মাদের ওপর রাগন্বিত ছিলেন, তার সালাফদিগের ও আহলে সমসাময়িকগণের মতো ফিকহ চর্চার প্রতি রাজি না হওয়ায় রাগন্বিত ছিলেন, আর তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন, (ভবিষ্যতে) তাঁর থেকে কিছু একটা ঘটবে। তিনি মানুষদের বলতেন, তোমরা অচিরেই মুহাম্মাদের (ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির) থেকে (খারাপ) কিছু দেখবে।[১৩৮]

তাঁর পিতার ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়। মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি ফিকহ চর্চা না করার ফলে এবং তাকে শিরক প্রতিপন্ন করে মনগড়া দীনের ব্যাখ্যা প্রদান করার মাধ্যমে নিজে গোমরাহ হয়েছিলেন এবং অপরকে গোমরাহ করেছিলেন। অতএব, এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, ওয়াহাবিদের কিছু কথা হকপন্থি হলেও তাদের কর্মকাণ্ড ছিল সম্পূর্ণ বাতিল। আর এটা খারিজিদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪. সুফাহাউল আহলাম ও হুদাসাউল আসনান

অন্যান্য খারিজিদের মতো ওয়াহাবি মতাদর্শীদের অধিকাংশই ছিল সুফাহাউল আহলাম ও হুদাসাউল আসনান। তারা অধিকাংশ ছিল অল্পবয়সী। শরিয়তের বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখত না। ফলে তারা নিজেদের মতো দীন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা প্রদান করত এবং নানান ফিতনা-ফাসাদ তৈরি করত। স্বয়ং মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন না। ইমাম আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহ. তাঁর 'ফয়জুল বারি'তে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদিকে নির্বোধ ও স্বল্পজ্ঞানী বলেছেন। নজদির সমসাময়িক নজদের হাম্বলি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুহ ইবনু ফিরুজ রাহ. তাঁর 'الرد علي من كفر اهل الرياض'-এর মধ্যে নজদিকে জাহিলে মুরাক্কাব বলেছেন। জাহিলে মুরাক্কাব বলা হয়, ওই সকল মূর্খদের যারা নিজেদের মূর্খামির সত্ত্বেও নিজেদের সঠিক মনে করে।

৫. নজদ ও বনু তামিম থেকে নির্গত হওয়া

ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের প্রথম প্রকাশ ঘটে নজদ প্রদেশের মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের দেশ ইয়ামামা থেকে। যদিও ওয়াহাবি সম্প্রদায় উদ্ভবের আগে ইরাকের বসরা নগরী থেকে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি তাঁর মতাদর্শের প্রচার শুরু করেন এবং কেবল বাতিল মতাদর্শ প্রচারের কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিতাড়িত হন।

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি ছিলেন বনু তামিম গোত্রের। এ জন্য তাঁর নামের সঙ্গে তামিমি শব্দ যুক্ত করা হয়ে থাকে। তবে এ বিষয়ে ইতিহাসবিদদের মতবিরোধ রয়েছে। একশ্রেণির ইতিহাসবিদ বলেন তিনি বনু তামিম গোত্রের সন্তান। এ জন্য তাঁকে গোত্রের দিকে নিসবত করে তামিমি বলা হয়। আরেক দলের মতে তিনি তুরস্কের বুরসাস্থ এক তামিম নামক দুনমা ইয়াহুদির বংশধর। তবে প্রথম মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত।

৬. কুরআন-সুন্নাহর (অপব্যাখ্যার দিকে) আহ্বান

ওয়াহাবিরা ধারণা করত, তাদের মতাদর্শটিই হলো একমাত্র সত্য মতাদর্শ এবং তারা যে কুরআন-সুন্নাহর মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করছে সেটিই হলো কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত ব্যাখ্যা। ওয়াহাবিদের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনু দাউদ বলেন,

> তারা মানুষকে তার দিকে (কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যার দিকে) আহ্বান করে, এমনকি তাদের মধ্যে ইতরশ্রেণী যারা আলিফ, বা, তা, সা, (অর্থাৎ, যার মৌলিক জ্ঞানও নেই) জানে না, তারা যখন কোনো আকাবির-উলামাদের সঙ্গে মেলে—যদি ধরেও নেওয়া হয়, উক্ত

১৩৭. আদ-দুরারুস সানিয়া ফিল আজওয়াবাতিন নাজদিয়া : ২/৫৯

১৩৮. আস-সুহুবুল ওয়াবিলা : ২৭৫

ব্যক্তি মর্যাদার দিক থেকে ইমাম আহমাদ রাহ.-এর সমপর্যায়ের—তাঁকে পর্যন্ত সে এটাই বলবে, 'আমি আপনাকে কিতাবুল্লাহর দিকে আহ্বান করছি'। যদিও কিনা সে (অর্থাৎ, ইতর ব্যক্তি) সুরা ফাতিহার একটি আয়াত ছাড়া আর কিছু ঠিকঠাক পড়তে পারে না, আর না নামাজও সঠিকরূপে আদায় করতে পারে। এমনকি আমি তাদের অসংখ্যবার বলতে শুনেছি, তারা তাদের সাধারণ লোকদের বলে বেড়ায়, 'আমার বিরুদ্ধে যদি এ অঞ্চলের উলামারা জড়ো হয়, আমি তাদের পরাজিত করব এবং তাদের বিরুদ্ধে কুরআন থেকে দলিল পেশ করব।' প্রায়শই তারা তাদের চিঠিপত্র ও কল্পকাহিনী যাকে তারা স্মারক বলে তাতে লেখে, 'মুয়াহহিদিনদের একজন শতজন মুশরিকদের পরাজিত করে থাকে'। আর তারা মুয়াহহিদিন বলতে নিজেদের অর্থ নেয়, আর মুশরিকিন বলতে তাদের ছাড়া বাকিদের (মুসলিমদের) অর্থ নেয়। আল্লাহ তাআলা শাফিয়ি রাহ.-কে রহম করুন যিনি বলেছেন, 'আমার সঙ্গে কোনো আলিম যখনই বিতর্ক করেছেন আমি তাঁকে পরাজিত করেছি, কিন্তু আমার সঙ্গে কোনো মূর্খ যখন বিতর্ক করেছে সে আমায় পরাজিত করেছে।'[১৩৯]

এ অধ্যয়ে আমরা ওয়াহাবিদের সঙ্গে খারিজিদের চারিত্রিক ও বৈশিষ্ট্যগত কিছু মিল নিয়ে আলোচনা করলাম। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ওয়াহাবিদের অবৈধ তাকফির ও দীনের মধ্যে তাহরিফ নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

www.muslimdm.com

১৩৯. আস-সাওয়ায়িকু ওয়ার রুয়ুদ : ৫৭-৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওয়াহাবিদের কর্তৃক উম্মতে মুসলিমাকে তাকফির

নিজের কুফরীর স্বীকারোক্তি:

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নজদী বলেন:

لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني ان لي معرفة وانا في ذلك الوقت لا اعرف معنى لا اله الا الله ولا اعرف دين الاسلام قبل هذا الخير الذي من الله به وكذلك مشائخي ما منهم رجل عرف ذلك فمن زعم من علماء الارض انه عرف معنى لا اله الا الله او عرف معنى الاسلام قبل ذلك الوقت أو زعم من مشائخه ان احدا عرف ذلك فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه. الدرر السنية عن الأجوبة النجدية / حسين بن غنام, رسالة محمد بن عبد الوهاب الى اهل الرياض. تاريخ النجد: 2/137-138.

আমি জ্ঞান অর্জন করলাম, যারা আমাকে শিখিয়েছিল, তারা মনে করেছিল, আমার জ্ঞান অর্জিত হয়েছে৷ অথচ আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে কল্যাণ দান করেছেন, তার পূর্বে আমি ঐ সময় পর্যন্ত লা ইলাহা ইল্লাহা-এর অর্থ জানতাম না এবং জানতাম না ইসলামের মর্মা আমার কোন শিক্ষকও তা জানতেন না৷ ঐসময়ের পূর্বে সারা বিশ্বের উলামাদের মধ্যে যারা মনে করতেন যে, তারা লা ইলাহা ইল্লাহ-এর অর্থ জানেন এবং ইসলাম ধর্মের মর্ম বুঝেন অথবা তাদের কেউ না কেউ তা জানতেন, তাহলে তারা মিথ্যা বলেছে, মিথ্যারোপ করেছে, ও মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে এবং অবাস্তব বিষয়ে নিজেদের প্রশংসা করেছে৷ (আদ-দুরারুস সানিয়াহ হুসাইন বিন গান্নাম, রিসালাতু মুহাম্মাদ বিন ওয়াহহাব ইলা আহলির রিয়াদ, তারিখু নজদ, খ. ২, পৃ. ১৩৭-১৩৮)

ওয়াহাবি মতাদর্শের প্রবক্তা ও প্রচারক মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহাব নজদি ইসলামের যেসব স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে ভুল করেছেন বা তাহরিফ করেছেন তার মধ্যে একটি হলো, তাকফিরের মাসআলা৷ শিরক ও কুফুর সম্পর্কে তাঁর পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় বহু কবিরা, সগিরা গুনাহ এমনকি শরিয়তসিদ্ধ বিষয়গুলোকে শিরকে আকবারে পরিণত করে, সেগুলো দিয়ে তাঁর মতো করে একটি উসুলনামা বানিয়ে সেটাকে ভিত্তি করে মুসলিমদের তাকফির করতেন৷ তাকফিরের ক্ষেত্রে তিনি এতটাই বিচ্যুত ছিলেন যে, তাঁর তাকফিরের তরবারিতে মাথা কাটা যায় বহু স্বনামধন্য আলিম-উলামাসহ নিরীহ মুসলিমদের। ইবনু আবদুল ওয়াহাবের তাকফিরের বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহ. বলেছেন,

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির বিষয়টি হলো, সে ছিল নির্বোধ ও স্বল্পজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি আর সে তাকফিরের হুকুম দেওয়ার

ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করত। [১৪০]

এ অধ্যায়ে আমরা ওয়াহাবি কর্তৃক উম্মতে মুসলিমার তাকফির সংক্রান্ত আরও কিছু নমুনা ওয়াহাবিদের কিতাবাদি থেকে দেখব। তবে এ বিষয়ে আলোচনার আগে আমাদের তাকফির নিয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা রাখা জরুরি। ইসলামি শরিয়তে তাকফিরের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও স্পর্শকাতর একটি বিষয়। এ মাসআলাটি এতটাই সুক্ষ যে, কোনো ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তিকে তাকফির করে, সে তাকফিরের মাধ্যমে উভয় ব্যক্তির মধ্যে যেকোনো একজন কাফির হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে তাকফিরকৃত ব্যক্তি যদি প্রকৃতার্থে কাফির হয়ে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে সে কাফির হবে, অন্যথায় তাকফিরকারী ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। হাদিসে তাকফিরের বিষয়ে স্পষ্ট সতর্কবার্তা উচ্চারণ করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,

إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه

যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে তবে এ কথা দুজন থেকে একজনের ওপর প্রযোজ্য হবে। যদি তার ভাই সত্যিই কাফির হয় তবে ভালো, নইলে যে তাকে কাফির বলল তার ওপরেই কুফুরি প্রযোজ্য হবে।[১৪১]

অন্য রিওয়ায়াতে এ বিষয়ে আরও কঠোর সতর্কতা এসেছে। সাবিত ইবনু দাহহাক রা. বলেন, রাসুল ﷺ বলেন,

من رمى مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتلِه

যদি কেউ কোনো মুমিনকে কুফুরিতে অভিযুক্ত করে, তবে তা তাকে হত্যা করার মতোই (অপরাধ)।[১৪২]

একটি রিওয়ায়াতে রাসুলুল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,

أَيُّمَا رَجُل قَالَ لأَخِيهِ يا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا

যে ব্যক্তি তার ভাইকে বলবে হে কাফির, তখন উভয়ের একজন তাকে স্বীকৃতি দিল (অর্থাৎ, উভয়ের একজন কাফির হয়ে গেল)।[১৪৩]

ইমাম তাহাবি রাহ. লিখেছেন,

আমরা জানতে পারলাম, যে ব্যক্তি তার সাথিকে বলে 'হে কাফির' তার অর্থ সে কাফির কারণ, সে যেটার (যে বিশ্বাসের) ওপর রয়েছে সেটা হলো কুফুর। যদি উক্ত ব্যক্তি যার উপর রয়েছে সেটা কুফর না হয়ে থাকে তাহলে, তাকে কাফির প্রতিপন্নকারী (আসলে) ইমানকে কুফর সাব্যস্ত করে থাকে, আর তার কারণে সে আল্লাহ তাআলার উপর অবিশ্বাসী হয়ে যায় (অর্থাৎ, কাফির হয়ে যায়) কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইমানের বিষয়ে কুফুরি করল, সে আল্লাহর বিষয়ে কুফুরি করল। আর এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১৪৪]

কোনো মুসলিমকে কাফির বলা যে কতটা ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক তা উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে অনুমিত হয়। তাকফির শব্দটির উৎপত্তি كفر থেকে। বাবে তাফয়িলের খাসিয়াত অনুসারে তাকফিরের শাব্দিক অর্থ হলো, কোনো মানুষকে কাফির বলা। কোনো মুসলিম যখন জরুরতে দীনের কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ অস্বীকার করার ফলে দীন থেকে খারিজ হয়ে যায়। সে বিষয়টি উপযুক্ত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয় এবং তার থেকে কোনোপ্রকার সংশয় ছাড়া স্পষ্ট কতয়ি প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন ইসলামি শরিয়ত বিশারদরা বা ফকিহরা উপযুক্ত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে উক্ত ব্যক্তিকে কাফির হিসেবে ঘোষণা দেন। এ পুরো পদ্ধতিটিকে শরিয়তের পরিভাষায় তাকফির বা কাফির সাব্যস্তকরণ বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

১৪০. ফয়জুল বারি : ১/২৫২

১৪১. সহিহ মুসলিম : হাদিস শরিফ ৬০: সহিহ বুখারিঃ হাদিস শরিফ ৬১০৪

১৪২. সহিহ বুখারি : ৬৬৫২

১৪৩. বুখারি শরিফ, হাদিস ৬১০৩

১৪৪. শারহু মুশকিলুল আসার

যে ইমান আনার পর আল্লাহর সঙ্গে কুফুরি করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফুরি দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের ওপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। ওই ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয়; (কুফরি করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ইমানে পরিতৃপ্ত।[১৪৫]

ইমানের শাব্দিক অর্থ সত্যায়ন করা। ইমানের পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে আহলুস সুন্নাহর ইমামরা নানান মত প্রদান করেছেন। ইমাম আজম আবু হানিফা রাহ. ইমানের সংজ্ঞায়নে বলেন, هو التصديق بالجنان و الاقرار باللسان অর্থাৎ, তা হলো হৃদয় দ্বারা সত্যায়ন এবং জিহ্বা দ্বারা স্বীকৃতি। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ গাজালি রাহ. ইমানের সংজ্ঞায়নে বলেন, الايمان هو تصديق النبي ﷺ بجميع ما جاء به অর্থাৎ, ইমান হলো নবি ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

তবে অধিকাংশ আইম্মায়ে আহলুস সুন্নাহর মতে ইমান হলো, التصديق بالجنان و الاقرار باللسان و العمل بالاركان অর্থাৎ, ইমান হলো, অন্তর দ্বারা বিশ্বাস, জিহ্বা দ্বারা স্বীকৃতি এবং আরকানসমূহ কাজে পরিণতকরণ। এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা খুবই জরুরি যে, الاقرار باللسان তথা জিহ্বা দ্বারা স্বীকৃতি এবং العمل بالاركان তথা আরকানসমূহ কাজে পরিণতকরণ এ দুইটি ইমানের অংশ হলেও ইমানের মৌলিক অংশ নয়। ইমানের মৌলিক অংশ হলো হৃদয় দ্বারা বিশ্বাস স্থাপন করা। এ জন্য কোনো মুসলিম যদি কেনো ফরজ আমল পরিত্যাগ করে সে কাফির হয়ে যায় না, বরং পাপিষ্ঠ হয়। তবে সে যদি ওই আমলকে অস্বীকার করে তখন সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ আমল এবং মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের মৌলিক অংশ নয়। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কেবলমাত্র ইকরার ঈমান হতে পারে না। পক্ষান্তরে আমল যদি মৌলিক অংশ হত তাহলে তাসদীকের ন্যায় কেবলমাত্র আমল ঈমান যাবার বা না যাবার মানদণ্ড হয়ে যেত। ফলে কোন ব্যক্তি ফরজ তরক করলে যেমন কাফির হত, তেমনি কোন অমুসলিম ইফতার পার্টিতে গিয়ে হাত উঁচু করলে মুসলিম হয়ে যেত। আবার ইকরার যদি ঈমানের মৌলিক অংশ হত, তাহলে মুনাফিক বলে কিছু থাকত না। অতয়েব দেখা যাচ্ছে, তাসদীক তথা হৃদয় দ্বারা সত্যায়ন হল ঈমানের মৌলিক অংশ। আর ইকরার তথা মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমল ঈমানের অঙ্গ হলেও মৌলিক অংশ নয় বরং তা তাসদীকের উপর নির্ভরশীল। এজন্য আহলে সুন্নাতের ইমামগণ তাসদীক বিল কলবকে ঈমানের শর্ত এবং ইকরার বিল লিসানকে ইজরাউল হুকুম তথা কোন ব্যক্তির উপর মুসলিম বা কাফির হবার হুকুম লাগানোর শর্ত হিসেবে পরিগণিত করেছেন, যেহেতু মানুষের হৃদয় চিরে ঈমান দেখার ক্ষমতা আমাদের নেই। আর আমলকে আহলে সুন্নাতের ইমামগণ কেবলমাত্র ঈমানের পূর্ণতা দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত করেছেন। কেও যদি কোন আমল করে যা বাহ্যিকভাবে কুফর হয়, তার ক্ষেত্রে সেজন্য হুজ্জাত কায়েম অবশ্যক তথা তার হৃদয়ের সত্যতাকে ইকরার তথা তার নিকট হতে ব্যখ্যা নেবার মাধ্যমে তার উপর হুকুম দেওয়া জরুরি।

পক্ষান্তরে খারেজীরা আমলকে ঈমানের মৌলিক অংশ বা শর্ত হিসেবে পরিগণিত করে। বিধায় তাদের নিকট ফরজ তরককারি বা কাবিরা গুনাহকারী কাফির হিসেবে পরিগণিত হয়। ইমাম মোল্লা আলি কারী রাহ. তাঁর শরহুল ফিকহিল আকবর গ্রন্থে বলেছেন,

أما العمل بالاركان فهو من كمال الايمان و جمال الاحسان عند اهل السنة و الجماعة و و شرط او شطر عند الخوا.رج و المعتزلة

অর্থঃ আর আমলের বিষয়টি হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট তা ঈমানের পূর্ণতা ও ইহসানের সৌন্দর্য এবং খাওয়ারিজ ও মুতাজিলাদের নিকট তা (ঈমানের) শর্ত বা মৌলিক অংশ।[১৪৬]

অতয়েব দেখা যাচ্ছে আমাদের আহলে সুন্নাতের নিকট কোনো মুসলিম থেকে যদি কুফুর প্রকাশিত হয়ে থাকে সেটা দেখেই তাকে কাফির বলে দেওয়া যাবে না বা তাকফির করা হবে না; বরং সর্বাগ্রে হুজ্জাত কায়িম করে তার কুফুরটি আসলে সে জেনে-বুঝে করেছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াটা জরুরি। যেহেতু ইজরাউল হুকমের জন্য শর্ত হল ইকরার বিল লিসান তথা উক্ত ব্যক্তির ব্যখ্যা আদায়ের মাধ্যমে তার তাসদীক বিল কলবের তথা হৃদয়ের সত্যায়নের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। অতএব, কোনো ব্যক্তি থেকে ভুলবশত বা কোনো কারণে কুফুর প্রকাশ পেলে এবং তার নিয়ত কুফুরি করা না হলে তাকে তাকফির করা হবে না। তাকফিরের ক্ষেত্রে শরয়ি কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেগুলোকে শরয়ি পরিভাষায় মাওয়ানিউত তাকফির বলা হয়ে থাকে। এই সকল মাওয়ানিগুলো তাকফির করার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে থাকে, যেমন : মূর্খতাবশত

১৪৫. সুরা নাহল : ১০৬

১৪৬. শরহুল ফিকহিল আকবর, পৃষ্ঠা ১১৭

কুফুরি কথা বলে ফেলা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুফুরি প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি। কোনো ব্যক্তি থেকে কুফুরি প্রকাশ পাওয়ার পর তার মধ্যে মাওয়ানিসমূহের মধ্যে কোনো মাওয়ানি পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে কোনো মুসলিমকে তাকফির করা হবে না।

তাকফিরের ক্ষেত্রে আমাদের আইম্মায়ে কিরামরা ও আসলাফরা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন। অধিকাংশ ফুকাহায়ে আহনাফের মতে, 'কারও থেকে কোনো কুফুরি প্রকাশ পেলে তার সকল কারণ কুফুরি হওয়ার পরও একটি কারণ যদি তাকফিরের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে সকল কারণ ছেড়ে ওই একটি কারণকে প্রাধান্য দিতে হবে।' যেমন : ইমাম ইবনু কাজি সামাওয়া রাহ. বলেছেন,

> জেনে রাখো, এ মাসআলায় যদি কিছু কারণ কুফরিকে অবশ্যক করে তোলে এবং একটি কারণ যদি তাকফিরে বাধা দেয়, তাহলে মুফতির উচিৎ মুসলিমটির ওপর সুধারণা রেখে ওই কারণটির দিকে ঝোঁকা যেটি তাকফিরকে বাধাপ্রদান করে।

মুল্লা আলি কারি রাহ. অপর মুসলিমকে তাকফিরকরণের বিষয়ে বলেন,

> যদি (তাকফিরের ক্ষেত্রে) নিরানব্বইটি কারণ পাওয়া যায় যা কোনো মুসলিমের তাকফিরের দিকে ইশারা করে এবং একটি মাত্র কারণ পাওয়া যায় যা তার ইসলামের উপর বাকি থাকার দিকে ইঙ্গিত করে, সে ক্ষেত্রে মুফতি ও কাজির উচিৎ ওই একটি কারণের উপর আমল করা (অর্থাৎ, তাকফির করা থেকে বিরত থাকা)।[১৪৭]

একজন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে তাকফির করা যে কতটুকু গুরুতর তা ইমাম কাজি আয়াজ রাহ.-এর একটি বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। তিনি মুহাক্কিকিনদের থেকে উদ্ধৃত করেছেন,

> সহস্র কাফিরকে ছেড়ে দেওয়ার ভুলটি একজন মুসলিমের রক্তপাত করা থেকে লঘুতর জিনিস।[১৪৮]

ইমাম আবু হামিদ গাজালি রাহ. লিখেছেন,

> সহস্র কাফিরকে জিবনসহ ছেড়ে দেওয়ার ভুলটি একজন মুসলিমের রক্তপাত করা থেকে লঘুতর জিনিস।[১৪৯]

ইমাম ইবনু আবিদিন শামি রাহ. লিখেছেন,

> যদি মাসআলাটিতে কয়েকটি কারণ থাকে যা (কোনো মুসলিমের) কুফুর আবশ্যক করে এবং একটি কারণ পাওয়া যায় যা তা থেকে বাধা দেয়, তবে মুফতির জন্য উচিৎ হলো, তিনি মুসলিমটির বিষয়ে সুধারণা রাখতে ওই কারণটির পক্ষে যাবেন যা তাকফির থেকে বাধাপ্রদান করে।[১৫০]

কোনো অমুসলিম যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে ইসলামকে কবুল করে তখন সে মুসলিম হিসেবে পরিগণিত হয় এবং সে ততক্ষণ মুসলিম থাকে যতক্ষণ না এর বিরুদ্ধে না যায়। অর্থাৎ, তার মধ্য থেকে স্পষ্ট তাকফিরের কারণ পাওয়া না যায়। আবার কোনো মুসলিম থেকে যদি কখনো কোনো কুফুরি কথা বা কাজ প্রকাশ পায় সে ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে শরিয়ত। এ ক্ষেত্রে শরয়ি উসুল হলো, اليقين لا يزول بالشك। অতএব, নূন্যতম সন্দেহের কারণে কাউকে তাকফির করা যাবে না। শরিয়তের বিধান হলো, যখন কোনো মুসলিম থেকে কোনো কুফুরি প্রকাশ পায় তখন হুজ্জত কায়িম করতে হবে। অর্থাৎ, তার থেকে এটা প্রমাণ করতে হবে, সে সজ্ঞানে ও শরয়ি কোনো মাওয়ানি ছাড়া কুফুরি করেছে। যতক্ষণ না হুজ্জত কায়িম করা হবে অর্থাৎ, যার থেকে কুফুরি প্রকাশ পেয়েছে তার থেকে কুফুরির বিষয়ে যাচাই করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকফির করা বৈধ নয়। প্রখ্যাত হানাফি ফকিহ ইমাম ইবনু কাজি সামাওয়া রাহ. এ বিষয়ে আইম্মায়ে কিরামের মত লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে তিনি ইমাম তাহাবি রাহ.-এর বরাত দিয়ে উপরোক্ত উসুলটি উল্লেখ করে বলেন,

> ইমাম তাহাবি রাহ., ইমাম আবু হানিফা রাহ. ও আমাদের বেশ কিছু ইমামদের থেকে নকল করেছেন, 'মানুষ ইমান থেকে ওই সমস্ত জিনিস অস্বীকারের কারণে বের হয়ে যায়, যে সমস্ত জিনিসের কারণে সে ইমানে প্রবেশ করেছিল। এরপর যেসব জিনিসের কুফুর ও ইরতিদাদ হওয়ার ইয়াকিন স্থাপিত হয়, তার ভিত্তিতে তাকফিরের হুকুম লাগানো হবে, যেসব বিষয়ে সন্দেহ থাকে তার ওপর ভিত্তি

১৪৭. শারহুশ শিফা : ২/৫০২
১৪৮. আশ-শিফা : ২/২৭৭
১৪৯. আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ : ২৬৯
১৫০. হাশিয়া : ৪/২২৪

www.muslimdm.com

> করে (তাকফিরের) হুকুম লাগানো যাবে না কারণ, প্রমাণিত ইসলাম সন্দেহ দ্বারা শেষ হয়ে যায় না...[১৫১]

কোনো মুসলিমকে বিনা কারণে বলপূর্বক কাফির প্রতিপন্ন করে তার রক্ত হালাল মনে করা একটি জঘন্যতম অপরাধ। ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দিন শাফিয়ি রাহ. মুসলিমকে তাকফির করার অপরাধের গুরত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেন,

> কোনো নির্দিষ্ট মুসলিমকে অভিশাপ দেওয়া হারাম আর তার থেকে কঠিন অপরাধ হলো, তাকে কুফুরি ও ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবার অপবাদ দেওয়া।[১৫২]

তাকফিরের মতো স্পর্শকাতর বিষয়টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকা জরুরি। যারা আলিম নন বা তাকফির সম্পর্কে যাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই, তাদের জন্য কর্তব্য হলো, তাকফিরের মাসআলা থেকে দূরে থাকা; বরং তাদের শরয়ি বিষয়ে কথা বলা বা অভিমত দেওয়া থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন।

এ পর্যন্ত আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাকফির কাকে বলে, তাকফিরের অপপ্রয়োগের ভয়াবহতা ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামরা কর্তৃক এ মাসআলায় সর্বোচ্চ সতর্কতার তাকিদ ইত্যাদি জানতে পারলাম। এবার আমরা ওয়াহাবি তাকফিরিদের কর্তৃক তাকফিরের অপপ্রয়োগ, শরিয়তে তাদের বিকৃতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব।

১. ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের কাছে ইলমুল ফিকহ ছিল শিরক

ইলমুল ফিকহ ইসলামি শরিয়তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাস্ত্র। কুরআন-সুন্নাহে সব বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত নেই। সে কারণে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুজতাহিদিনরা কুরআন-সুন্নাহসহ শরয়ি দালায়িল ও উসুলের ভিত্তিতে ইজতিহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা অথবা মাসআলার সমাধান দিয়েছেন, যাতে মুসলিমরা সহজে শরিয়তের ওপর নির্ভুলভাবে আমল করতে পারে। ইলমুল ফিকহ বলা হয় ওই শাস্ত্রকে, যাতে শরিয়তের বিভিন্ন ইজতিহাদকৃত আহকাম ও মাসআলাসমূহের সংক্ষিপ্ত বা বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়। ইলমুল ফিকহের মূল ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। এ জন্য ইমাম শাফিয়ি রাহ. বলেছেন, 'আইম্মায়ে কিরামরা যা বলেছেন তার সবটাই সুন্নাহর ব্যাখ্যা আর সুন্নাহর সব শরাহ কুরআনের ব্যাখ্যা।'[১৫৩]

ইসলামি শরিয়তে ফিকহ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর যুগ থেকে এ শাস্ত্রের সূত্রপাত এবং যুগে যুগে মুজতাহিদিনরা সমসাময়িক সমস্যাবলীর কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে মানুষের কাছে সহজভাবে সমাধান করেছেন। এটাই ফিকহ। ফিকহ ছাড়া জনসাধারণের জন্য শরিয়তকে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। বিখ্যাত হানাফি ফিকহ গ্রন্থ 'ফাতওয়ায়ে শামি' এর ভূমিকায় ফিকহের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'ফিকহ ছাড়া উম্মতে মুসলিমা বেঁচে থাকতে পারে না। যেহেতু হারাম ও হালালের কেন্দ্রভূমিই হলো এটি (অর্থাৎ ফিকহ)।'[১৫৪]

ফিকহের সংজ্ঞায়নে ইমাম আলাউদ্দিন হাসকাফি রাহ. বলেন, 'ফিকহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোনোকিছু সম্পর্কে জানা। পরে শরয়ি বিষয়াদি জানার সঙ্গে শব্দটি বিশেষ হয়ে যায়।'[১৫৫]

ইমাম আবু হামিদ আল-গাজালি রাহ. ফিকহ সম্পর্কে বলেন, 'তা হলো একটি শরয়ি শাস্ত্র কারণ তা নবুওয়াত থেকে (কুরআন-সুন্নাহ) নেওয়া হয়েছে।'[১৫৬]

---

১৫১. জামিউল ফুসুলাইন : ২/১৬৩
১৫২. আর-রাদ্দুল ওয়াফির : ১১
১৫৩. আল-ইকলিল : ১১।
১৫৪. ফাতওয়ায়ে শামি : ১/২২
১৫৫. ফাতওয়ায়ে শামি : ১/১১৮
১৫৬. ইহয়াউ উলুমিদ দীন : ১/১৯

ইসলামের প্রথম যুগে ইলমুল ফিকহ বলতে ইলমুশ শরিয়া তথা আকিদা, ফুরুয়ি ও তাসাউফশাস্ত্র সমন্বিত ইলমকে বোঝাত। এ জন্য ইমামে আজম আবু হানিফা রাহ. ফিকহের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'ফিকহ হলো নাফসের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস ও তার জন্য ক্ষতিকর জিনিস জানার নাম।'[১৫৭]

পরবর্তীতে খলিফা মামুনের জামানায় আকিদা ও ফিকহকে দুটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে রূপ দেওয়া হয়। ফলে আকিদা শাস্ত্রকে কালামশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। যেমন : ইমামুল হুদা আবু মানসুর মাতুরিদি রাহ. প্রণীত কিতাবুত তাওহিদ হলো, কালামশাস্ত্রের এক অনন্য সৃষ্টি। আর ফুরুয়ি মাসায়িল সংক্রান্ত শাস্ত্রের নামকরণ করা হয় ইলমুল ফিকহ বা ফিকহশাস্ত্র। ফিকহ শিখা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজে আইন। রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,

طلب العلم فريضة على كلّ مسلم
জ্ঞানান্বেষণ প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ।

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আইম্মায়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত হলো, প্রয়োজনীয় শরয়ি হুকুম-আহকাম শিক্ষা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ। আর শরয়ি হুকুম-আহকাম যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়, তার নামই ইলমুল ফিকহ। কিন্তু ওয়াহাবিদের ধর্মগুরু মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি মনে করতেন ফিকহ হলো শিরক।

সাধারণত কুরআন-সুন্নাহ থেকে মাসআলা ইসতিম্বাত করা সাধারণ মুসলিম বা আলিম-উলামাদের জন্য একটি দুরূহ কাজ। তাই অধিকাংশ মুসলিম ও উলামায়ে কিরামরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি মসআলা ইসতিম্বাতে অক্ষম হওয়ার কারণে তারা দীনের মাসআলা-মাসায়িলের বিষয়ে ফিকহের ওপর নির্ভর করতেন। ইবনু আবদুল ওয়াহহাব এ বিষয়টিকে ফিকহের ইবাদত মনে করলেন। তিনি কুরআনে অমুসলিমদের বিষয়ে অবতীর্ণ একটি আয়াত উদ্ধৃত করে তার অপব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক ফরজ একটি ইলমকে শিরক বানিয়ে ফেলেছেন। ইবনু আবদুল ওয়াহহাব বলেন,

> ...তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পণ্ডিত ও ধর্ম যাজকদের রব বানিয়ে নিয়েছে। সুরা তাওবা : ৩১; রাসুলুল্লাহ সাঃ ও তাঁর পরবর্তী সময়ে ইমামরা আয়াতটি ওটা দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন যেটাকে তোমরা ফিকহ বলো, এ অবস্থায় যে সেটাকে আল্লাহ তাআলা শিরক বলেছেন...।[১৫৮]

নজদি কুরআন মাজিদের আয়াত আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের আলিম আর দরবেশদের রব বানিয়ে নিয়েছে উল্লেখপূর্বক ইলমুল ফিকহকে শিরক প্রতিপন্ন করেছেন; অথচ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ইয়াহুদি ও খৃষ্টানদের বিষয়ে যারা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে তাদের পথভ্রষ্ট ধর্মগুরু যারা বৈধকে অবৈধ প্রতিপন্ন করত এবং অবৈধকে বৈধ প্রতিপন্ন করত। আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

> তারা (অর্থাৎ, ইয়াহুদি-খৃষ্টানরা) তাদের উলামাদের আদেশ-নিষেধকে ঐরকমভাবে মানত যেভাবে একজন দাস তার রবের আদেশ মানে। ফলে (ওইসব রাব্বি বা পাদ্রীরা) যা আল্লাহ হালাল করেছেন তা হারাম প্রতিপন্ন করল আর যা তিনি হারাম করেছেন তাকে হালাল করল।[১৫৯]

প্রথমত, ইবনু আবদুল ওয়াহহাব কুফফারদের ব্যাপারে আসা আয়াতটি মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করলেন। আর খারেজিদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তারা কাফির মুশরিকদের বিষয়ে আসা আয়াত মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, তিনি আয়াতটি ইলমে ফিকাহকে শিরক প্রমাণ করতে ব্যবহার করেছেন, যে অকাজ কখনো কোনো মুসলিম ইমাম করেননি।

এ ছাড়া ইবনু আবদুল ওয়াহাব নজদির শৈশব থেকে ফিকহের প্রতি ছিল অনীহা। তিনি বিদ্যার্থী জীবন থেকে ফিকহ চর্চার প্রতি ছিলেন বিতৃষ্ণ। এ কারণে তাঁর পিতা তাঁর উপর বেজায় রুষ্ট ছিলেন। ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ফিকহ চর্চায় অবহেলার জন্য তাঁর পিতার কাছে প্রায়শই ধমক

১৫৭. শারহুত তালবিহ আলাত তাউজিহ : ১/১৬
১৫৮. আদ-দুরারুস সানিয়াহ ফিল আজওয়াবাতিন নাজদিয়া : ২/৫৯
১৫৯. রুহুল বায়ান : ৩/৪৩৬

খেতেন বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়।

ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সমসাময়িক নজদের সুপ্রসিদ্ধ আলিম ইবনু হুমায়দ হাম্বলি নজদি রাহ. বলেন, '... তিনি (শায়খ আবদুল ওয়াহহাব) তাঁর ছেলে মুহাম্মাদের প্রতি তার পূর্ববর্তীরা ও সমসাময়িকগণের অনুরূপ ফিকহ চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে রাজি না হওয়ার কারণে রুষ্ট ছিলেন এবং তার (নিজের ছেলের) বিষয়ে তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন যে, তার মাধ্যমে খারাপ জিনিস সংঘটিত হবে। তিনি মানুষদের বলতেন, তোমরা একদিন মুহাম্মাদের মাধ্যমে খারাপ জিনিস (ঘটতে) দেখবে।'[১৬০]

ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব কর্তৃক ফিকহ শাস্ত্রের বিরোধিতা ও ফিকহের অবমাননার বিষয়টি উঠে এসেছে ইমাম আব্দুল্লাহ আয যুবাইরী আল হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত আস সাওয়াইকের ৯৭ পৃষ্ঠাতে।

২. যারা ওয়াহাবি মতাদর্শ গ্রহণ করত না তাদের তাকফির

ইতিহাস পর্বে আমরা দেখেছি, যারা ওয়াহাবিদের মতাদর্শ গ্রহণ করত না অথবা যারা তাদের বিরোধিতা করত তাদের তারা তাকফির করত এবং কাফির-মুশরিক ফাতওয়া প্রদানপূর্বক তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল মনে করত। এমনকি কেবল ওয়াহাবি মতাদর্শ গ্রহণ না করার কারণে তারা সাধারণ মুসলিমদের গণহারে তাকফির করত। এভাবে তারা মক্কা, মদিনা, হিজাজ, নজদ, ইরাকসহ এক বিরাট আরবি জনপদের মুসলিমদের তাকফির করেছিল এবং সেসব জায়গায় বর্বর গণহত্যা চালিয়েছিল। আমরা যদি ওয়াহাবি মতাদর্শী আলিম ও ওয়াহাবিদের ইমাম ইবনু বাসসাম ও ইবনু বিশরের বইগুলো গভীরভাবে পাঠ করি সেখানে এ বিষয়ে বহু দলিল-প্রমাণ পাব। সেখানে আমরা দেখতে পাব যে, ওয়াহাবিরা কীভাবে কেবল ওয়াহাবি মতাদর্শ পরিত্যাগকে ধর্মত্যাগ বলে নিরীহ মুসলিমদের তাকফির করেছিল। তারা মনে করত, ওয়াহাবি মতাদর্শের অনুসারীদের দখলে থাকা এলাকাগুলো হলো দারুল ইসলাম এবং বাকি মুসলিমবিশ্বকে তারা দারুল হারব বা দারুল কুফর মনে করত। তাদের কাছে উসমানি সাম্রাজ্য ছিল মুশরিক ও রোমক কাফির রাষ্ট্র। যেমন : ওয়াহাবিদের ইমাম ও ইতিহাসবিদ আবদুল্লাহ আলে বাসসাম আরব হাজিদের হজ বয়কট প্রসঙ্গে লেখেন,

> রোম সাম্রাজ্যের (উসমানিয় সাম্রাজ্যের) শাসনাধীন বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষেরা হজ করতে এল না। না শাম থেকে, না মিসর থেকে না ইরাক থেকে। অনুরূপভাবে ঐসকল সাম্রাজ্য থেকে যা ইসলামের শাসনাধীন (দারুল ইসলাম) ছিল না সানা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা, মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে।[১৬১]

ওয়াহাবিরা উসমানি খিলাফতের অধীনস্থ ইরাক, সিরিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য করত না। কারণ, তাদের কাছে উসমানি সাম্রাজ্য ছিল ইসলাম পূর্ব রোমকদের মতো মুশরিক সাম্রাজ্য। এমনকি উসমানি সাম্রাজ্যের অধীনস্থ মক্কাকেও তারা দারুল কুফর হিসেবে পরিগণিত করত। হিজাজ ও নজদবাসী নিরীহ মুসলিমদের আমভাবে তাকফির করার কারণে তখনকার নজদ ও হিজাজের উলামায়ে কিরামরা ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। ওয়াহাবি কর্তৃক রিয়াদবাসীকে আমভাবে তাকফির করণের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, সে যুগের প্রখ্যাত হাম্বলি ইমাম ও মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুহ ইবনু ফিরুজ হাম্বলি আহসায়ি। তিনি ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে একাধিক রিসালা লিখেছেন।

রিয়াদবাসীকে আমভাবে তাকফিরের বিরুদ্ধে লেখা রিসালায় ইবনু আবদুল ওয়াহহাব কর্তৃক নিরীহ মুসলিমদের তাকফিরের বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন,

> আর সমস্ত লোক যাদের ইবনু আবদুল ওয়াহহাব তাকফির করেছিল, তারা আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে মসজিদগুলো আবাদ করতেন।[১৬২]

ওয়াহাবি ইতিহাসবিদ ইবনু গানাম কেবল ওয়াহাবি মতাদর্শ পরিত্যাগের কারণে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব কর্তৃক আরবি মুসলিমদের তাকফিরের

---

১৬০. আস-সুহুবুল ওয়াবিলা : ২৭৫।

১৬১. খিজানাতুত তাওয়ারিখিন নাজদিয়া : ১/২৩৫-২৩৬

১৬২. আর রদ্দু আলা মান কাফফারা আহলার রিয়াদ্ব ওয়া মান হাওলাহু মিনাল মুসলিমীন, পৃষ্ঠা ৩৬

বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যেখানে ওয়াহাবি মতাদর্শ ত্যাগ করাকে তিনি ধর্মত্যাগ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন,

> এ বছরের (১১৬৫ হিজরি) শাওয়াল মাসে হুরায়মালাবাসী মুরতাদ হয়ে গেল, এ সময় সেখানকার কাজি ছিল শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের ভাই সুলায়মান ইবনু আবদুল ওয়াহহাব। শায়খ যখন জানতে পারলেন যে, তার ভাই ফিতনা ছড়াচ্ছেন এবং মানুষের মধ্যে সন্দেহ ছড়াচ্ছেন তখন তিনি তাঁকে চিঠি লিখলেন...[১৬৩]

প্রকৃত ঘটনা ছিল হুরায়মালাতে যখন ওয়াহাবিরা ফিতনা ছড়াচ্ছিল তখন সেখানকার কাজি ও হাম্বলি মাজহাবের প্রসিদ্ধ আলিম শায়খ সুলায়মান ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি তাঁর আপন ভাইয়ের বাতিল দাওয়াতের বিরুদ্ধে মানুষকে দাওয়াত দিতে থাকেন। ফলে হুরায়মালাবাসী তাদের যারা ওয়াহাবিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল, তারা নিজেদের ত্রুটি বুঝতে পেরে রুজু করেন এবং ওয়াহাবি মতাদর্শের বিরুদ্ধে চলে যান। এ ঘটনাকে উক্ত ইতিহাসবিদ ইরতাদ হিসেবে অভিহিত করলেন। এ রকম বহু বহু উদাহরণ উপরোক্ত খিযানা ও তারিখু নজদ বইদ্বয়ে মিলবে। সবকটি উল্লেখ করতে গেলে অধ্যায় গ্রন্থের রূপ লাভ করবে। পাঠকমন্ডলী বইদুটি কিনে অথবা ডাউনলোড করে পড়ে দেখতে পারেন।

ওয়াহাবিদের নির্ভরযোগ্য ফাতওয়ার বই হলো, 'আদ-দুরাসুস সানিয়া ফিল আজওয়াবাতিন নজদিয়া'। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, এ গ্রন্থে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের বিভিন্ন ফাতওয়ার সমাহার ঘটানো হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের দশম খণ্ডের ১৪৩-১৪৪ পৃষ্ঠায় একটি প্রশ্ন করা হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি ইসলাম (ওয়াহাবি মতাদর্শ) গ্রহণ করে, এরপর তার আগের ধর্মের (আহলুস সুন্নাহর) আমল জারি রাখে ও দাবি করে যে তার পিতামাতা ইসলামের ওপর ইনতিকাল করেছে সে কি মুসলিম থাকবে নাকি মুরতাদ হয়ে যাবে? প্রশ্নটির উত্তরে বলা হচ্ছে,

> এ ব্যক্তি যদি এটা বিশ্বাস করে যে, তার পিতামাতা ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু যেসব শিরকের বিষয়ে আমরা নিষেধ করেছি (ওয়াহাবিরা নিদা, তাওয়াসসুল, তাবাররুক, শাফাআত ইত্যাদি বৈধ জিনিসকে শিরক বলত। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিশদ আলোচনা করা হবে) তা না করে, তাহলে তার কুফুরের হুকুম দেওয়া হবে না। আর যদি তার উদ্দেশ্য এটা হয় যে, এ শিরক যা থেকে আমরা মানুষকে নিষেধ করেছি সেটা ইসলাম, তাহলে সে কাফির।

এখানে ফাতওয়াটি মূলত তদানীন্তন ওই সকল মুসলিমদের ব্যাপারে দেওয়া হয়, যারা ওয়াহাবি মতাদর্শ গ্রহণ করত; কিন্তু সেই সঙ্গে এটা ধারণা রাখত যে, তার পিতামাতা ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছে। আর ওয়াহাবি মতাদর্শ গ্রহণ করার পরও যারা আহলুস সুন্নাতের বৈধ জিনিস যেমন : তাওয়াসসুল, তাবাররুক, শাফাআত ইত্যাদি বৈধ মনে করত। এ ধরনের লোকদের ওয়াহাবিরা কাফির হিসেবে অভিহিত করত। এখানে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়, ১. ওয়াহাবিরা তাদের পূর্ববর্তী যারা এ বাতিল মতাদর্শ গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করেছিল, ওই সকল মরহুম মুসলিমদেরও তারা কাফির মনে করত। ২. একই সঙ্গে তাদের মতাদর্শবিরোধী; অথচ ইসলামে বৈধ এমন জিনিস বৈধ মনে করলে, তারা তাদের কাফির বলত।

এখানে পাঠকমন্ডলী ভাবতে পারেন ফাতওয়াটি হয়তো নওমুসলিমের বিষয়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এটা ভুল ধারণা। কারণ, কোনো হিন্দু বা অমুসলিম ইসলাম গ্রহণের পর কখনোই এটা বিশ্বাস করবে না যে, তার হিন্দু পূর্বপুরুষ মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে অথবা ঠাকুর পূজা এগুলো বৈধ। মূলত এ ফাতওয়াটি ওই সকল মুসলিমদের ব্যাপারে ছিল, যারা আহলুস সুন্নাহ ছেড়ে এই খারিজি ওয়াহাবি মতাদর্শ গ্রহণ করেছিল। উক্ত বইয়ের পরবর্তী পৃষ্ঠায় আরেকটি প্রশ্ন এমন ছিল যে, কোনো এক শহরে যেখানে ওয়াহাবি দাওয়াত পৌঁছেছে; অথচ সেখানকার মানুষ যদি তা গ্রহণ না করে এটা ধারণা রাখে যে, 'এই দাওয়াতের (অর্থাৎ, ওয়াহাবি দাওয়াতের) আগে তারা পথভ্রষ্টতার ওপর ছিল না' অথবা তারা 'মুয়াহহিদিন (তথা ওয়াহাবিদের) রদ করে যখন তারা বলে যে, আমরা বাপ-দাদার ধর্ম (অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাহ) থেকে বারাআত ঘোষণা করছি' অথবা তারা ওয়াহাবিয়াতের নিন্দা করে এবং তাকে 'মুসায়লামার ধর্ম' বলে আখ্যায়িত করে তাদের বিষয়ে হুকুম কি হবে? উত্তরে বলা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে হুকুম হলো, কুফফারদের হুকুমের অনুরূপ অর্থাৎ, তারা কাফির।

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির বিভিন্ন চিঠিপত্র 'আর-রাসায়িলুশ শাখসিয়া' নামক একটি বইয়ে সংকলিত করা হয়েছে। বইটির চিঠিপত্রগুলো অধ্যায়ন করলে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের তাকফিরি চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। তিনি তাঁর চিঠিপত্রের জায়গায় জায়গায় আমভাবে নজদ ও হিজাজের আরব মুসলিমদের বিরুদ্ধে শিরকের অপবাদ দিয়ে তাকফির করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বইয়ের ২৯২ পৃষ্ঠায় তিনি শাকরাবাসীর কাছে লিখিত একটি চিঠিতে, জুরমা ও হুরায়মালাবাসীকে আমভাবে মুরতাদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ৩২২ পৃষ্ঠায়

১৬৩. তারিখু নজদ : ১০৬

তিনি কাসিমবাসীকে আমভাবে তাকফির করেছেন।

ওয়াহাবি আবদুর রহমান ইবনু হুসাইন ছিলেন ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের পৌত্র এবং একই সঙ্গে তিনি ওয়াহাবিদের একজন স্বনামধন্য ইমামও। তিনি মুসলিম আলিম-উলামাদের তাকফির করে বলেন যে, তারা তাওহিদ জানে না। তাঁর ভাষায়,

> শহরসমূহের অধিকাংশ উলামারা আজ—মুশরিকরা তাওহিদের যা স্বীকৃতি দিত—তার বেশি কিছু জানে না।[১৬৪]

তিনি এখানে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, তদানীন্তন উলামারা মুশরিক ছিলেন এবং তারা তাওহিদের বিষয়ে কোনো ধারণা রাখতেন না। এর কারণ হলো তারা ওয়াহাবিদের ব্যাখ্যাকৃত তাওহিদের অনুসরণ করতেন না।

ওয়াহাবিরা তদানীন্তন মক্কা-মদিনা ও হিজাজের মুসলিমদের তাকফির করে ক্ষান্ত হয়নি। ওই সকল আরব মুসলিম যাদের ওয়াহাবিরা মুশরিক মনে করত, তাদের যারা তাকফির করত না ওই সকল মুসলিমদেরকেও ওয়াহাবিরা তাকফির করত। ওয়াহাবিদের ফাতওয়ার বইয়ে বলা হয়েছে,

> যে উসমানি খিলাফতের মুশরিকদের এবং মক্কাবাসীর মতো কবর পূজারিদের (যেহেতু তারা তাওয়াসসুল, তাবাররুক, শাফাআত ইত্যাদি করতেন তাই আমভাবে মক্কাবাসী ও অন্যান্য আহলুস সুন্নাতের মুসলিমদের তাকফির করে তারা) ও তারা ছাড়া অন্যান্যদের মতো সৎ ব্যক্তি পূজারিদের—যারা আল্লাহর একত্ববাদ থেকে শিরকের দিকে ফিরে এসেছে এবং রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর সুন্নাহকে বিদআতের মাধ্যমে পরিবর্তন করেছে তাদের যে তাকফির করবে না সেও কাফির।[১৬৫]

এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ওয়াহাবিরা আমভাবে উসমানি সাম্রাজ্য, মক্কা ও অন্যান্য দেশের মুসলিমদেরই তাকফির করেনি, তাদের যারা কাফির মনে করত না তাদেরও তারা কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করত।

উপমহাদেশের আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের বিখ্যাত ইমাম নবাব সিদ্দিক হাসান খান তাঁর বইয়ে—ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির বইয়ে তাকফিরের—বিষয়টি আলোচনা করেছেন। ইয়ামেনের বিশিষ্ট আলিম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল আস-স্বনয়ানী (محمد بن اسماعيل الصنعاني) রাহ.-এর ওয়াহাবিদের সমর্থন থেকে রুজু করার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে লেখেন,

> তাঁর জামানায় শায়খ ইবনু আবদুল ওয়াহাব নজদি আবির্ভূত হন যার দিকে ওয়াহাবি সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করা হয়। তিনি (স্বনয়ানী) সে বিষয়ে একটি কাব্য রচনা করেন সেটি তাঁর (নজদির) কাছে পাঠান এবং তাঁর মতবাদের প্রসংশা করেন। এরপর যখন তিনি (স্বনয়ানী) শুনলেন যে, তিনি (নজদি) দুনিয়াবাসীকে তাকফির করেন এবং (অবৈধভাবে) খুনাখুনি করেন, তিনি কাসিদার মধ্যে যা বলেছিলেন তা থেকে রুজু করেন।[১৬৬]

ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি মনে করতেন, তাঁর আগের আলিমরা ও মুসলিমরা তাওহিদের মর্মার্থ বুঝতেন না। ফলে তিনি তাদের শিরকের দায়ে অভিযুক্ত করতেন এবং তাকফির করতেন। নজদি তাঁর আগের মাশায়িখদের তাওহিদ সম্পর্কে অজ্ঞতার অভিযোগ তাঁর একটি পত্রে উঠে এসেছে। পত্রে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি বলেন, আরিজবাসী ও অন্যান্য জায়গার উলামারা এমনকি উলামাদের শায়খরাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ বুঝত না। যেহেতু তারা ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের তথাকথিত তাওহিদ ও ইসলামের ওপর ছিলেন না। ইবনু আবদুল ওয়াহহাব বলেন,

> আমার মাশায়িখদের মধ্যে কেউ তা (অর্থাৎ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মর্ম) জানতেন না। অতএব, আরিজের উলামাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মনে করেন যে, তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মর্ম বোঝেন অথবা এ সময়ের আগে ইসলামের অর্থ জানতেন অথবা ধারণা করেন যে, তাদের মাশায়িখরা তা জানতেন সে মিথ্যা বলল ও রটনা রটাল। মানুষকে সন্দেহের মধ্যে ফেলল এবং নিজের প্রসংশা করল যার যোগ্য সে নয়।[১৬৭]

---

১৬৪. ফাতহুল মাজিদ : ৭৬

১৬৫. আদ-দুরাসুস সানিয়া : ৯/২৯১

১৬৬. আবজাদুল উলুম : ৩/১৯৩

১৬৭. আদ-দুরারুস সানিয়া : ১০/৫১

বিখ্যাত তিন ওয়াহাবি ইমাম শায়খ ইবরাহিম ইবনু আবদুল লতিফ, আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল লতিফ ও সুলায়মান প্রণীত 'ইজমাউ আহলিস সুন্নাতিন নাবাবিয়া আলা তাকফিরিল মুআত্তিলাতিল জাহমিয়া' বইয়ের পাতায় পাতায় আমভাবে মুসলিমদের তাকফির করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১৬২ পৃষ্ঠায় একাধারে আবুধাবি, দুবাই ও ইবাজিয়াদের আমভাবে তাকফির করা হয়। এ ছাড়া 'আদ-দুরারুস সানিয়া' বইয়ের প্রথম খণ্ডের ৩৮৩ থেকে ৩৮৫ পৃষ্ঠায় মিসর, ইয়ামেন ও শামি মুসলিমদের ওপর শিরক ও কুফুরির অপবাদ দিয়ে তাদের আমভাবে তাকফির করা হয়েছে।

ওয়াহাবি কর্তৃক তাদের মতাদর্শ ছাড়া বাকি মুসলিমদের তাকফির করার বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়, ইবনু সৌদের পরামর্শদাতা ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সেন্ট জন ফিলবির বই থেকেও। জন ফিলবির বিষয়ে আমরা ইতিহাস পর্বে আলোচনা করেছি এবং জেনেছি যে, তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ জায়নবাদী। ইবনু সৌদের পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর তিনি ওয়াহাবি মতাদর্শ গ্রহণ করেন। ফিলবির প্রতিটি বই ওয়াহাবিদের বর্বরতার সাক্ষ্য বহন করে। ফিলবি ওয়াহাবিদের তাকফিরের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

> Ibn Sa'ud found himself in command of a voluntary territorial army composed entirely of Badawin turned yeomen, on whose loyalty he could count to the death, though their undisciplined courage always needed a backing of steadier troops from the towns and villages to make them an effective force, while their fanatical zeal for the destruction of the infidel (a term liberally interpreted by them to include not only non-Muslims but also all Muslims who did not share their fundamentalist conception of the true faith)[১৬৮]

উদ্ধৃতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জন ফিলবি ওয়াহাবিদের কর্তৃক ব্যবহৃত কাফির শব্দটির ব্যাখ্যায় বলছেন, এ শব্দটি ওয়াহাবিরা কেবল অমুসলিমদের জন্য ব্যবহার করত না, এমনকি তাদের মতাদর্শে যারা বিশ্বাস করত না তাদেরও তারা কাফির বলত। ওয়াহাবিরা মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের যুগের পূর্ববর্তী যুগকে ইসলামপূর্ব প্রাচীন মক্কার মতো জাহিলি যুগ হিসেবে গণ্য করত। ফিলবি জাহিলি যুগ বলতে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের যুগের পূর্ব সমকালকে বুঝিয়েছেন। তিনি লেখেন,

> The following morning we resumed our march down the valley passing the ruined wells of Junaina four miles down and reaching a wide bulge of the valley, three miles on, in which we halted for breakfast under a high ledge of rock called Abudidi to which, it is related, worship and sacrifices were offered in the days of the Ignorance", i.e. before the rise of Mohammed ibn Abdul Wahhab.[169]

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আসয়াদ আবু খলীল তাঁর 'The Battle for Saudi Arabia' তে ওয়াহহাবী কর্তৃক আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "১৭৪৬ সনে (অ্যালগার স্টিভ ১১৫৯ বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু রিহানী উহাকে ১১৫৭ বলে উল্লেখ করেছেন) সৌদি ওয়াহহাবী জোট "মুশরিকদের" (অর্থাৎ আরব ও তার বাইরের অন্যান্য মুসলিমদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।"[১৭০]

তিনি বন্ধনীর মধ্যে স্পষ্ট করেন যে, ওয়াহহাবীরা তাদের ব্যতীত অন্যান্য মুসলিমদের মুশরিক হিসেবে বিবেচনা করত।

প্রসিদ্ধ নজদি হাম্বলি মুজাদ্দিদ ইমাম ইবনু দাউদ হাম্বলি রাহ. ইবনু আবদুল ওয়াহহাব কর্তৃক শামি মুসলিমদের তাকফিরের বিষয়টি উল্লেখপূর্বক বলেন,

---

১৬৮. Saudi Arabia by St. John Philby : 262
১৬৯. Southern Nejd : 67
১৭০. পৃষ্ঠাঃ ৬৩

আর আবদুল ওয়াহহাব বলে '(এ যুগের) মানুষ ততক্ষণ আলিম থাকে যতক্ষণ সে কিছু না শেখে। আর যদি সে শেখে সে অকাট্য মূর্খ তৈরি হয়, আর আমরা তার ওপর কুফুর ও পথভ্রষ্টতার হুকুম লাগাই।' আর প্রায়শই সে (অর্থাৎ, নজদি) ও তার সঙ্গীরা লেখে 'মানুষ ২০ বছরের জন্য জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে সিরিয়াতে গমন করে আর শিরক ছাড়া কিছু শিখে আসে না। কারণ, শামবাসী ইবনু আরবির পূজা করে। যদি সে আমাদের কাছে ইয়ামামাতে আসত, তাহলে সে তাকে কি উপকার করে আর কি তাকে ক্ষতি করে তা দশদিনে জানতে পারত, আর সে কুরআন-সুন্নাহ থেকে ইসতিম্বাত করা মুজতাহিদে পরিণত হত।''[১৭১]

এভাবে ওয়াহাবিদের বই পড়লে তাদের কর্তৃক মুসলিমদের অবৈধভাবে তাকফির করার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাবে।

৩. ইমান আনার পর কেউ যদি আমল না করে সে কাফির হয়ে যাবে

খাওয়ারিজ মতাদর্শীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা ফিকহি বিষয়াবলী বা ফুরুয়ি অর্থাৎ, শাখাগত মাসআলা-মাসায়িলকে আকিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে থাকে। ফলে কেউ ফুরুয়ি বিষয়াদী অস্বীকার করলে তারা তাকে তাকফির করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ফরজ রোজা হলো একটি ফিকহি মাসআলা। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, এ ফরজ বিধান ছাড়ার ফলে কোনো মুসলিম বড় পাপিষ্ঠ হবে কিন্তু কাফির হবে না।

খারিজিদের মতানুসারে, কেউ যদি কোনো ফরজ বিধান ছাড়ে সে দীন থেকে খারিজ হয়ে যাবে। কারণ, তারা ফিকহি মাসআলাকে আকিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। ফলে কোনো ফিকহি ফরজ বিধান ছাড়াকে তারা আকিদাগত বিচ্যুতি হিসেবে পরিগণিত করে থাকে। অন্যান্য খারিজি মতাদর্শীদের মতো ওয়াহাবিরাও এ ক্ষেত্রে বড় ভুল করে বসেছে এবং তারা আমলকে আকিদা হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে। ওয়াহাবি মতাদর্শের জনক ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি তাঁর বই 'কাশফুশ শুবুহাত; এর ১৬ নম্বর অধ্যায়টি রচনা করেছেন তাওহিদের প্রয়োগের আবশ্যিকতা নিয়ে। সেখানে তিনি আমলকে তাওহিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মূলত তাওহিদ হলো, একত্ববাদকে অন্তরে বিশ্বাস ও জিহ্বা দ্বারা সত্যায়নের নাম; কিন্তু তাঁর মতে তাওহিদ হলো, জিহ্বা, কলব ও আমলের নাম। কারও মধ্যে এর একটির ব্যতিক্রম ঘটলে উক্ত ব্যক্তি কাফির, এমনকি ফিরআউন ও ইবলিসের মতো কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ, কোনো মুসলিম যদি কলবের দ্বারা তাওহিদের ওপর ইমান আনে, জিহ্বা দ্বারা সত্যায়ন করে—এরপর নামাজ-রোজা পড়ে না অথবা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনক্ষমতার কোনো পদে উন্নিত হয়, তখন ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের মতানুসারে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।

৪. কালিমার ওপর ইমান আনয়নকারী মুসলিমদের তাকফির যারা করত না তাদের তাকফির

ইতিপূর্বে ২ নম্বর পয়েন্টে দেখানো হয়েছে, যেসব মুসলিম ওয়াহাবিয়াত গ্রহণ করত না তাদের ওয়াহাবিরা কাফির হিসেবে গণ্য করত এবং তাদের সম্পদ ও রক্তকে বৈধ মনে করত। এবার আমরা দেখব যে, ওয়াহাবিরা কেবল যারা ওয়াহাবিয়াত গ্রহণ করত না তাদের তাকফির করত, তা নয়—যারা ওয়াহাবিয়াত গ্রহণ করত কিন্তু যেসব মুসলিম ওয়াহাবিবাদ গ্রহণ করেনি তাদের তাকফির করত না, ওয়াহাবিরা তাদেরও তাকফির করত। ওয়াহাবিদের কাছে একটি ফাতওয়া জানতে চাওয়া হয়। প্রশ্নটি হলো,

এমন লোক যিনি এ দীনে (অর্থাৎ, ওয়াহাবিয়াতে) প্রবেশ করল এবং তাকে ভালোবাসল কিন্তু তারা মুশরিকদের (ওই সকল মুসলিম যারা ওয়াহাবি মতাদর্শ গ্রহণ করেনি এবং তাওয়াসসুল, তাবাররুক, শাফাআত ইত্যাদি করত) সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করল না অথবা তাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করল, কিন্তু তাদের তাকফির করল না, অথবা এমনটি বলল যে, 'আমি মুসলিম কিন্তু আমি ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' পাঠকারিদের তাকফির করার ক্ষমতা রাখি না (দেখুন, কোনো মুশরিক কখনো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে না। এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, এখানে মুশরিক বলতে আহলে কিবলা অর্থাৎ, ওয়াহাবিয়াত গ্রহণ করেনি এমন মুসলিমদের বোঝানো হয়েছে)। যদিও কি না তারা তার অর্থ (অর্থাৎ, ওয়াহাবি ব্যাখ্যা) না জানে (তাহলে উক্ত ব্যক্তি কি মুসলিম থাকবে?), অথবা এমন ব্যক্তি যে এ ধর্মে প্রবেশ করল (ওয়াহাবিয়াত গ্রহণ করল) এবং তাকে ভালোবাসল কিন্তু সে বলল যে, আমি কুব্বা (মাজার) সমূহের বিরোধিতা করি না, এ অবস্থায় যে আমি জানি, সেগুলো লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না কিন্তু আমি সেগুলোর (মাজারে যাওয়া, সেখানে তাওয়াসসুল, তাবাররুক, শাফাআত ইত্যাদি করার) বাধা দিই না (সে কি মুসলিম থাকবে?)

উত্তরে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের ছেলে হাসান ও আবদুল্লাহ বলেন, فهذا لا يكون مسلما বা এ ব্যক্তি মুসলিম থাকবে না।[১৭২]

---

১৭১. আস সাওয়াইক ওয়ার রুয়ূদ

১৭২. আদ-দুরারুস সানিয়া ফিল আজওয়াবাতিন নাজদিয়া : ১০/১৩৯

অর্থাৎ, কোনো মুসলিম যদি ওয়াহাবিদের মতাদর্শ গ্রহণ করার পর, তার অপর মুসলিম ভাই যে, ওয়াহাবিদের মতাদর্শ গ্রহণ করেনি তাকে তাকফির না করে, তাহলে ওয়াহাবি মতাদর্শ অনুসারে ওই ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না, যদিও কি না সে ওয়াহাবিয়াত গ্রহণ করেছে কারণ, ওয়াহাবিয়াত মতাদর্শ অনুযায়ী ওয়াহাবি ছাড়া বাকিরা সবাই অমুসলিম এবং মুশরিক, তাই তাদের তাকফির করা আবশ্যক বলে মনে করত ওয়াহাবিরা।

৫. বিভিন্ন আরব দেশকে মুশরিকদের স্বর্গরাজ্য মনে করা

ওয়াহাবিদের কাছে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের মতাদর্শই ছিল ইসলাম। তারা মনে করত, সুদীর্ঘকাল ধরে সমগ্র বিশ্ব কুফরে ডুবে থাকার পর ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের মাধ্যমে পুনরায় ইসলামের পূনর্জাগরণ ঘটে। তারা এটাও মনে করত যে, আরবের বুক থেকে তাওহিদ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ, আরবি মুসলিমরা তাদের মনগড়া তাওহিদের বিশ্বাস রাখত না। যেমন, তারা 'আদ-দুরারুস সানিয়া' এর অষ্টম খণ্ডে স্পষ্ট লিখেছে যে, সমগ্র আরব দেশ থেকে তাওহিদের গাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ কারণে তারা মক্কা-মদিনাসহ সমগ্র আরববিশ্ব ও উসমানি সাম্রাজ্যকে দারুল কুফুর হিসেবে গণ্য করত, এবং সেখানকার মুসলিমদের মুশরিক বলে তাদের জান-মালকে হালাল প্রতিপন্ন করত। উসমানি সাম্রাজ্য, মক্কা-মদিনাসহ অন্যান্য এলাকা যেখানে ওয়াহাবিদের প্রভাব কর্তৃত্ব ছিল না, সেসব স্থানগুলোকে তারা মুশরিকদের ভূমি হিসেবে দেখিয়েছে,

> যে (ব্যক্তি) উসমানি খিলাফতের মুশরিকদের এবং মক্কাবাসীদের মতো কবর পূজারীদের (যেহেতু তারা তাওয়াসসুল, তাবাররুক, শাফাআত ইত্যাদি করতেন, তাই আমভাবে মক্কাবাসী ও অন্যান্য আহলুস সুন্নাতের মুসলিমদের তাকফির করে তারা) ও তারা ছাড়া অন্যান্যদের মতো সৎ ব্যক্তি পূজারিদের যারা আল্লাহর একত্ববাদ থেকে শিরকের দিকে ফিরে এসেছে এবং রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর সুন্নাহকে বিদআতের মাধ্যমে পরিবর্তন করেছে, তাদের যে তাকফির করবে না সেও কাফির।[১৭৩]

প্রখ্যাত ওয়াহাবি ইতিহাসবিদ ও তাদের ইমাম আবদুল্লাহ আলে বাসসাম তদানীন্তন উসমানি খিলাফতের অধীনে থাকা মক্কা, ইরাক, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি জায়গাকে দারুল কুফুর হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং উসমানি সাম্রাজ্যকে রোম অর্থাৎ, ইসলামপূর্ব মুশরিক-খ্রিষ্টান শাসিত রোমের মতো একটি দেশ হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি লেখেন,

> আর রোমের (উসমানি খিলাফতের) অধীনস্থ দূরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা হজ করতে এল না, না সিরিয়া থেকে, না মিসর থেকে আর না ইরাক থেকে অনুরূপভাবে (দারুল) ইসলামের অধিনে না থাকা সকল এলাকা যেমন : সানা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা...[১৭৪]

এখানে স্পষ্ট যে, ওয়াহাবিরা উসমানি খিলাফতের অধীনে থাকা অঞ্চলগুলোকে দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য করত না। তারা এসব এলাকাকে দারুল কুফুর হিসেবে বিবেচিত করত। তারা কেবল আরব নয় সমগ্র মুসলিমবিশ্বকেই দারুল হারব বলে মনে করত। ওয়াহাবিদের ইমাম সুলায়মান ইবনু সাহমান আল-খাসামি তাদের তাকফিরি চিন্তা-চেতনার একটি নগ্ন-চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি স্পষ্ট লিখেছেন যে,

> ওয়াহাবি ইমামের অধীনস্থ এলাকায় যত বাসিন্দা রয়েছে তার অধিকাংশ হলো মুসলিম। কারণ, তারা ওয়াহাবি মতাদর্শ মেনে চলে; কিন্তু ওয়াহাবি ইমামের অধীনে যেসব অঞ্চল নেই (অর্থাৎ, যেসব অঞ্চলে উসমানি অথবা অন্যান্য মুসলিম শাসকশ্রেণির প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে) তারা অধিকাংশই কাফির। কারণ, তারা ওয়াহাবি মতাদর্শ মেনে চলে না।[১৭৫]

তিনি এ-ও লিখেছেন যে, তিনি ওয়াহাবি মতাদর্শ শাসিত এলাকা ছাড়া বাকি এলাকার বাসিন্দাদের সামগ্রিকভাবে তাকফির করেন না কারণ, তাদের হালত সম্পর্কে (অর্থাৎ তারা সবাই ওয়াবিয়াত ছাড়া কি না) ওয়াকিবহাল নন। অর্থাৎ, যদি তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হতেন যে, আরবের মধ্যে একজন ব্যক্তিও ওয়াহাবিদের মতাদর্শ অনুসরণ করে না, তাহলে তিনি সামগ্রিকভাবে পুরো জাজিরাতুল আরবকে তাকফির করতেন। দেখুন খাসামি কি বলছেন,

> জাজিরাতুল আরবে যারা রয়েছে, আমরা জানি না তাদের সবাই কোন ধর্মের ওপর রয়েছে (অর্থাৎ, তারা সামগ্রিকভাবে ওয়াহাবি নয়

১৭৩. আদ-দুরারুস সানিয়া : ৯/২৯১

১৭৪. আত-তাওয়ারিখুন নজদিয়া : ১/২৩৫-২৩৬

১৭৫. মিনহাজু আহলিল হক ওয়াল ইত্তিবা : ৭৯

নাকি তাদের মধ্যে কিছু ওয়াহাবিও আছে) কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, তাদের অধিকাংশ ইসলামের ওপর নেই। তাদের মধ্যে একজন মুসলিম (ওয়াহাবি) থাকার সম্ভাবনার জন্য আমরা তাদের সামগ্রিকভাবে কুফরের হুকুম লাগাই না। আর যারা ইমামুল মুসলিমিনের (ওয়াহাবি রাজ্যের আমির) অধীনে থাকা অঞ্চলে রয়েছে, তাদের অধিকাংশ ইসলামের ওপর রয়েছে।[১৭৬]

৬. ইখওয়ান : ওয়াহাবিদের তাকফিরের অনন্য নিদর্শন

ওয়াহাবিদের তাকফির সম্পর্কে যখন জানছি, তখন ইখওয়ান সম্পর্কে যদি আমরা না জানি তাহলে বিষয়টি অপূর্ণ রয়ে যাবে। হিজাজ ও নজদের ওপর নিজের প্রভাব ও কর্তৃত্ব মজবুত করার উদ্দেশ্যে আধুনিক সৌদিআরবের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল আজিজ ইবনু সৌদ নজদের ওয়াহাবিদের একটি মিলিশিয়াবাহিনী তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় নজদ ছিল ওয়াহাবিদের আখড়া। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কট্টর ওয়াহাবি মতাদর্শীদের নিয়ে তৈরি করলেন ওয়াহাবি মতাদর্শী মিলিশিয়াবাহিনী ইখওয়ানের। ইখওয়ানের পরিপূর্ণ নাম হলো, 'ইখওয়ানু মান আতাআল্লাহ'।

ইখওয়ানের অপর নাম ছিল আল-হিজরাহ। কারণ, তারা মনে করত বেদুইন জীবন থেকে ইসলামে হিজরত করেছে। ইবনু সৌদের অধিনস্ত কর্মচারী হাফিজ ওয়াহবা বলেন, 'হিজরা বলার কারণ হলো, তারা তাঁবু ছাড়া বিশেষ জায়গায় এসে বসবাস করা শুরু করে এবং নিজেদের জন্য তারা কাদামাটির ঘর বানায় যাকে তারা হুজরা বলত।[১৭৭] আবার কারও মতে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির বই 'সালাসাতুল উসুল' এর ২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত الهجرة : الانتقال من بلد الشرك الي بلد الاسلام কথাটি থেকে তাদের নাম হিজরাহ রাখা হয়। এ বাহিনীটি সম্পূর্ণ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। ইখওয়ানের সদস্যরা আবদুল আজিজ ইবনু সৌদকে তাদের ইমাম এবং আমির হিসেবে গ্রহণ করে। ইবনু সৌদ নিজেকে ইখওয়ান হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলতেন, 'আমিই হলাম ইখওয়ান।'

ইতিহাস থেকে জানা যায়, এ কট্টরপন্থি ওয়াহাবি সশস্ত্র মিলিশিয়া দলটি—ওয়াহাবি মতাদর্শ অনুযায়ী—ওয়াহাবি প্রভাবিত দেশ ছাড়া, কোনো মুসলিম দেশকে দারুল ইসলাম মনে করত না এবং ওয়াহাবি মতাদর্শের অনুসারী ছাড়া কোনো মুসলিমকে তারা মুসলিম হিসেবে গণ্য করত না। তারা ইরাক, কুয়েতসহ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রকে শিরক ও মুশরিকদের স্বর্গোদ্যান বলে মনে করত। ফলস্বরূপ পরবর্তী সময়ে যখন সৌদি ওয়াহাবি রাজা ও তাদের ইমাম ইবনু সৌদ পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে তখন এ মিলিশিয়ারা তাদের ইমামের বিরোধিতা করে। একপর্যায়ে তারা তাদের এককালীন রাহওয়ার ইবনু সৌদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। ইখওয়ানের কাছে কাফির কারা ছিল এবং তাদের তাকফিরের স্বরূপ নিয়ে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

ইখওয়ানরা ইরাক, কুয়েতসহ বিভিন্ন ওয়াহাবি মতাদর্শে দীক্ষিত নয় এমন দেশগুলোকে মুশরিকদের স্বর্গোদ্যান বলে মনে করত। বিশিষ্ট গবেষক জন এস হাবিব এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন,

> তারা (অর্থাৎ, ইখওয়ান) হায়িল, হিজাজ ও জাউফ বিজয়ী হয়ে উঠল। তথাপি তাদের সাফল্য ও ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে, তাদের সবথেকে দক্ষ নেতাদের নেতৃত্বে তাঁর বিরুদ্ধে (ইবনে সৌদের বিরুদ্ধে) একই ক্রোধ নিয়ে বিদ্রোহ করে বসল, যা ইতিপূর্বে তাঁর (ইবনে সৌদের) শত্রু ও কাফিরদের জন্য তারা পোষণ করত। ইরাক, উর্দুন ও কুয়েত যেগুলোকে কাফিরদের আখড়া এবং সে জন্য বৈধ লক্ষ্যবস্তু বলে শেখানো হয়েছিল, সেসব জায়গায় ইবনু সৌদ হানা দেওয়া নিষিদ্ধ করাতে ইখওয়ান হতাশ ছিল...[১৭৮]

উদ্ধৃতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইখওয়ানি ওয়াহাবিরা বিভিন্ন আরব দেশ কুয়েত, ইরাক ও জর্ডানকে তারা মুশরিকদের আস্তানা হিসেবে মনে করত। আরও একটি হাস্যকর বিষয় লেখক এখানে উপস্থাপন করেছেন যে, ওয়াহাবিরা টেলিগ্রাফ, অটোমোবাইল, টেলিফোন ইত্যাদিকে শয়তানি বিদআত বলে মনে করত। তিনি বলেন,

> ইবনু সৌদ রাজ্যে আধুনিক যন্ত্রাদির প্রচলন ঘটিয়েছিলেন যেমন : টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, অটোমোবাইল, ওই সকল যন্ত্রপাতি যা তারা (অর্থাৎ, ইখওয়ান) শয়তানি বিদআত বলে মনে করত।[১৭৯]

---

১৭৬. মিনহাজু আহলিল হক : ৭৯

১৭৭. আল-জাজিরা : ২৯৩

১৭৮. Ibn Saud's Warriors of Islam by Dr. John S. Habib : 6-7

১৭৯. Ibn Saud's warriors of Islam : 7

এ বিষয়টি আল-আজহারের শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ আহমাদি জাওয়াহিরি রাহ. তাঁর আত্মজীবনী 'আস-সিয়াসা ওয়াল আজহার' বইয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি সেখানে টিভি, রেললাইন, গ্রামোফোনের কথাও উল্লেখ করেন।

ইখওয়ানিরা যেসব মুসলিমদের কাফির বলে মনে করত, তাদের সঙ্গে তারা সালাম বিনিময় করত না। উপরোক্ত বইয়ে লেখক লিখেছেন,

> They themselves were not disposed to return the Islamic salutation, salant 'alaykum (peace to you) to those Muslims whom they considered infidels, much less discuss the fundamentals of their religious revival with the foreigner.[১৮০]

ইখওয়ানের ওয়াহাবিরা তাদের মুখগুলো ঢেকে রাখত, যাতে কাফির মুসলিমদের কুদৃষ্টি তাদের মুখে না পড়ে। ডক্টর হাবিব লেখেন,

> Another Ikhwan habit was to cover their faces rather than look at an infidel.[১৮১]

তারা তাদের পূর্ববর্তী ওয়াহাবিদের মতো তুর্কি তথা উসমানিদের মুশরিক-কাফির মনে করত। ডক্টর হাবিব ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি ব্রিটিশ টেলিগ্রাম কপি করেছেন, যেখানে এ বিষয়টি উঠে এসেছে। উক্ত টেলিগ্রামটিতে বলা হয়েছে,

> Your telegram of 1st October. We have no evidence to the effect and I doubt it because the Wahabis regard Turks as infidels.[১৮২]

ইখওয়ানের ওয়াহাবিরা তাদের পূর্বসূরিদের মতো হিজাজের মুসলিমদেরও কাফির বলে মনে করত। ডক্টর হাবিব তাঁর বইয়ে হিজাজের কাফির মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইখওয়ানের যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

> তারা অত্যন্ত সফল ছিল। তারা ইবনু সৌদের বিরুদ্ধে, সর্বংসহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে, হিজাজের কাফির মুসলিমদের বিরুদ্ধে, যাদের সঙ্গে তাদের ধারণা অনুযায়ী ইবনু সৌদ খুব ভালো আচরণ করছেন, ইরাক ও জর্ডানের কাফির যাদের নম্রতা দেখানোর অনুমতি তাদের ছিল না, তাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুষে তারা নজদে ফিরেছিল।[১৮৩]

এখান থেকে অনুমান করা যায় ওয়াহাবিরা কতটুকু উগ্র ও অপর মুসলিমদের প্রতি অসহনশীল ছিল।

৭. উসমানিদের আমভাবে তাকফির

হানাফি মাজহাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত আব্বাসি সাম্রাজ্যের বাতি যখন নিভু নিভু, ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগের স্বর্ণালী রশ্মি যখন ম্লান হয়ে এসেছিল, চারদিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অন্তর্দেশীয় কোন্দলে আব্বাসিরা জর্জরিত হয়ে পড়ে তখন ইসলামি খিলাফতের ঝান্ডাটি হাতে তুলে নেয় তুর্কি খাকানরা। তুর্কিদের মাধ্যমে পুনরায় ফিরে আসে ইসলামি সভ্যতার হারানো গৌরব। ষোড়শ শতাব্দীতে খলিফাতুল মুসলিমিন সেলিম আওয়াল খিলাফতে উসমানিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কয়েক শতক আগে থেকেই উসমানিরা তাদের বিজয় যাত্রা শুরু করেছিল। ঐতিহাসিক কনস্টান্টিনোপল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল ইমারতে উসমানিয়া, যা পরবর্তীতে উসমানি খিলাফত রূপে ছড়িয়ে পড়ে দিগ্দিগন্তে।

তুর্কিরা ইসলামের ছায়াতলে আসে আব্বাসি যুগে। প্রথম যে তুর্কি খাকান ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন তাঁর নাম ছিল সাতুক বুরা খান (Setuk Buğra Han)। তিনি যখন ১২ বছরের ছোট্ট শিশু তখন তিনি ইলমনগরী বুখারায় আগমন করেন। সেখানে তিনি আবুন নাসর নামক

১৮০. Ibn Saud's warriors of Islam : 25
১৮১. Ibn Saud's warriors of Islam : 31
১৮২. Telegram from the Secretary of State for India to the Civil Commissioner, Baghdad,1 October 1918, Public Record Office, MSS, Foreign Office, Yol. 3399, Document No. 169834 ; Ibn Saud's warriors of Islam : 26-27
১৮৩. Ibn Saud's Warriors of Islam : 118

একজন পিরের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। শিশু সাতুকের নতুন নাম রাখা হয়, আবদুল কারিম সাতুক বুরা খান। ৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তুর্কি খাকান হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তুর্কি জগতে একটি ইসলামি বিপ্লব ঘটান। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে ইসলামকে তুর্কিদের একমাত্র ধর্ম, হানাফি মাজহাবকে একমাত্র মাজহাব এবং মাতুরিদি আকিদাকে একমাত্র আকিদা হিসেবে ঘোষণা করেন। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ইলমাজ ওজতুনা এ বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

> খাকান বা সর্বোচ্চ (নেতা) কারাখানলি সাতুক বুরা খান যিনি নিজে আবদুল কারিম নাম গ্রহণ করেন এবং ৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে ঘোষণা করেন যে, ইসলাম ধর্মই [সুন্নি-হানাফি ও মাতুরিদি মাজহাব] খাকানি ও তুর্কি জাতির সরকারি ও একমাত্র ধর্ম।[১৮৪]

তুর্কিদের ইসলাম গ্রহণের কয়েক শতক পর ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি খাকানদের একটি দল উসমান ইবনু আরতুগরুল ইবনু সুলায়মানের নেতৃত্বে সোউত (Söğüt) অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামি উসমানি ইমারত। উসমান ইবনু আরতুগরুলের নামানুসারে এই ইমারতের নামকরণ করা হয় উসমানি ইমারত। যা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয় ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। উসমানি ইমারত ও খিলাফতের সরকারি মাজহাব হিসেবে স্বীকৃত ছিল হানাফি ও মাতুরিদি মাজহাব। উসমানি আমির ও খলিফারা ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ। ইসলামি শরিয়তের প্রতি তাদের ছিল আনুগত্য, অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। পরিপূর্ণ ইসলামি শরিয়তের ওপর সাম্রাজ্য কায়িম করে উসমানিরা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আলিমদের মতে উম্মতে মুসলিমার এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, খিলাফতে রাশেদার পর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য ছিল উসমানি সাম্রাজ্য। ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের বর্তমান কাজিউল কুজাত মাওলানা মুফতি আবদুল হাকিম হক্কানি হাফি. ইজমাটির কথা উল্লেখ করে বলেন,

> উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন, যে ব্যক্তি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে জানতে চায়, তার জানা দরকার, উসমানি সাম্রাজ্য হলো (খুলাফায়ে) রাশিদিনদের সাম্রাজ্যের পর শ্রেষ্ঠতম ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা সমূহের একটি। কারণ, তারা আহলুস সুন্নাতের মাজহাব গ্রহন করেছেন, তাদের আকিদা ছিল সহিহ এবং তারা আহলুস সুন্নাতের সাহায্যকারী ছিলেন। তারা সাহাবায়ে কিরাম, আহলে বায়ত, উলামায়ে কিরাম ও সালিহদের তাজিম করতেন।[১৮৫]

ইয়ামেনের প্রসিদ্ধ আলিম আল-হাবিব আবু বকর আল-আদনি হাফি. বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, 'নবুওয়াতের মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বশেষ খিলাফত হলো, উসমানি সাম্রাজ্যর পর্বটি।'[১৮৬] দশম হিজরি শতাব্দির ফিলিস্তিনের বিখ্যাত হাম্বলি ইমাম মারয়ি ইবনু ইউসুফ কারমি রাহ. উসমানি সালাতিনদের মাহাত্ম্যের উপর একটি রিসালা প্রণয়ন করেছেন যার নাম হলো, قلائد العقيان في فضائل آل عثمان। এটি তাঁর মাজমুয়ুর রাসায়িলের ৪৮তম রিসালা। উক্ত রিসালার ভূমিকায় উসমানিদের বিষয়ে বলা হয়েছে,

> তারা (অর্থাৎ, উসমানিরা) এককথায় দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মহান বাদশাহ ছিলেন...[১৮৭]

প্রায় আট শতাধিক বছর দাপটের সঙ্গে শাসন করার পর ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে অস্তমিত হয়ে যায় গৌরবময় উসমানি খিলাফতের সূর্যটি। শেষ খিলাফত হিসেবে বিদায় নেয় উসমানি খিলাফত। উসমানিদের পতনের পেছনে ওয়াহাবিরা বড় অংশে দায়ী ছিল। আব্বাসি সাম্রাজ্য যেমন অভ্যন্তরীণ খারিজিদের দ্বারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, অনুরূপভাবে আরবের বুকে উসমানি সাম্রাজ্যকে অভ্যন্তর থেকে দুর্বল করে দিয়েছিল ওয়াহাবিরা। উসমানিদের তাকফির, ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা নিয়ে তারা হিজাজ ও নজদে উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আরবের বুকে উসমানিদের দুর্বল করে ফেলেছিল। ফলে একপর্যায়ে আরব থেকে বিদায় নেয় উসমানিরা।

ওয়াহাবিদের ইতিহাস ও তাদের ইমামদের প্রণীত বই পাঠ করলে উসমানিদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবিদের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড ও তাদের তাকফিরের বিষয়ে বিষদ বিবরণ পাওয়া যায়। ওয়াহাবি গুরু ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নিজেই উসমানিদের কাফির ও মুশরিক বলে মনে করতেন। অনুরূপভাবে তাঁর অনুসারীদের উসমানিদের কাফির ও মুশরিক বলে মনে করত। ওয়াহাবি কর্তৃক উসমানিদের আমভাবে তাকফিরের কিছু নমুনা এখানে পেশ করা হলো :

---

১৮৪. তারিখুল দাওলাতিল উসমানিয়া : ৪৬

১৮৫. তাতিম্মাতুন নিজাম : ২৫১

১৮৬. আল-উসুস

১৮৭. مجموع رسائل العلامة مرعي الكرمي الحنبليالحنبلي: قلائد العقيان في فضائل آل عثمان، الرسالة رقم ٤٨، ت: محمد وائل الحنبلي، ص ٤١٦، دار اللباب

ওয়াহাবিদের ইমাম সুলায়মান ইবনু সাহমান খাসামি উসমানিদের তাকফির করে বলেন,

> এ মাসআলায় অধিকাংশ মানুষকে শয়তান পদস্খলিত করেছে, ফলে তারা এমন কেনো দলের ব্যাপারে অবহেলা করে ও তাদের মুসলিম হওয়ার হুকুম দেয়, যাদের কুফুরির ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর নস ও ইজমা দলিল দেয়। আমি (সুলায়মান) বলি, ওই সমস্ত যাদের ব্যাপারে (অবহেলা করে) মুসলিম হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে (অথচ তারা কাফির) তাদের উদাহরণ হলো, তুর্ক ও তাদের মতো যারা আছে।[১৮৮]

ইতিহাস পর্বে আমরা দেখেছি, একসময় আরবদের আহ্বানে উসমানি ও মিসরি শাসকের নেতৃত্বে আরব বিপ্লবের ফলে ওয়াহাবিদের প্রথম রাষ্ট্র ইমারতে দিরিয়ার পতন ঘটেছিল। এ সময় ব্যাপক সংখ্যক মানুষ ওয়াহাবিয়াত ছেড়ে আহলুস সুন্নাতের পথে ফিরে আসেন। ওয়াহাবি ইতিহাসবিদরা এ ঘটনাকে ট্রাজেডি হিসেবে পরিগণিত করে থাকে। কারণ, তাদের কাছে এটা ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের বিজয়। ইসলামের বিরুদ্ধে শিরকের বিজয়। ওয়াহাবি মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল লতিফ ইবনু আবদুর রহমান এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

> আর তাদের ওপর যে ফিতনা আপতিত হয়েছিল সেটা হলো, তুর্কি ও মিসরি সেনাবাহিনীর ফিতনা। এরপর ইসলামি (ওয়াহাবি) শাসনব্যবস্থা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, আর তার সমর্থক ও সহায়তাকারীরা শতধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এরপর ইসলামি রাষ্ট্রের পতন হলো। আর মুনাফিকরা (যারা ওয়াহিয়াত ছেড়ে মুসলিম হলো) তাদের প্রকাশ করল, যারা চাইল তাদের পিতার ধর্মে ফিরে গেল এবং ওই শিরক ও কুফুরির দিকে ফিরে গেল যার ওপর তারা ইতিপূর্বে ছিল।[১৮৯]

অন্য এক জায়গায় স্পষ্ট উসমানিদের তাকফির করে বলা হয়েছে,

> فمن عرف هذا الأصل الأصيل، عرف ضرر الفتن الواقعة في هذه الأزمان، بالعساكر التركية، وعرف أنها تعود على هذا الأصل الأصيل بالهد والهدم، والمحو بالكلية، وتقتضي ظهور الشرك والتعطيل، ورفع أعلامه الكفرية، وأن مرتبتها من الكفر، وفساد البلاد والعباد فوق ما يتوهمه المتوهمون، ويظنه الظانون[190]

ওয়াহাবি শায়খ সুলায়মান একটি প্রশ্নের উত্তরে উসমানি সাম্রাজ্যকে আমভাবে তাকফির করে বলেন, 'যে ব্যক্তি (উসমানি) সাম্রাজ্যের কুফুর সম্পর্কে অবগত নয়, আর তাদের (উসমানি) ও মুসলিমদের বাগীদের মধ্যে পার্থক্য করেনি, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অর্থ জানে না।'191 উসমানিদের পাশাপাশি ওয়াহাবিরা তাদেরও তাকফির করে যারা উসমানিদের তাকফির করত না। আরেক জায়গায় বলা হয়েছে,

> যে উসমানি খিলাফতের মুশরিকদের এবং মক্কাবাসীদের মতো কবর পূজারিদের (যেহেতু তারা তাওয়াসসুল, তাবাররুক, শাফাআত ইত্যাদি করতেন তাই আমভাবে মক্কাবাসী ও অন্যান্য আহলুস সুন্নাতের মুসলিমদের তাকফির করে তারা) ও তারা ছাড়া অন্যান্যদের মতো সৎ ব্যক্তি পূজারিদের যারা আল্লাহর একত্ববাদ থেকে শিরকের দিকে ফিরে এসেছে এবং রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর সুন্নাহকে বিদআতের মাধ্যমে পরিবর্তন করেছে তাদের যে তাকফির করবে না সেও কাফির।[১৯২]

ওয়াহাবিদের নির্ভরযোগ্য ইমাম ও ইবনু আবদুল ওয়াহাবের প্রপৌত্র আবদুল লতিফ ইবনু আবদির রহমান আলে শায়খ উসমানিদের ইসলামের শত্রু ও মুশরিক হিসেবে অভিহিত করেছেন। হুতাবাসীর একটি রিসালায় তিনি বলেন,

> ওই সকল ফিতনার মধ্যে একটি হলো মহা ফিতনা ও বড় মুসিবত, জাতি ও ধর্মের শত্রু মুশরিক সেনাবাহিনীর ফিতনা।[১৯৩]

মুশরিকদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে তারা হলো উসমানি সেনাবাহিনী।

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের বাগদাদে ব্রিটিশ দপ্তরের একটি টেলিগ্রাম থেকে ওয়াহাবিদের উসমানিদেরকে তাকফিরের বিষয়ে জানা যায়। জন এস হাবিব চিঠিটি নকল করেছেন। তা এখানে হুবহু তুলে ধরা হলো,

---

১৮৮. মিনহাজু আহলিল হক ওয়াল ইত্তিবা : ৭৮

১৮৯. আদ-দুরারুস সানিয়া : ১০/৪৫১

১৯০. আদ-দুরারুস সানিয়া : ৮/৩২২

১৯১. প্রগুক্ত : ১০/৪২৯

১৯২. আদ-দুরারুস সানিয়া : ৯/২৯১

১৯৩. উয়ুনুর রাসায়িল : ২/৯৪০-৯৪১

> Your telegram of 1st October. We have no evidence to the effect and I doubt it because the Wahabis regard Turks as infidels. Central Arabia has always been a focus of Mohammedan fanaticism and present Ikhwan movement appears to me as the local expression of the political unrest which "pervades whole Arabian continent.[১৯৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ওয়াহাবিরা যে কেমন মারাত্মক তাকফিরি ছিল সেটা আমরা অনুমান করতে পারি। ওয়াহাবিদের সঙ্গে ব্রিটিশ ও ইরানি শিয়াদের নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও তাদের শত্রুতা ছিল, ইসলামি উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে।

৮. মাজারকে শিরক হিসেবে পরিগণিত করা

ওয়াহাবিদের পথভ্রষ্টতার আরও একটি নমুনা হলো, তারা কবরের ওপর কিছু নির্মাণ করাকে শিরকে আকবার ও কুফর হিসেবে গণ্য করত। এ কারণে পাকা কবরকে তারা মূর্তির সঙ্গে উপমা দিত আর তাদের সেই মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা ব্যাপকহারে সাহাবায়ে কিরাম ও আওলিয়াদের মাজারগুলো ধ্বংস করত এবং অপবিত্র করত। কবর পাকা করা অথবা কবরের উপর কুব্বা তৈরির বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান কি? আমরা এ পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

শরিয়তের দৃষ্টিতে কবরস্থান দুইটি প্রকার রয়েছে। প্রথমটি হলো, মুসাব্বালা বা জনসাধারণের জন্য ব্যবহৃত কবরস্থান। এ ধরনের কবরস্থানের ক্ষেত্রে হুকুম হলো, যদি কবরস্থ মাইয়িতের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে সে ক্ষেত্রে কবরের উপর কিছু নির্মাণ করা মকরুহ মতান্তরে হারাম। যেহেতু সেটা জনগণের জন্য ব্যবহৃত কবরস্থান সেহেতু সেখানে কবরের উপর কিছু নির্মাণ করলে তাতে জনগণের হক নষ্ট করা হয়। ইমাম ইবনু দাউদ হাম্বলি রাহ.-এর মতে ইবনুল কাইয়িম রাহ. ছাড়া কোনো হাম্বলি ইমাম মুসাব্বালা—কবরস্থানের কবরের উপর কিছু নির্মাণকে মাকরুহ ছাড়া ভিন্ন কিছু তেমন হারাম ইত্যাদি বলেননি। তিনি বলেন,

> উলামাদের কাউকেই সে ব্যাপারে মকরুহ ছাড়া কিছু বলেননি।[১৯৫]

তবে মুসাব্বালা কবরস্থানে মাইয়িতের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে কবর পাকা করা বৈধ। আর কবরস্থান যদি গায়রে মুসাব্বালা হয় অর্থাৎ জনসাধারণের জন্য ব্যবহৃত কবরস্থান না হয়, যেমন : মালিকানাধীন স্থান। সে ক্ষেত্রে উক্ত স্থানে কবরের উপর কিছু নির্মাণ করা আইম্মায়ে আহলুস সুন্নাতের চার মাজহাবের কাছে বৈধ। নিম্নে চার মাজহাব থেকে ইমামদের এ বিষয়ে মতামত তুলে ধরা হলো, যাতে করে বিষয়টি পাঠকমণ্ডলির কাছে অধিকতর সহজবোধ্য হয়ে ওঠে।

হানাফি মাজহাবের ইমাম ইবনু আবিদিন শামি রাহ. এ প্রসঙ্গে লেখেন,

> আর বলা হয়ে থাকে যে, যদি মাইয়িত পির, উলামা অথবা নেতৃস্থানীয় কেউ হয় সে ক্ষেত্রে (কবরের উপর) কিছু নির্মাণ মকরুহ হবে না। আমি বলি, কিন্তু সেটা গায়রে মুসাব্বালা কবরের ক্ষেত্রে।[১৯৬]

ইমাম মোল্লা আলী আল কারী রাহিমাহুল্লাহ এবিষয়ে বলেন,

> وقد اباح السلف البناء علي قبر المشائخ و العلماء و المشهورين ليزورهم الناس و يستريحوا بالجلوس فيه

অর্থ: সালাফগণ পীর, উলামা এবং মশহূরদের কবরের উপর মাজার তৈরিতে বৈধতা দিয়েছেন যাতে করে মানুষ তাঁদের জিয়ারত করতে পারে এবং সেখানে বসে প্রশান্তি লাভ করতে পারে।[১৯৭]

শাফিয়িদের ফাতওয়ার বইয়ে বলা হয়েছে,

---

১৯৪. Ibn Saud's Warriors of Islam : 25-26

১৯৫. আস-সাওয়ায়িক : ১৫২

১৯৬. রাদ্দুল মুহতার : ২/২৩৭

১৯৭. শরহুল মাসাবিহ ৩/ ১২১৭

(যদি চোর অথবা হিংস্র জন্তুর ভয়ে (কবরের উপর) কোনো কুব্বা বা ঘর তৈরির প্রয়োজন পড়ে যদিও তা (কবরস্থান) মুসাব্বালা হয় অথবা গায়রে মুসাব্বালা কবর বা কুব্বার উপর মঙ্গলের জন্য লেখার প্রয়োজন পড়ে, তবে তাতে কোনো কারাহাত নেই (অর্থাৎ, সেটা মকরুহ হবে না)[১৯৮]

হাম্বলি মাজহাবের সুপ্রসিদ্ধ ফিকহের বইয়ে বলা হয়েছে,

আল-মুসতাউয়িব ও আল-মুহাররার-এর প্রণেতারা বলেছেন, মালিকানাধীন স্থানে (কবরের উপর) কুব্বা, ঘর অথবা বেষ্টনীর ক্ষেত্রে কোনো দোষ নেই।[১৯৯]

ইমাম ইবনুল মুফলিহ হাম্বলি রাহ. বলেছেন,

(কবরের উপর) গম্বুজ, বেষ্টনি অথবা তুরবা যদি তা (অর্থাৎ, কবর) তার মালিকানাধীন স্থানে হয় তাহলে, সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে কিন্তু যদি তা মুসাব্বালা স্থানে হয়, তাহলে (স্থান) সংকীর্ণকরণের জন্য তা মকরুহ করা হয়েছে।[২০০]

ইমাম উমাইরি রাহ. কবরের ওপর স্থাপনা নির্মাণের বিষয়ে লিখেছেন,

কবরের উপর স্থাপনা নির্মাণের কাজও বৈধ। আমাদের শায়খদের শায়খ সাইয়িদি আবদুল কাদির আল-ফাসি রাহ. লিখেছেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মানুষেরা সালিহিন ও ইসলামের ইমামগণের কবরের উপর স্থাপনা নির্মাণ করে থাকে যেমনটি দেখা যায়। আর এর মধ্যে (স্থাপনা নির্মাণের) রয়েছে আল্লাহর নির্দেশাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন।[২০১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, কবরের উপর স্থাপনা ক্ষেত্র বিশেষে বৈধ আবার ক্ষেত্র বিশেষে হারাম অথবা মকরুহ। তবে এটাকে কোনোকালেই কোনো ইমাম শিরক অথবা কুফুর বলেননি কেবল ওয়াহাবি-তাকফিরিরা ছাড়া। ওয়াহাবিরা কবরের উপর কোনো স্থাপনাকে কুফুর ও শিরক হিসেবে পরিগণিত করত। এমনকি সেগুলোকে তারা মুশরিকিনদের মূর্তির সঙ্গে তুলনা দিত। ইমাম আলাবি রাহ. বলেন, 'আর (কবরের উপর কিছু নির্মাণ করা) কুফুর হওয়াটা ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ছাড়া আর কেউ বলেনি।'[২০২]

ইবনু আবদুল ওয়াহহাব বা ওয়াহহাবিদের লেখা বইয়ে বিশেষত ওয়াহহাবিদের ফাতওয়ার গ্রন্থ 'আদ-দুরার' থেকে ওয়াহাবিদের কর্তৃক কবরের উপর স্থাপনা নির্মাণকে শিরক ও কুফুর প্রতিপন্ন করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

৯. তাওয়াসসুল, শাফাআত ও ইস্তিগাসাকারীদের তাকফির

ওয়াহাবিরা তদানীন্তন মুসলিমদের বিশেষত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতকে তাকফির করার অন্যতম একটি কারণ ছিল, তারা তাওয়াসসুল, ইসতিগাসা ও শাফাআত বৈধ বলে মনে করতেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কাছে এগুলো বৈধ হলেও ওয়াহাবি তাকফিরিদের কাছে এগুলো কুফর এবং শিরক হিসেবে পরিগণিত ছিল।

তারা মনে করত, কোনো ব্যক্তি যদি মৃত ব্যক্তির অসিলায় কিছু প্রার্থনা করে অথবা মাজার-কবরের কাছে গিয়ে ইসতিগাসা করে বা শাফাআত প্রার্থনা করে, তারা মূলত আল্লাহকে ছেড়ে উক্ত মৃত ব্যক্তিকে সবকিছু দেওয়ার মালিক বলে গণ্য করে থাকে। ফলে ওই সকল নির্বোধেরা তাদের এ ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে, বৈধ ও মুসতাহসান কিছু বিষয়কে শিরক হিসেবে পরিগণিত করে তা দিয়ে আমভাবে মুসলিমদের তাকফির করে এবং মুশরিক বলে। ওয়াহাবিদের এসব তাকফিরি চিন্তা-চেতনার প্রমাণ উপস্থাপনের আগে আমরা তাওয়াসসুল, শাফাআত ও ইসতিগাসার উপর

---

১৯৮. بشرى الكريم، ٤٧٣

১৯৯. আল-ফুরু : ২/২৭২

২০০. আল-ফুরু : ২/২৭৩

২০১. আল-আমালুল ফাসির শরাহ

২০২. মিসবাহুল আনাম : ১৫২

শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করব, যাতে করে পাঠকমণ্ডলী এ বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা রাখতে পারেন এবং ওয়াহাবিদের ত্রুটিসমূহ সহজে বুঝতে সক্ষম হন।

ক. তাওয়াসসুল

তাওয়াসসুল আরবি وسل থেকে ব্যুৎপন্ন। আরবি অসিলা শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যেমন : নৈকট্য, মাধ্যম ইত্যাদি। আরবি কবি লাবিদ বলেন,

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم

بلى كل ذي رأي الي الله واسل

তাওয়াসসুলের শরয়ি পরিভাষা হলো, আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিমিত্তে কোনো মাধ্যম অবলম্বন করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মুমিনরা, আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর অসিলা (নৈকট্য) অনুসন্ধান করো, আর তাঁর রাস্তায় জিহাদ করো, যাতে তোমরা সফল হও।[২০৩]

আয়াতটির তাফসিরে তাওয়াসসুল শব্দটির ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারি রাহ. বলেন,

কথকের কথা 'অমুকের জন্য এভাবে তাওয়াসসুল করলাম'-এর অর্থ হলো তার দিকে ও তার সান্নিধ্যে নৈকট্য লাভ করলাম।[২০৪]

ইমাম আবদুল কাহির জুরজানি রাহ. তাওয়াসসুলের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অসিলা হলো একটি খাসলত যেটার দ্বারা বান্দা তার প্রভুর কাছে মৈত্রী, প্রেম ও ভালোবাসার নৈকট্যলাভ করে থাকে।'205 ইমাম সামানি হানাফি রাহ. অসিলার সংজ্ঞায় বলেন 'অসিলা হলো ওই সকল কিছু যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা যায়।'[২০৬]

তাওয়াসসুল বা অসিলা হলো, সব বৈধ পন্থার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। এর বহু রূপ বা প্রকরণ রয়েছে। যেমন : আল্লাহ তাআলার আসমায়ে হুসনা ও সিফাতসমূহের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করা। যেমন : রাসুলুল্লাহ সাঃ কঠিন সময়ে নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করতেন,

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث[207]

হে চিরঞ্জীব, হে চিরন্তন, আপনার রহমতের (অসিলার) মাধ্যমে আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি।

এ ছাড়াও কুরআন মাজিদের মাধ্যমে অথবা রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর ইসম মুবারকের মাধ্যমে, পূণ্যকর্মের অসিলায় অথবা অন্যান্য জিনিসের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করা যায়। তাওয়াসসুলের একটি রূপ হলো জীবিত অথবা মৃত আম্বিয়া, আওলিয়া অথবা সালিহ ব্যক্তিদের অসিলায় পরম প্রেমাস্পদের কাছে দুআ চাওয়া। অর্থাৎ, এরকম বলা, 'হে করুণাময়, ...-এর অসিলায় আমার...দুআটি কবুল করে নিন।'

মৃতদের অসিলায় তাওয়াসসুলের বিষয়ে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের একটি হাদিস নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো,

قال رسول الله صلي الله عليه و سلم لما دفن فاطمة بنت أسد أم علي ﷺ : اللهم بحقي و حق الانبياء من قبلي اغفر لامي بعد امي

আলি রা.-এর মাতা ফাতিমা বিনতু আসাদকে দাফনের পর রাসুলুল্লাহ বলেন, 'হে আল্লাহ, আমার অসিলায় এবং আমার পূর্ববর্তী নবিগণের অসিলায় আমার মায়ের পরে মাকে ক্ষমা করে দিন।'[২০৮]

---

২০৩. সুরা মায়িদা : ৩৫

২০৪. জামিউল বায়ান : ১০/২৯১

২০৫. درج الدرر ١١١١/٣

২০৬. তাফসিরুল কুরআন : ৩/২৫১

২০৭. أخرجه الترمذي ٤٢٥/٥ برقم ٣٥٢٤

২০৮. তিরমিজি : ২৫১৬

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আইম্মায়ে কিরামদের কাছে আম্বিয়া, আউলিয়া ও সালিহিনদের তাওয়াসসুল করাটা একটি মুসতাহাব মুসতাহসান বিষয়। ইমাম নববি রাহ. রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর কাছে তাওয়াসসুল ও শাফাআতের কথা বলে বলেছেন,

و يتوسل به

তাঁর দ্বারা তাওয়াসসুল করা যাবে।[২০৯]

ইমাম সুবকি রাহ. রাসুলুল্লাহ সাঃ–এর কাছে তাওয়াসসুল, ইস্তিগাসা ও শাফাআত চাওয়ার বিষয়ে বলেন,

يحسن التوسل و الاستغاثة و التشفع بالنبي صلي الله عليه و سلم الي ربه سبحانه و تعالي

জেনে রাখো, নবি সাঃ-এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছে তাওয়াসসুল, ইসতিগাসা ও শাফাআত করাটা একটি মুসতাহসান বিষয়।

হাম্বলি মাজহাবের বিখ্যাত ইমাম ইবনু মুফলিহ হাম্বলি রাহ. যার বিষয়ে ইবনু তায়মিয়ার শিষ্য ইবনুল কাইয়িম রাহ. বলেছেন, 'আকাশের নিচে ইবনু মুফলিহ ছাড়া ভিন্ন কেউ ফিকহ ও ইমাম আহমাদের মাজহাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই।'[২১০] তিনি বলেন, 'সালিহিনদের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করা বৈধ, বলা হয় যে সেটা মুসতাহাব।'[২১১]

দেখা যাচ্ছে যে, তাওয়াসসুল বিশেষত আম্বিয়া, আওলিয়া ও সালিহিনদের অসিলায় দুআ প্রার্থনা করা কোনো অবৈধ জিনিস নয়; বরং তা বৈধ এবং মুসতাহাব একটি বিষয়।

খ. ইসতিগাসা

ইসতিগাসা আরবি غوث শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো সহায়তা, ত্রাণ প্রভৃতি। আরবি অভিধানে ইসতিগাসার শাব্দিক অর্থ করা হয়েছে, طلب الغوث বা সহায়তা প্রার্থনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ

আর স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের পর পর আগমনকারী এক হাজার ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করেছি।[২১২]

ইসতিগাসা কি ফি নাফসিহি শিরক নাকি এর কতিপয় সুরত রয়েছে, এ বিষয়টি জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরি। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কাছে ইসতিগাসা ফি নাফসিহি শিরক অথবা অবৈধ জিনিস নয়। ইসতিগাসার মৌলিক দুটি সুরত রয়েছে। প্রথমটি হলো, আল্লাহ তাআলার কাছে সরাসরি ইসতিগাসা করা। যেমন : কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ

দ্বিতীয় সুরতটি হলো, বান্দার কাছে ইসতিগাসা করা। এ ক্ষেত্রে আবার দুইটি সুরত রয়েছে। যদি কোনো বান্দা অপর কোনো বান্দার কাছে সহায়তা চায় এবং সে এ ধারণা রাখে যে, উক্ত বান্দা সহায়তার ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া সে কিছু দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তখন এ ধরনের ইসতিগাসা শিরক হিসেবে গণ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি ডাক্তারের কাছে যায় এ নিয়ত রেখে যে, ডাক্তার রোগ সারানোর ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছা ছাড়া তিনি রোগ নিরাময় করতে পারেন, এ ক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছে রোগ নিরাময়ের এ আশা বা চাওয়াটা শিরক হিসেবে পরিগণিত হবে। আশরাফ আলি থানবি রাহ. (১৩৬২ হি) এ বিষয়ে বলেন,

যদি মাখলুকের কাছে ইসতিগাসা ও তার কাছে ইসতিমদাদ এ আকিদা রাখা হয় যে, মুসতায়িন (অর্থাৎ, যার কাছে ইসতিগাসা করা হচ্ছে) তার ইলমগত ও কুদরতগতভাবে মুসতাকিল (স্বাধীন) ও (ইসতিগাসার শক্তি) আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নয়, তাহলে সেটা শিরক হবে।[২১৩]

---

২০৯. আল-মাজমু : ৮/২৭২

২১০. المقصد الارشد ۵۱۷/۲

২১১. আল-ফুরু : ৩/২২৯

২১২. সুরা আনফাল : ৯

২১৩. ইমদাদুল ফাতাওয়া : ৫/৩৬৪-৩৬৫

www.muslimdm.com

তবে কেউ যদি আল্লাহ সবকিছু দেওয়ার একমাত্র মালিক হিসেবে মেনে কোনো বান্দার কাছে কিছু প্রার্থনা করে, এ ধরনের ইসতিগাসা শিরক বা হারাম হিসেবে পরিগণিত হবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে মাখলুকের কাছে চাওয়া হলেও এর মূল উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া। শায়খুল ইসলাম ইমাম জাহিদ কাউসারি রাহ. তাওয়াসসুলের ওপর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন যার নাম হলো, محق التقول। যেহেতু ইসতিগাসা তাওয়াসসুলের একটি অংশ সেহেতু তিনি পুস্তিকাটির শেষে এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিয়ে এসেছেন। উক্ত অধ্যায়ে واذا استعنت فاستعن بالله হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

> তার অর্থ হলো, কোনো সহায়তাকারীর কাছে সহায়তা চাওয়ার সময় তুমি আল্লাহর কাছে সহায়তা চাও।[২১৪]

উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো দোকানদারের কাছে কিছু চায়, সে ক্ষেত্রে তার এ বিশ্বাস রাখাটা জরুরি যে, উক্ত দোকানদারের কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই, সে যা কিছু দিচ্ছে তা আল্লাহর অনুমতিতে দিচ্ছে, আর যা কিছু দিচ্ছে আল্লাহর থেকে দিচ্ছে। অতএব, বাহ্যিক চাওয়াটা দোকানদারের কাছে হলেও তার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর কাছে চাওয়া। এরকমভাবে সকলের কাছে মৃতের রুহের থেকে ইসতিগাসার বিষয়টি অনুরূপ।

তবে কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, দোকানদার নিজেই কিছু দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। অথবা সে চাওয়া বস্তুটি দেওয়ার মালিক। দেওয়ার ক্ষেত্রে সে স্বাধীন, তার ওপর আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতির দরকার পড়ে না, সে ক্ষেত্রে সে শিরক করবে। অনুরূপভাবে যদি এ আকিদা রেখে মৃতের রুহের কাছে সে চায়, তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে। এ ক্ষেত্রে যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে তিনি জীবিত হন বা মৃত, তথা বারজাখি জগতের বাসিন্দা হন সকল ক্ষেত্রে এ ধরনের ইসতিগাসা বৈধ। কেবল ওই সকল বিদআতি যারা শরিয়তের দলিল অস্বীকারপূর্বক রুহের ধ্বংসে বিশ্বাস করে তারা জীবিত ও মৃতের কাছে ইসতিগাসার ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্ণয় করে থাকে। ইমাম জাহিদ কাউসারি রাহ. এ বিষয়ে বলেন,

> আর কেবল যারা রুহের ধ্বংসের বিশ্বাস পোষণ করে, তাদের মধ্য থেকে সেটার বিষয়ে জীবিত ও মৃতের মধ্যকার পার্থক্য (এর কথা) প্রকাশ পায়।[২১৫]

কবরস্থ আম্বিয়া অথবা আউলিয়ায়ে কিরামদের কাছে ইসতিগাসার উদাহরণ খায়রুল কুরুনেই পাওয়া যায়। ইমাম ইবনু আবি শায়বা রাহ. তাঁর মুসান্নিফে এবং ইমাম বুখারি রাহ. তাঁর তারিখে একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, যেখানে উমর রা.-এর সময় একটি দুর্ভিক্ষ চলাকালীন এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর রওজায় এসে তাঁর কাছে বৃষ্টির জন্য ইসতিগাসা করেন এবং রাসুলুল্লাহ সাঃ উক্ত ব্যক্তিকে স্বপ্নযোগে বৃষ্টির সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। রিওয়ায়াতটি হলো,

> وعن مالك الدار و كان خازن عمر قال اصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل الي قبر النبي صلي الله عليه و سلم فقال يا رسول الله و في رواية يا محمداه استسق لامتك فانهم قد هلكوا، فاتاه رسول الله ﷺ في المنام، فقال: ائت عمر فاقرئه مني السلام و أخبره انكم مسقون و قل له عليك بالكيس الكيس فاتي الرجل فاخبر عمر و قال: يا رب لا آلو ما عجزت عنه

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. রিওয়ায়াতটির সনদ সহিহ বলে উল্লেখ করেছেন।[২১৬] ইবনু কাসির রাহ. 'মুসনাদু উমর'-এর মধ্যে বর্ণনাটির সনদ জাইয়িদুন কাউইয়ুন বলে উল্লেখ করেছেন।

ইসতিগাসার বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের চার মাজহাবের জমহুর আইম্মায়ে কিরাম এটির বৈধতা প্রদান করেছেন। এখানে আমরা কতিপয় বরেণ্য ইমামদের ইসতিগাসা সম্পর্কে অভিমত তুলে ধরার চেষ্টা করব।

ইমাম তাজ উদ্দিন সুবকি রাহ. ইসতিগাসা, তাওয়াসসুল ও শাফাআত বৈধ হওয়া সম্পর্কে বলেন,

> নবি সাঃ-এর দ্বারা আল্লাহর কাছে তাওয়াসসুল, ইসতিগাসা ও শাফাআত জায়িজ ও মুসতাহসান।[২১৭]

---

২১৪. محق التقول في مسألة التوسل لشيخ الاسلام الامام زاهد الكوثري قدس سره، ص ٢١

২১৫. محق التقول ص ٤

২১৬. و قال ابن كثير في مسند الفاروق اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف (١٢-٣١-٣٢)، و البخاري في تاريخه (٣٠٤/٧) وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤٩٥/٢) اسناده صحيح (٢٢٣/١): اسناد جيد قوي

২১৭. شفاء السقام ، ص ١٢١

শাফিয়ি মাজহাবের প্রণিধানযোগ্য ফাতওয়ার গ্রন্থে ইসতিগাসা জায়িজ হওয়ার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে,

> নবি ও রাসুলগণ, আওলিয়া, উলামা ও সালিহিনদের কাছে ইসতিগাসা করা বৈধ।[২১৮]

ইমাম কাসতালানি রাহ. ইসতিগাসা জায়িজ হওয়ার বিষয়ে বলেন,

> আর জিয়ারতকারীর তাঁর ﷺ কাছে দুআ, মিনতি করা, ইসতিগাসা, শাফাআত ও তাওয়াসসুল বেশি বেশি করা উচিত।[২১৯]

ইমাম ইবনু হাজার হাইতামি রাহ. ইসতিগাসার ব্যপারে ইবনু তাইমিয়ার মতকে খণ্ডন করে বৈধ হওয়ার বিষয়ে বলেন,

> ইবনু তাইমিয়ার খোরাফাতসমূহের মধ্যে একটি যেটি তার আগে কোনো আলিম বলেননি আর যেটা (বলার দ্বারা) তিনি আহলে ইসলামদের মধ্যে দৃষ্টান্ত হয়ে গেছেন সেটা হলো, তিনি তাঁর ﷺ কাছে তাওয়াসসুল ও ইসতিগাসাকে অস্বীকার করেছেন; কিন্তু বিষয়টি তাঁর মিথ্যার মতো নয় (অর্থাৎ, এগুলো বৈধ জিনিস)।[২২০]

এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইবনু তাইমিয়ার আগে কোনো আলিম কখনো ইসতিগাসাকে অস্বীকার করেননি বা অবৈধ প্রতিপন্ন করেননি। ইবনু তাইমিয়া প্রথম এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে কেউ কেউ বলেন, শেষ জীবনে তিনি তাঁর অবস্থান থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং ইস্তিগাসার বৈধতাকে স্বীকার করেছিলেন।

ইমাম তাফতাজানি রাহ. ইসতিগাসা জায়িজ হওয়ার বিষয়ে লিখেছেন,

> আর এ কারণে কবর জিয়ারত এবং মৃতদের মধ্য থেকে সালিহিনদের আত্মার কাছে ইসতিগাসার দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।[২২১]

ইমাম জাহাবি রাহ. ইমাম আবু বকর আল–মুকরি রাহ. কর্তৃক ইসতিগাসার একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি এরকম যে,

> একদা ইমাম মুকরি, ইমাম তাবারানি ও অপর একজন মদিনায় অবস্থান করছিলেন। তিনি সেখানে ক্ষুধাতুর হয়ে পড়লে রওজা আতহারে গমন করে বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, (আমাদের) ক্ষুধা (পেয়েছে)।'
>
> এ কথা শুনে ইমাম তাবারানি বললেন, 'বসুন, (এখন) হয় রিজিক আসবে না হয় মৃত্যু।'
>
> হঠাৎ কিছুক্ষণ পর ইমাম মুকরি রাহ. দেখলেন দুটি ছেলে দুটি ঝুড়ি ভর্তি অনেক খাবার দাবার নিয়ে হাজির। তাদের একজন ইমামদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কি আমার ব্যপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ দিয়েছেন?'। এরপর সে জানাল, তার ঘুমের মধ্যে রাসুলুল্লাহ তাকে স্বপ্নযোগে ইমামদের কাছে কিছু খাবার নিয়ে যাওয়ার আদেশ প্রদান করেছিলেন।[২২২]

ইবনু তাইমিয়া রাহ.-এর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইমাম সারসারি তুফি হাম্বলি রাহ.। তিনি তাঁর বিখ্যাত বই 'আল-ইশারাতুল ইলাহিয়া' তে ইবনু তাইমিয়ার ইসতিগাসার বিষয়ে নেতিবাচক মন্তব্যের বিপক্ষে ইমাম জাজারি রাহ.-এর ইসতিগাসার পক্ষের মত সমর্থন করেছেন। তিনি তাঁর বইয়ের ৪৭৯ পৃষ্ঠায় القول في سورة القصص শীর্ষক অধ্যায়ে ইসতিগাসার পক্ষে একটি আলোচনা পেশ করেছেন।

তিনি ইমাম জাজারি রাহ.-এর বরাতে বলেন, 'যদি মুসা আ.-এর কাছে ইসতিগাসা বৈধ হয়, তবে মুহাম্মাদ ﷺ হলেন অধিক হকদার। কারণ, তিনি ইজমাক্রমে শ্রেষ্ঠতম।'[২২৩]

---

২১৮. ফাতওয়া আর-রামলি : ২/২৭৪

২১৯. আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া : ৩/৫৯৩

২২০. الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف المكرم، ص ١٤٨-١٥١

২২১. শারহুল মাকাসিদ : ২/৪৩

২২২. سير اعلام النبلاء، ج ١٢، ابن المقرئ، ص ٤٥٢، ط- بيروت دار الفكر

ইমাম তুফি রাহ. ইসতিগাসার পক্ষে বিভিন্ন দলিল পেশ করার পর ইসতিগাসা বৈধ হওয়ার বিষয়ে বলেন, 'তাওহিদের উপর বিশ্বাস লাওয়াজিমুল ইসলামের একটি। অতএব, যখন আমরা কোনো মুসলিমকে কোনো মাখলুকের কাছে ইসতিগাসা করতে দেখি, তখন আমরা নিশ্চিত জানি যে, সে ওই ব্যক্তির কারণে মুশরিক হবে না। কারণ, সেটা (ইসতিগাসা) তার কাছ থেকে সহায়তা চাওয়া অথবা ওই ব্যক্তির বরকতে আল্লাহর কাছে তাওয়াজ্জুহ কামনা করা।'[২২৪]

জীবিতের পাশাপাশি মৃত তথা আরওয়াহে মুতাহহারার কাছে ইসতিগাসা বৈধ হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'ইসতিগাসা যখন জীবিতের সঙ্গে বৈধ তখন তা মৃতের সাথেও একই ব্যপার (অর্থাৎ, বৈধ)। বরং তা অধিক উত্তম...'[২২৫]

ইমাম আবদুল আজিজ দেহলবি রাহ. তাঁর তাফসিরে বলেন,

> ওফাতপ্রাপ্ত আওলিয়া ও মুমিন সালিহিনবর্গ থেকে ইসতিফাদা, ইসতিমদাদ (মদদ) ও ইসতিআনাত (ইসতিগাসা) জারি ও সারি (থাকে)।[২২৬]

এ ছাড়াও আরও বহু আইম্মায়ে কিরামদের থেকে ইসতিগাসার বৈধতার ব্যপারে মতামত পাওয়া যায়, যা লিখতে গেলে পরিচ্ছেদটি গ্রন্থের রূপ নেবে।

গ. শাফাআত

ইসতিগাসার আরেকটি প্রকার হলো শাফাআত। শাফাআত হলো, কোনো ব্যক্তির কাছে সুপারিশ চাওয়া। শাফাআতের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে 'শরহু আকায়িদুন নাসাফি' গ্রন্থের পার্শ্ব টীকায় উল্লেখ করা হয়, পরিভাষায় শাফাআতের অর্থ হলো, 'শাস্তি রহিত করা ও গুনাহ মার্জনার প্রার্থনা করা।' ইমাম ইবনুল আসির রাহ. বলেন, পরিভাষায় শাফাআতের অর্থ হলো, 'শাস্তি রহিত করা ও গুনাহ মার্জনা প্রার্থনা করা।' শরয়ি সংজ্ঞা হলো, কবিরা গুনাহ বা সগিরা গুনাহ মাফ করানো, শাস্তি হালকা বা পরিপূর্ণরূপে রহিত করানো বা জান্নাতের পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে তাঁর আম্বিয়া, আওলিয়া ও শুহাদায়ে কিরাম, এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য প্রিয়ভাজনদের মাধ্যমে নাজাতের সুপারিশ করার আবেদন করাকে শাফাআত বলে।

কুরআন-সুন্নাহ থেকে আম্বিয়া, আওলিয়া ও শুহাদায়ে কিরামদের কাছে শাফাআতের দলিল মেলে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> আমি রাসুল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হয়। যখন তারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে চলে আসত আর আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হত এবং রাসুলও তাদের পক্ষে ক্ষমা চাইতেন, তাহলে তারা আল্লাহকে নিরতিশয় তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালুরূপে পেত।[২২৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরিনরা বলেছেন, নবি সাঃ-এর কাছে তাঁর জীবিত অথবা ইহকাল ত্যাগের পর তাঁর রওজা মুবারকে শাফাআত প্রার্থনা করলে আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেবেন। ইমাম কুরতুবি রাহ. তাঁর তাফসিরে বিভিন্ন রিওয়ায়াতের আলোকে রওজা মুবারকে গমন করে শাফাআত করার বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

প্রসিদ্ধ আকায়িদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

> কবিরা গুনাহকারীদের জন্য সম্মানিত নবি-রাসুলগণ এবং নেককার বান্দাদের শাফাআত বা সুপারিশ করা মাশহুর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এবং শাফাআত তথা সুপারিশের হাদিসসমূহ অর্থের দিক দিয়ে মুতাওয়াতির পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত।[২২৮]

---

২২৩. আল-ইশারাতুল ইলাহিয়া : ৪৮০

২২৪. আল-ইশারাতুল ইলাহিয়া : ৪৮০

২২৫. আল-ইশারাতুল ইলাহিয়া : ৪৮০

২২৬. تفسير عزيزي 30:50

২২৭. সুরা নিসা : ৬৪

২২৮. শরহু আকায়িদুন নাসাফি

শাফাআতের বিষয়ে হুকুম হলো, ইসতিগাসা বা তাওয়াসসুলের অনুরূপ। অর্থাৎ, আরওয়াহে মুতাহহারার কাছে শাফাআত চাওয়াও বৈধ। শাফাআত সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আইম্মায়ে কিরামদের কিছু কথা নিচে তুলে ধরা হলো :

রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর শাফাআত সম্পর্কে ইমামে আজম আবু হানিফা রাহ. বলেন,

> আমাদের নবি সাঃ কর্তৃক পাপিষ্ঠ মুমিন ও কাবিরা গুনাহগার যাদের মধ্যে রয়েছে, ওইসব ব্যক্তি যাদের উপর শাস্তি আবশ্যক হয়েছে তাদের জন্য শাফাআত প্রমাণিত সত্য।[২২৯]

ইমাম কামাল হানাফি রাহ. রাসুলুল্লাহ সাঃ–এর রওজা আতহার জিয়ারতের শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন,

> এরপর নবি সাঃ-এর কাছে শাফাআত প্রার্থনা করবে এবং বলবে, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আপনার শাফাআত প্রার্থনা করছি...'[২৩০]

ইমাম জাকারিয়া ইবনু আহমাদ আনসারি রাহ. রওজাপাক জিয়ারতের শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন,

> তাঁর (ﷺ) কাছে তাওয়াসসুল ও শাফাআত প্রার্থনা করবে।[২৩১]

ইমাম শায়খ জাদাহ বিন আবদুর রাহমান হানাফি রাহ. তাঁর গ্রন্থে রওজা আতহার জিয়ারতের শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন,

> এবং বলবে 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আপনার কাছে শাফাআতে কুবরা প্রার্থনা করছি।'

অতএব, আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাওয়াসসুল, শাফাআত ও ইসতিগাসা বৈধ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম। মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ও তাঁর জামাআত এ তিনটিকে শিরকে আকবার বলে মনে করতেন এবং তা দ্বারা মুসলিমদের তাকফির-তাবদি করতেন। ইবনু আবদুল ওয়াহহাব তাঁর বই কাশফুশ শুবুহাতের একাদশতম অধ্যায়টি রচনা করেছেন, জাহিলি যুগের মুশরিক ও তাঁর যুগের মক্কার মুশরিক (মুমিনদের) মধ্যে পার্থক্য সূচিত করার জন্য। উক্ত অধ্যায়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তাঁর যুগের মুসলিম যারা মাজারে গিয়ে শাফাআত, তাওয়াসসুল ইত্যাদি করত তারা আগের যুগের মুশরিকদের থেকে নিকৃষ্ট। তিনি সেখানে তাওয়াসসুল, ইসতিগাসা বা শাফাআতকে আল্লাহর সঙ্গে মাখলুকের ইবাদত হিসেবে পরিগণিত করে লিখেছেন,

> যে ব্যক্তি এ মসআলা বুঝবে যেটি আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে পরিষ্কার করেছেন যে, মুশরিক যাদের বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাঃ লড়াই করেছেন—সাচ্ছন্দের সময়ে আল্লাহকে ডাকত এবং তিনি ছাড়া অন্যান্য (দেবদেবীকে) ডাকত, কিন্তু দুঃখ ও কষ্টের সময় কেবল আল্লাহকে ডাকত যার কোনো শরিক নেই এবং তাদের মোড়লদের ভুলে যেত, এ জন্য আমাদের যুগের মানুষদের শিরক ও পূর্ববর্তীদের শিরকের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ হয়ে পড়বে।[২৩২]

এখানে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব মূলত তাঁর যুগের মুশরিক বলতে মুসলিমদের বুঝিয়েছেন যারা আউলিয়া ও আম্বিয়াগণের কাছে তাওয়াসসুল, ইসতিগাসা ও শাফাআত চাইত। কারণ, তিনি কবরের কাছে গিয়ে এগুলো করাকে শিরকে আকবার মনে করতেন।

তিনি তাঁর যুগের মুসলিমদের পূর্ববর্তী যুগের মুশরিকদের থেকে বড় মুশরিক গণ্য করেছেন এর কারণ হলো, পূর্ববর্তী মুশরিকরা তাঁর ভাষ্যে কঠিন সময়ে কেবল আল্লাহকে ডাকত; কিন্তু যেহেতু মুসলিমরা তাওয়াসসুল, ইসতিগাসা ইত্যাদিকে মুসতাহসান মনে করতেন যেমনটা আমাদের ইমামরা বলে গেছেন, তারা দুঃখ ও দূর্দশাতেও এগুলো করতেন। সেহেতু ইবনু আবদুল ওয়াহহাব তাদের পূর্ববর্তী মুশরিকদের থেকে নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন।

অথচ আমরা আগের আলোচনাতে দেখেছি, ইসতিগাসা, তাওয়াসসুল এগুলো কখনো শিরক নয় অথবা এ ক্ষেত্রে যাদের অসিলা চাওয়া হচ্ছে তাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা হয় না; বরং এগুলোর ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা থাকেন। তা ছাড়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে

---

২২৯. আল-ফিকহুল আকবার : ৩০৪

২৩০. ফাতহুল কাদির : ৩/১৬৯

২৩১. ফাতহুল ওয়াহহাব : ১/২৫৭

২৩২. কাশফুশ শুবুহাত : ৩৪

উম্মাহ ক্রমে বৈধ ও মুসতাহসান বিষয়। কিন্তু নজদি এগুলোকে মুশরিকদের সঙ্গে তুলনাই দেননি, পাশাপাশি এগুলোর কারণে তাঁর যুগের মুসলিমদের মুশরিক প্রতিপন্ন করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব তাঁর বইয়ে বিশেষত কাশফুশ শুবুহাত, কিতাবুত তাওহিদ ও আদ-দুরারে শাফাআতকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যার মধ্যে এক প্রকারকে তিনি বৈধ জ্ঞান করেন যেটি কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর অনুমতিতে রাসুলুল্লাহ করবেন। কিন্তু দুনিয়াতে রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর রওজাপাকে অথবা আউলিয়ায়ে কিরামদের কাছে শাফাআতের সুপারিশ করার অনুরোধ করাকে তিনি শিরকে আকবার জ্ঞান করতেন এবং এ ধরনের শাফাআত চাওয়াকে তিনি কবরবাসীর ইবাদত বলে মনে করতেন, নাউজুবিল্লাহ। তিনি তাঁর বইয়ে শাফাআতের অধ্যায়ে লিখেছেন,

> যদি তিনি (অর্থাৎ, শাফাআত প্রার্থনাকারী মুসলিম যাদের তিনি মুশরিক জ্ঞান করতেন) নবি ﷺ-কে শাফাআত (এর অনুমতি) দেওয়া হয়েছে আর আমি তাঁর থেকে তাই চাই, যা আল্লাহ তাআলা তাঁকে দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে উত্তর হলো আল্লাহ তাআলা তাঁকে শাফাআত দিয়েছেন। কিন্তু তোমাকে এ কাজ থেকে (অর্থাৎ, তাঁর কাছে শাফাআত চাওয়া থেকে) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ডেকো না।[২৩৩]

এ ইবারতে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নবি সাঃ-এর রওজা আতহারে শাফাআত প্রার্থনাকে কবরবাসীর পূজা হিসেবে দেখিয়েছেন। সে কারণে তিনি কুরআনে মুশরিকদের বিষয়ে আগত আয়াত (কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ডেকো না) মুসলিমদের বিরুদ্ধে লাগিয়েছেন, যেহেতু তিনি তাদের মুশরিক জ্ঞান করতেন। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক; অথচ আহলুস সুন্নাতের কাছে রওজা মুবারকে গমনপূর্বক রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর কাছে শাফাআত প্রার্থনা, আউলিয়াদের কাছে শাফাআতের সুপারিশ চাওয়া জায়িজ ও মুসতাহসান বিষয় যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। কিন্তু ওয়াহাবিরা এটিকে শিরকে আকবার মনে করত এবং এগুলো দিয়ে মুসলিমদের জুলম করে তাকফির ও হত্যা করত।

ইবনু আবদুল ওয়াহহাব তাঁর বইয়ে আম্বিয়া ও আউলিয়াদের কাছে শাফাআত চাওয়া মুসলিমদের সুস্পষ্ট ভাষায় মুশরিক বলে উল্লেখ করেছেন। দুনিয়াতে শাফাআত প্রার্থনাকারী মুসলিমদের মুশরিক হিসেবে উল্লেখ করে তিনি লেখেন,

> তার উদাহরণ হলো যেমনটি কতিপয় মুশরিকরা বলে থাকে : শুনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না। (ইউনুস : ৬২) এবং শাফাআত সত্য।[২৩৪]

অনেকে ধারণা করতে পারেন, এখানে হয়তো নজদি সাহেব মুশরিক বলতে প্রকৃতার্থে মুশরিকিনদের বুঝিয়েছেন; কিন্তু সেটা ভুল ধারণা। মুশরিকরা কখনোই আউলিয়া অথবা আল্লাহতে বিশ্বাসি নয়, আর না তারা কুরআন থেকে শাফাআতের দলিল দিয়ে থাকে অথবা শাফাআতে বিশ্বাসী। এখানে নজদি সাহেব মুশরিক বলতে মূলত শাফাআতকারী মুসলিমদের বুঝিয়েছেন যারা ওয়াহাবিদের ভ্রান্ত মতবাদ রদে ও শাফাআত জায়িজ প্রমাণ করতে উপরোক্ত আয়াতটি দলিল হিসেবে ব্যবহার করতেন।

এখানে একটা কথা পরিস্কার করে দেওয়া প্রয়োজন যে, কেবল তাওয়াসসুলের ক্ষেত্রে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব কিছু ছাড় দিতেন। তিনি দুআর মধ্যে তাওয়াসসুল করাকে শিরক নয় মাকরুহ মনে করতেন। তবে কবরের পাশে তাওয়াসসুল অথবা শাফাআত অথবা ইসতিগাসাকে তিনি শিরক মনে করতেন। শায়খুল ইসলাম ইমাম জাইনি দাহলানসহ অন্যান্য বহু আইম্মায়ে আহলুস সুন্নাহ তাদের গ্রন্থাবলীতে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। মিসবাহুল আনাম বইয়ে ওয়াহাবিদের কর্তৃক তাওয়াসসুলকারীদের তাকফিরের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত বইয়ের ৩৪ পৃষ্ঠায় ইবনু আবদুল ওয়াহহাব কর্তৃক তাওয়াসসুলকারীদের তাকফিরের বিষয়ে বলা হয়েছে,

> তার (অর্থাৎ, ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের) প্রলাপ ও খোরাফাতসমূহের মধ্যে একটি হলো তার কথা যে, কাসদুস সালিহিন, তাদের উপর বিশ্বাস এবং তাদের থেকে বরকত হাসিল করা হলো শিরকে আকবার।

১০. শাদ্দুর রিহালের মাসআলায় চরম বাড়াবাড়ি

২৩৩. কাশফুশ শুবুহাত : ২৫

২৩৪. কাশফুশ শুবুহাত : ১৬

শাদ্দুর রিহাল বা রওজাপাক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর আহলুস সুন্নাতের চার মাজহাবের মতে বৈধ। কিন্তু এ মাসআলায় বিচ্ছিন্ন মত প্রদান করেন ইবনু তাইমিয়া। তিনি আহলুস সুন্নাহ থেকে বিচ্ছিন্ন মত দিয়েছেন যে, রওজাপাক জিয়ারতের জন্য সফর করা বৈধ নয়। তবে এ মাসআলায় ওয়াহাবিরা অধিক বাড়াবাড়ি করেছিল এবং জিয়ারতে নিষেধাজ্ঞাসহ জিয়ারতকারী, তাওয়াসসুলকারীদের তাকফির করেছিল। ইমাম জাইনি দাহলান রাহ. বলেন, 'মোটকথা হলো যে, ওই সকল জিয়ারত ও তাওয়াসসুলে নিষেধকারীরা সীমা অতিক্রম করেছিল, উম্মতের অধিকাংশকে তাকফির করেছিল এবং তাদের রক্ত ও সম্পদকে হালাল করেছিল।'[২৩৫]

১১. নিদাকারীকে তাকফির করা

নিদা অর্থ আহ্বান করা। এখানে কোনো পরলোকগত ব্যক্তির নাম ধরে ডাকাকে নিদা বলে বোঝানো হয়েছে। কেউ যদি আবেগ, অনুরাগ ও প্রেমবশত আকিদা ঠিক রেখে নিদা করে সেটা বৈধ; কিন্তু ওয়াহাবিরা নিদাকে মুতলাকান শিরক হিসেবে পরিগণিত করত এবং নিদার কারণে মুসলিমদের তাকফির করত। ইতিপূর্বে আমরা ইতিহাস পর্বে দেখেছি যে, কেবল 'ইয়া মুহাম্মাদ' বলে নিদা করার কারণে মুসলিমদের তাকফির করত। ইমাম জাইনি দাহলান রাহ. তাঁর বইয়ে ওয়াহাবিদের এ খোরাফাত সম্পর্কে বলেন,

> ওই সকল জিয়ারত ও তাওয়াসসুল অস্বীকারকারীদের আকিদাসমূহের একটি হলো, তারা মৃত ও নিষ্প্রাণের নিদার নিষিদ্ধতায় বিশ্বাস করত। আর তারা বলে যে, সেটা কুফর, শিরক ও গায়রুল্লাহর ইবাদত।[২৩৬]

১২. আশআরিদের তাকফির

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মূলত দুই আকিদার ওপর ভিত্তি করে দন্ডায়মান। এর একটি হলো, আশআরি যার ইমাম ছিলেন ইমামু আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামাত আবুল হাসান আশআরি রাহ. এবং অপরজন হলেন, ইমামুল হুদা আবু মানসুর মাতুরিদি রাহ.। অনেকে আবার হাম্বলি আকিদা বলে আরও একটি ভাগ করেন, যার ইমাম হলেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রা.। ফলে আহলুস সুন্নাহর মোট আকিদা হলো তিনটি। এর বাইরে যা কিছু রয়েছে তা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত বিবর্জিত। ইমাম ইবনু আসাকির রাহ. আশআরি মাজহাবকে আহলুস সুন্নাতের মাজহাব হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন,

> আর আমরা এ কথাটাই মেনে নেই না যে, আবুল হাসান (আশআরি) পঞ্চম কোনো মাজহাব তৈরি করেছেন; বরং তিনি আহলুস সুন্নাতের মাজহাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যা বিদআতিদের কাছে একটি শিক্ষা হয়ে রয়ে গেছে।[২৩৭]

ইমাম তাজউদ্দিন সুবকি রাহ. ইমাম আশআরি রাহ.-কে সালাফের মাজহাবের সত্যায়নকারী হিসেবে ভূষিত করেছেন। হাম্বলিদের আকিদার বই তাবসিরুল কানের ৭৫ পৃষ্ঠায় ইমাম শাত্তি হাম্বলি রাহ. আশআরি ও মাতুরিদিদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের তিনটি আকিদার মধ্যে পরিগণিত করেছেন। আশআরি ও ইমাম আবুল হাসান আশআরি রাহ.-এর বিষয়ে ইমাম শাহরিস্তানি রাহ. বলেন,

> আশআরিরা হলো, আবুল হাসান ইবনু ইসমাইল আশআরির অনুসারী যিনি আবু মুসা আশআরি রা.-এর দিকে মানসুব। আর আমি অদ্ভুত মিলের ব্যাপারে শুনেছি যে, আবু মুসা আশআরি ঠিক ওই আকিদা রাখতেন যা আবুল হাসান তাঁর মাজহাবে নির্ধারণ করেছেন।[২৩৮]

ইমাম জুবায়দি রাহ. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বর্ণনায় বলেন, 'যখন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত শব্দটি প্রয়োগ করা হয়, তখন তার দ্বারা আশআরি ও মাতুরিদি অর্থ নেওয়া হয়।'[২৩৯] ইমাম আবদুল বাকি হাম্বলি রাহ. আহলুস সুন্নাতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আহলুস সুন্নাতের দল তিনটি, আশআরি, হাম্বলি ও মাতুরিদি'।[২৪০] অতএব দেখা যাচ্ছে, আশআরিরা হলেন, আহলুস সুন্নাতের দুই মতান্তরে তিন ভিত্তির একটি অন্যতম ভিত্তি। কিন্তু ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ও তাঁর অনুসারীরা অন্যায়ভাবে আশায়িরা তথা আশআরি ও মাতুরিদিদের তাকফির ও তাবদি (বিদআতি

---

২৩৫. আদ-দুরারুস সুন্নিয়া ফির রাদ্দি আলাল ওয়াহহাবিয়া : ৩৯

২৩৬. আদ-দুরারুস সুন্নিয়া ফির রাদ্দি আলাল ওয়াহহাবিয়া : ৩৪

২৩৭. تبيين كذب المفتري : ৩৬০

২৩৮. الملل و النحل ٩٤/١

২৩৯. اتحاف السادة المتقين

২৪০. العين و الاثر

প্রতিপন্ন করা) করত। তারা মনে করত, উম্মতের জমহুর অংশ আশআরি ও মাতুরিদিরা আহলুস সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যেহেতু তারা তাদের নবউদ্ভাবিত তাওহিদের অনুসারী ছিলেন না। ওয়াহাবিদের বইয়ে আশআরিদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তারা তাওহিদ বোঝে না।

> তারা (অর্থাৎ, মুতাআখখিরিন আশআরি ইমাম ও উলামারা) উলামাদের কথা জানতেন না; অথচ তাদের উলামা হিসেবে পরিগণিত করা হয়ে থাকে। আর তারা তাওহিদের বিষয়েও ভুল করেছিল এ অবস্থায় যে তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মর্মটুকুও বুঝত না।[২৪১]

অন্য জায়গায় কিছু কুযুক্তি ও জাহালতপূর্ণ কথাবার্তা দিয়ে আশআরিদের আহলুস সুন্নাত থেকে খারিজ করে দিয়ে বলা হয়েছে,

> যখন তুমি সেটা বুঝলে, তখন তুমি যারা আশআরিদের আহলুস সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত করে তাদের ভুলটা বুঝতে পারলে।[২৪২]

আরেক জায়গায় আশআরি ইমামদের শয়তান এবং আশআরিদের পথভ্রষ্ট ও শিরকের দায়ে অভিযুক্ত করে বলা হয়েছে,

> এ সত্যবিমুখ দলটির (অর্থাৎ আশআরিরা) বিষয় হলো, তাদের শয়তানগুলো মানুষকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত করতে নিয়োজিত হয়েছে। তারা তাওহিদে ইলাহিয়াকে অস্বীকার করেছে এবং শিরকের অনুমোদন দিয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন না। তারা তাঁর (আল্লাহ) ছাড়া অন্যদের ইবাদতের অনুমতি দিয়েছে এবং তা'তিলের মাধ্যমে তাঁর সিফাতের তাওহিদকে অস্বীকার করেছে।[২৪৩]

মাআজাল্লাহ। এখানে ওয়াহাবি মুনহারিফ তাকফিরি বিদতিরা কেবল মুতাআখখিরিন আশআরি ইমামদের শয়তান বলেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং আশআরিদের বিরুদ্ধে দিয়েছে একগুচ্ছ মিথ্যা অপবাদ। যেমন : আশআরিরা আল্লাহ ছাড়া গায়রুল্লাহর ইবাদতের অনুমতি দিয়েছে। আশআরিদের উপর দেওয়া ওয়াহাবিদের জঘন্যতম মিথ্যা অপবাদসমূহের মধ্যে এটি একটি। আশআরিরা যেহেতু তাওয়াসসুল ও ইসতিগাসাকে বৈধ জ্ঞান করতেন, তাই এসব খাওয়ারিজরা মনে করেছিল, তারা গায়রুল্লাহর ইবাদতের বৈধতা দিয়েছিলেন; অথচ এগুলো কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মাহ দ্বারা প্রমাণিত যেমনটা ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি।

দ্বিতীয় যে জঘন্য অপবাদটি তারা দিয়েছিল সেটা হলো, আশআরি ইমামরা তা'তিল করতেন অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সিফাতসমূহকে অস্বীকার করতেন; অথচ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আশআরি ইমামরা আল্লাহর সিফাতকে শুধু স্বীকারই করেন না, পাশাপাশি তাজসিম (Anthropomorphism) বা আল্লাহকে আকার প্রদান ও তা'তিল অর্থাৎ, আল্লাহর সিফাতসমূহকে অস্বীকার উভয় আকিদাকে বাতিল হিসেবে পরিগণিত করেছেন।

পাঠকমণ্ডলির সুবিধার্থে আমরা এখানে কিছু আশআরি ইমামদের কথা পেশ করছি। আশআরি মাজহাবের আকিদার ইমামদের মধ্যে অন্যতম হলেন, ইমাম কাজি আবু বকর ইবনুত তাইয়িব বাকিল্লানি রাহ.। তিনি আল্লাহ তাআলার সিফাত সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

> আর জেনে রাখতে হবে যে, তিনি তাঁর জাতি সিফাতসমূহ দ্বারা চিরকাল বৈশিষ্ট্যান্বিত ছিলেন এবং থাকবেন।[২৪৪]

মুতাআখখিরিন আশআরি ইমামদের মধ্যে অন্যতম হলেন, ইমাম সানুসি মালিকি রাহ.। তিনি তাঁর আকিদার বই شرح المقدمات–এর মধ্যে আল্লাহ তাআলার সিফাতের উপর সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। অপর এক মুতাআখখিরিন আশআরি ইমাম হলেন, ইমাম মুহাম্মাদ জাওয়াহিরি রাহ.। তাওহিদের সংজ্ঞায়নে তিনি বলেন, 'অথবা আমরা বলি তা (অর্থাৎ, তাওহিদশাস্ত্র) হলো, এমন কিছু মাসআলা যাতে উজুদুল ওয়াজিব আর তাঁর সিফাতের—যার ইসবাত করা ওয়াজিব...(ইত্যাদি সম্পর্কে) আলোচনা করা হয়।'[২৪৫]

এ ছাড়াও তিনি উক্ত গ্রন্থে আল্লাহর সিফাত নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। ইমাম আবু আবদুহ মুহাম্মাদ তুনিসি মালিকি রাহ.

---

২৪১. আদ-দুরারুস সানিয়া : ১/৩২০-৩২১

২৪২. প্রগুক্ত : ৩৬৪

২৪৩. প্রগুক্ত : ৩/২১০-২১১

২৪৪. الانصاف للقاضي الباقلاني البصري، ص ٦٥ ، ت : زاهد الكوثري، المكتبة الازهرية للتراث

২৪৫. التحقيق التام للظواهري ص ٢

আশআরি ইমামদের একজন বরেণ্য ইমাম ছিলেন। তিনি তাঁর আকিদার বই المختصر الكلامي–এর দ্বিতীয় অধ্যায়টি রচনা করেছেন আল্লাহ তাআলার মহিমান্বিত সিফাতের উপর। অনুরূপভাবে সকল মুতাকাদ্দিমিন এবং মুতাআখখিরিন আইম্মায়ে আশায়িরা আল্লাহ তাআলার সিফাতসমূহের উপর ইমান আনয়নকে আবশ্যক জ্ঞান করেছেন এবং তা'তিলকে বাতিল ঘোষণা করেছেন। অতএব, আশআরিরা তা'তিল করে থাকে এটি ওয়াহাবি সম্প্রদায় কর্তৃক আরোপিত মিথ্যা একটি দাবি মাত্র।

১৩. রাসুলুল্লাহ সাঃ-কে শিরকের দায়ে অভিযুক্ত করা

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি শিরকের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে পৌঁছে গেছেন একদম শিরক মুক্ত অভিযানের উচ্চ মাকামে। শিরকের প্রেমে তিনি এতটাই ফানা হয়েছেন যে, স্বয়ং শিরকের বিধান আনয়নকারীও তাঁর কাছে শিরক থেকে মুক্ত নন। তিনি কুরআন মাজিদের সুরা মুদ্দাসসিরে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর প্রতি নির্দেশ সম্বলিত আয়াত وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ, 'আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করো'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'অর্থাৎ, তোমার আমলকে শিরক মুক্ত করো'।[২৪৬] এটা স্পষ্ট রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর উপর শিরকের অপবাদ যা ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের জঘন্যতম কাজের একটি। তাঁর আগে কোনো মুসলিম এমন ধৃষ্টতা দেখায়নি।

www.muslimdm.com

২৪৬. সালাসাতুল উসুলে : ২০

তৃতীয় অধ্যায়

আহলুস সুন্নাহর স্বনামধন্য ইমামদের তাকফির

www.muslimdm.com

ইসলামি শরিয়তে তাকফির একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। আর সেটা যদি হয় কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে তখন সতর্কতার মাত্রাটি আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফির করার ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়তে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের তাকিদ এসেছে। মহান রব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমে বলেছেন,

> হে মুমিনরা, যখন তোমরা আল্লাহর পথে যাত্রা করবে তখন কে বন্ধু আর কে শত্রু তা পরীক্ষা করে নেবে, কেউ তোমাদের সালাম করলে তাকে বলো না, 'তুমি মুমিন নও', তোমরা ইহজগতের সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করো, বস্তুত আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য প্রচুর গনিমত আছে। তোমরাও এর আগে এ রকমই ছিলে (অর্থাৎ, তোমারাও তাদের মতোই তোমাদের ইমানকে তোমাদের কওম থেকে গোপন করতে), এরপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপা করেছেন, কাজেই আগে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে নেবে; তোমরা যা কিছু করো, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।[২৪৭]

প্রিয় হাবিব সাঃ বিভিন্ন হাদিসে কোনো মুসলিমকে তাকফিরের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। আগের অধ্যায়ে তাকফির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাকফির ও তার প্রয়োগের বিষয়ে সতর্কতা নিয়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি ও তাঁর অনুসারীরা তাদের সময়ের মুসলিমদের আমভাবে তাকফির করার পাশাপাশি কোনোরকম বাছ-বিচার, যাচাই-বাছাই ছাড়াই জুলুমপূর্বক তাকফির করত। তাদের তাকফিরের সাঁড়াশি থেকে বাদ পড়েননি তদানীন্তন, পূর্ববর্তী বরেণ্য ও বরিষ্ঠ ইমামরাও। এ অধ্যায়ে আমরা ওয়াহাবিদের কর্তৃক উম্মাহর ইমামদের তাকফির ও তাদের শানে বেআদবির কিছু নমুনা উল্লেখ করব।

১. ইমামে আজম আবু হানিফা রাহ. (১৫০ হি.)–এর শানে নজদি ও তাঁর শাগরিদদের বেআদবি

ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি ও তাঁর অনুসারীরা মনে করত, তারা সবচেয়ে বিশুদ্ধ তাওহিদের অনুসারী এবং কুরআন-সুন্নাহর যেটা তারা বুঝেছে সেটাই সঠিক। সে কারণে তারা তাদের মতাদর্শের বাইরের সবাইকে অশুদ্ধ ও অচ্ছুৎ মনে করত এবং তাদের তাকফির-তাবদি করত। এমনকি তারা ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর মতো মুজতাহিদের শানেও বেআদবি করতে ছাড়ত না। ইমাম আবদুল্লাহ হাম্বলি রাহ. একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি এ রকম যে, কোনো এক সময় নজদের এক হানাফি ব্যক্তি ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের কাছে আগমন করেন এবং তাঁকে হানাফি ফিকহের একটি মুখতাসার দেন। ইবনু আবদুল ওয়াহহাব উক্ত বইটি হাতে নেওয়ার পর তা মাটিতে নিক্ষেপ করেন, এরপর ইমামে আজম

২৪৭. সূরা নিসা : ৯৪

রাহ.-এর শানে বেআদবি করে বলেন, ليس ابو حنيفة على شيء।248 ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের ধৃষ্টতা অবলোকনপূর্বক উক্ত ব্যক্তি বইটি মাটি থেকে তুলে পরিবারসহ নজদ ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। ইমাম আবদুল্লাহ বলেন উক্ত ব্যক্তির নাম ছিল, উমর ইবনু হামিদ।

ইমাম আবদুল্লাহ রাহ. আরও বলেন, ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ও তাঁর অনুসারীরা ইমামে আজম রাহ.-এর ভুল প্রতিপন্ন করত, তাঁর বিরোধিতা করত এবং তাঁকে গালমন্দ করত।[২৪৯]

২. ইমাম বুখারি রাহ. (২৫৬ হি.)-কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা

ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের ধৃষ্টতাসমূহের একটি হলো তিনি ইমাম বুখারি রাহ.-এর উপর মিথ্যার আরোপ লাগাতেন। ইমাম আবদুল্লাহ রাহ. এ বিষয়ে লেখেন,

> আর ইবনু আবদুল ওয়াহহাব বলেছেন, (ইমাম) বুখারি (রাহ.) সহিহ বুখারিতে পনেরোটি মিথ্যা বলেছেন।[২৫০]

৩. ইমাম ইবনু ফিরুজ হাম্বলি (১২১৬ হি.) ও ইমাম সালিহ ইবনু আবদুহ রাহ.-কে তাকফির

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির সমসাময়িক নজদের যত মহান মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন, ইমাম ও মুজাদ্দিদ ইবনু ফিরুজ হাম্বলি রাহ.। তাঁর পুরো নাম ছিল, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুহ ইবনু ফিরুজ আল-হাম্বলি আল-আহসায়ি আত-তামিমি রাহ.। ১১৪২ হিজরির ১৮ রবিউল আউয়াল নজদের আল-আহসা প্রদেশে এক সম্ভ্রান্ত দীনি পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ফিরুজ রাহ. ছিলেন সে যুগের একজন বিশিষ্ট ফকিহ। শৈশবে মাত্র নয় বছর বয়সে জুদারি বা গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। ফলে কেবল লাল রঙ ছাড়া অন্য কোনো রঙ দেখতে পেতেন না, কিন্তু তাঁর খোদাভীরুতা ও উৎসাহ তাঁকে ইলম অর্জন থেকে দমিয়ে রাখতে পারেনি।

তদানীন্তন নজদ ও হিজাজের বিখ্যাত বিখ্যাত শায়খদের থেকে তিনি হাদিস, ফিকহ, নাহু, বায়ানসহ সব বিষয়ে গভীর ইলম অর্জন করেন। উসতাজরা তাঁর প্রসংশায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তিনি হাদিস শিক্ষা নেন তদানীন্তন হিজাজ ও নজদের সুবিখ্যাত শায়খদের কাছে থেকে। যাদের মধ্যে ছিলেন, শায়খ আবুল হাসান সিন্ধি রাহ., মুহাম্মাদ সায়িদ সফরুল মাদানি রাহ., শায়খ ইমাম হায়াত সিন্দি হানাফি রাহ. ও শায়খ ইমাম ইবনুল আফালিক হাম্বলি রাহ. প্রমূখ থেকে। অল্পকালের মধ্যেই ইবনু ফিরুজ নজদের শ্রেষ্ঠতম আলিমদের মধ্যে একজন হয়ে উঠলেন। তাঁর জীবদ্দশায় নজদে ওয়াহাবি ফিতনার উদ্ভব ঘটে। ওয়াহাবিদের বিচ্যুতি ও তাদের কর্তৃক নিষ্পাপ মুসলিমদের তাকফির তাঁকে চরমভাবে ব্যথিত করে তোলে। ফলে তিনি ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে মসি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির দাওয়াতকে রদ্দ করে একাধিক রিসালা রচনা করেন। ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের রদে লিখিত তাঁর রিসালাসমূহের মধ্যে অন্যতম দুইটি রিসালা হলো, الرسالة المرضية في الرد على الوهابية ও الرد على من كفر أهل الرياض ومن حولها من المسلمين নজদে ওয়াহাবিদের ফিতনার ভয়াবহতা অবলোকন করে তিনি তদানীন্তন উসমানি খলিফা সুলতান আবদুল হামিদ খান আওয়ালকে পত্রের মাধ্যমে ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেন। তদানীন্তন নজদের বিশিষ্ট শায়খ ইবনু হুমাইদ হাম্বলি রাহ. বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন,

> তিনি (ইবনু ফিরুজ) সুলতান আবদুল হামিদ খানের সহিত নজদে খারিজি বাগীদের (ওয়াহাবিদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আবেদন করে পত্র বিনিময় করেন।[২৫১]

ইমাম ইবনু ফিরুজের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইমাম আবদুল্লাহ ইবনু দাউদ জুবাইরি হাম্বলি। তিনিও ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের মতাদর্শ রদ করে একটি বই লিখেছেন যার নাম হলো, 'আস-সাওয়ায়িকু ওয়ার রুয়ুদ'। এ বইয়ে তিনি ওয়াহাবিদের গুরু ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ও প্রথম আবদুল আজিজ ইবনু সৌদকে রদ করেছেন।

---

২৪৮. الصواعق و الرعود ১৮৯-১৯০

২৪৯. الصواعق و الرعود ১৯০

২৫০. الصواعق ص ২৫০

২৫১. আস-সুহুবুল ওয়াবিলা : ৪০১

সে যুগের অপর এক বিখ্যাত আলিম ছিলেন, ইমাম সালিহ ইবনু আবদুহ রাহ.। তিনিও ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ হাম্বলি আলিম। ইবনু ফিরুজ ও সালিহ ইবনু আবদুহ উভয়ই সমকালীন অন্যান্য বহু আইম্মায়ে হানাবালার মতো ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ও তাঁর মতাদর্শের ঘোরবিরোধী ছিলেন। ফলে কেবল মতাদর্শগত বিরোধিতার কারণে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি—ইবনু ফিরুজ ও সালিহের মতো বিদগ্ধ ইমামদেরকে তাকফির করেন। 'আদ-দুরারুস সানিয়ায়' ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের একটি চিঠি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে তিনি উপরোক্ত দুই স্বনামধন্য ইমামকে তাকফির করে বলেন যে,

> বরং তাঁর ইবনু ফিরুজ, সালিহ ইবনু আবদুল্লাহ ও তাদের মতো লোকেদের তাকফিরের বিষয়ে ইবারতটি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য।[২৫২]

ইবনু আবদুল ওয়াহহাব উভয় ইমামকে তাকফির করেন কারণ, উভয় ইমাম হাম্বলি মাজহাব অনুসারে তাওয়াসসুল, তাবাররুক, নিদা, শাফাআত ইত্যাদিকে জায়িজ বলতেন এবং নজদি দাওয়াতের বিরোধিতা করতেন। কেবল ওয়াহাবি দাওয়াতের বিরোধিতা করাটাই ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের কাছে একটি তাকফিরযোগ্য কারণ ছিল।

২. ইমাম সুলায়মান ইবনু সুহাইম হাম্বলি (১২৩০ হি.) রাহ.-কে তাকফির

শায়খ সুলায়মান ইবনু সুহাইম আল-আনাজি আল-হাম্বলি রাহ. ছিলেন ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সময়ের রিয়াদের শ্রেষ্ঠ হাম্বলি ফকিহদের একজন। তাঁর ইলমি গভীরতা, প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের জন্য একসময় তিনি রিয়াদের কাজি নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রথমদিকে নজদের বুকে যখন ওয়াহাবি মতাদর্শের আবির্ভাব ঘটে তিনি ওয়াহাবিয়াত দ্বারা প্রভাবিত হন। পরবর্তীতে যখন ওয়াহাবি মতাদর্শের স্বরূপ তাঁর সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল, তখন তিনি রুজু করেন এবং ওয়াহাবিদের ঘোর বিরোধিতা শুরু করলেন। তাঁর পিতা সুহাইমও ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকিহ ও কট্টর ওয়াহাবি মতাদর্শ বিরোধী আলিম। যেহেতু তারা ওয়াহাবি মতাদর্শের ঘোরবিরোধী ছিলেন, তাই ইবনু আবদুল ওয়াহহাব—ইবনু সুহায়ম রাহ. ও তাঁর পিতা উভয়কেই তাকফির করেন। 'আদ-দুরারুস সানিয়ায়' ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের একটি রিসালা নকল করা হয়েছে, যাতে তিনি উপরোক্ত ফকিহদ্বয়কে তাকফির করেন। চিঠিটির শুরুতে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব উভয়কে তাকফির করে বলেন,

و قبل الجواب : نذكر لك انك انت و اباك مصرحون بالكفر و الشرك و النفاق[২৫৩]

উক্ত চিঠিতে ইবনু সুহাইম ও তাঁর পিতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরও বলেন যে, 'তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্যের মর্মার্থ বোঝ না।' অত্যন্ত হাস্যকর বিষয় হলো যে, কেবল ওয়াহাবি মতাদর্শের বিরুদ্ধে থাকার কারণে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ইবনু সুহাইম ও তাঁর পিতার মতো প্রখ্যাত আলিমকে কালিমার অর্থ জানেন না এমন এক হাস্যকর ও গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি লেখেন, 'এ বিষয়টি তোমার কাছে আমরা স্পষ্টরূপে উন্মোচিত করব যাতে তুমি আল্লাহর কাছে তাওবা করো এবং ইসলামে প্রবেশ করো।' এরপর ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ইবনু সুহাইমের ওয়াহাবিয়াতের বিরোধিতা এবং লোকেদের ওয়াহাবিয়াতের বিরুদ্ধে সচেতন করাকে ইসলামের বিরোধিতা হিসেবে দেখিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন।

ইমাম সুলায়মান ইবনু সুহাইম রাহ. ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে একটি রিসালা লিখে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ও তাঁর মতাদর্শকে রদ করেছেন। যাতে তিনি ওয়াহাবিদের কুকর্মের বিষদ বর্ণনা দিয়েছেন।

৩. ইমাম ইবনু আফালিক হাম্বলিক (১১৬৩ হি.) কে তাকফির

ইমাম ইবনু আফালিক রাহ. ছিলেন ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির সমসাময়িক একজন মুজাদ্দিদ পর্যায়ের সুবিখ্যাত হাম্বলি আলিম। তাঁর পুরো নাম ছিল, মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান ইবনু হুসাইন আল-আফালিকি আল-আহসায়ি। তিনি ১১০০ হিজরি—১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে নজদের আল-আহসা প্রদেশে বিখ্যাত কাহতান গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্য তাঁকে আল-কাহতানিও বলা হতো। শৈশব থেকে ইবনু আফালিক রাহ. ছিলেন অত্যন্ত ধীশক্তির অধিকারী। তিনি পবিত্র হারামাইন, দিমাশক, বাগদাদ ও বসরার মতো ঐতিহাসিক শহরগুলো ভ্রমণ করে সেখানকার বিখ্যাত আলিমদের থেকে ইলম হাসিল করেন। নজদের বুকে যখন ওয়াহাবি ফিতনা শুরু হয়, তখন শায়খ আফালিক রাহ. ইবনু আবদুল ওয়াহহাবকে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের কাছে বেশকিছু প্রশ্নের উত্তর চেয়ে পাঠান, কিন্তু স্বল্পজ্ঞানী ইবনু আবদুল ওয়াহহাব

২৫২. আদ-দুরারুস সানিয়া : ১০/৬৩

২৫৩. আদ-দুরারুস সানিয়া ফিল আজওয়াবাতিন নাজদিয়া : ১০/৩১

সেসব প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম হয়েছিলেন। শায়খ ইবনু আলাবি রাহ. বলেন, 'আর ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ইমাম শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আফালিক রাহ. যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার কোনোটির উত্তর দিতে সক্ষম হলো না।'[২৫৪]

নজদে যখন ওয়াহাবি ফিতনা ব্যাপক প্রভাব ফেলতে শুরু করে, তখন ইবনু আফালিক অন্যান্য আলিমদের মতো ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি ও তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে একাধিক রিসালা লেখেন যার মধ্যে অন্যতম ছিল تهكم المقلّدين في مدعي تجديد الدين। তিনি ওয়াহাবিদের তাওহিদের বিকৃতি দেখে তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তোমাদের তাওহিদের অর্থ হলো, মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা এবং তাদের তাকফির করা।'

ইবনু আবদুল ওয়াহহাব যখন দেখলেন, ইমাম আফালিক রাহ. তাঁর তথাকথিত তাওহিদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, তখন তিনি তাঁকে তাকফির করলেন। 'আদ-দুরার ও আর-রাসায়েল' এ তাঁর একাধিক রিসালা এর সাক্ষ্য বহন করে।

৪. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইসা রাহ.-কে তাকফির

আবদুল্লাহ ইবনু ইসা আল-মুয়াইসি রাহ. ছিলেন ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সমসাময়িক নজদের একজন সুপ্রসিদ্ধ হাম্বলি আলিম। তিনি নজদের হুরমা শহরে বনু তামিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। নজদ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি পাড়ি জমান শাম দেশের দিমাশকে। সেখানে তিনি বিখ্যাত আলিমদের থেকে দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর উসতাজদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববরেণ্য হাম্বলি ইমাম শায়খ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ সাফফারিনি হাম্বলি রাহ.। সাফফারিনি রাহ.-এর মতো শায়খ আল-মুয়াইসি হাম্বলিও ওয়াহাবি মতাদর্শের বিরোধী ছিলেন। এ কারণে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব তাঁকেও তাকফির করেন। তিনি ইমাম মুয়াইসি রাহ.-কে তাকফির করে বলেন,

> (কোন ব্যক্তি) যে আবু তালিবের কবর পূজা করে, তার কুফর আল-মুয়াইস ও তার মতো মানুষদের দশটি কুফুরের সমান নয়।[২৫৫]

৫. শায়খ আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া রাহ.-কে তাকফির

শায়খ আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু আবদুল লতিফ রাহ. ছিলেন নজদের বিখ্যাত আলিম। তাঁর দাদা ইসমাইল ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম। তাঁর রচিত বিখ্যাত একটি বই হলো, مجموع ابن رميح। শায়খ রাহ. ছিলেন ওয়াহাবি মতাদর্শ বিরোধী। এ জন্য ইবনু আবদুল ওয়াহহাব তাঁকে তাকফির করে লেখেন,

> যদি তুমি (ওহাবিদের ব্যাখ্যাকৃত) তাওহিদের উপর দৃঢ় হও, সে ব্যাপারে স্পষ্ট হও, তাদের (আল মুয়াইস, ইবনু ইসমাইল ও ইবনু ইয়াহইয়া) প্রতি বিশেষ করে ইবনু ইয়াহয়ার প্রতি যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাপাক এবং সবচেয়ে বড় কাফির শত্রুতাপোষণ পূর্বক তার (ওয়াহাবিদের ব্যাখ্যাকৃত তাওহিদের) দিকে দাওয়াত দাও, এবং তার কারণে পাওয়া কষ্টে যদি ধৈর্যধারণ করো, তাহলে তুমি আমাদের ভাই ও বন্ধু।[২৫৬]

৫. ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহ. (৯১১ হি.) -এর মধ্যে শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে

ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির ফিতনা থেকে মুক্তি পাননি তাফসিরে জালালাইন প্রণেতা সুমহান মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকিহ ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি পর্যন্ত। ইমাম আবদুল্লাহ হাম্বলি রাহ. তাঁর বইয়ে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আলি রাহ.-এর বরাতে লিখেছেন, ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহ.-এর ব্যাপারে বলতেন, সুয়ুতি এমন এক ব্যক্তি যার মুখে শয়তানের প্রবেশ ঘটেছে।[২৫৭]

৬. সুলতানুল আরিফিন ইমাম ইবনুল ফারিদ রাহ. (৬৩২ হি.) -কে তাকফির

---

২৫৪. মিসবাহুল আনাম : ৪।

২৫৫. আদ-দুরারুস সানিয়া : ১০/১১৬

২৫৬. আদ-দুরারুস সানিয়া : ১০/৬২

২৫৭. الصواعق ২৫০.

সুলতানুল আশিকিন ইমাম আবু হাফস উমর ইবনু আলি ইবনুল ফারিদ রাহ. ছিলেন পঞ্চম হিজরি শতকের বিখ্যাত মিসরি ইমাম ও অলি। তিনি তাঁর তাকওয়া ও অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে আজও অমর হয়ে আছেন ইতিহাসের পাতায়। পরম প্রেমাস্পদের প্রেমাগলে দগ্ধ হওয়ার কারণে তাঁকে সুলতানুল আশিকিন বলা হয়। ৫৭৬ হিজরিতে তিনি আফ্রিকার দেশ মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। শরিয়ত ও তরিকতের পাশাপাশি আরবি সাহিত্যেও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর মহান কৃতিত্বসমূহের একটি হলো, 'দিওয়ানু ইবনিল ফারিদ' যাতে তাঁর ইশকে ইলাহি তথা আল্লাহর প্রেমে লিখিত কাব্যমালা সংগৃহীত হয়েছে। ইবনুল ফারিদের কাব্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে জারাকলি তাঁকে أشعر المتصوفين বা শ্রেষ্ঠতম সুফি কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁর কাব্যের অধিকাংশ হলো তাকওয়া, বালাগাত, দর্শন ও শাতহা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ।

ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের তাকফির থেকে বাদ যাননি ইমাম ইবনুল ফারিদ রাহ.-এর মতো ব্যক্তিও। তাঁকে তাকফির করে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব বলেন, 'এবং ইবনু সাবয়িন ও ইবনুল ফারিদদের ইবাদত ও সাদাকা রয়েছে এবং রয়েছে এক প্রকারের কাশফ ও জুহদ তারা হলো জমিনের নিকৃষ্টতম কাফির।'[২৫৮]

৭. ইমাম রাজি রাহ. (৬০৬ হি.) -কে তাকফির

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত যত রত্ন সন্তান জন্ম দিয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শায়খুল ইসলাম, সুলতানুল মুতাকাল্লিমিন, ইমামুল কাবির ফখরুদ্দিন রাজি রাহ.। হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইরানের রায় প্রদেশে সম্ভ্রান্ত দীনি পরিবারে তাঁর জন্ম। একাধারে তিনি মুফাসসির, ফকিহ, উসুলবিদ, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর পুরো নাম ছিল, আবু আবদুহ মুহাম্মাদ ইবনু উমর ইবনুল হুসাইন আর-রাজি আশ-শাফিয়ি আল-আশআরি। তাঁর পিতা ইমাম জিয়া উদ্দিন উমর ইবনুল হাসান রাহ. ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ ফকিহ ও উসুলবিদ। শৈশবকালে তাঁর ইলমচর্চার হাতেখড়ি হয় তাঁর পিতার হাত ধরে। পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি উসুল বিদ্যায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর সামনানে ভ্রমণ করে সেখানে তিনি ইলম চর্চায় মনোনিবেশ করেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি একজন বিদগ্ধ ফকিহ, মুফাসসির ও মুতাকাল্লিম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ইলমুল কালামে তাঁর তীক্ষ্ণ পারদর্শিতার কারণে তাঁকে ইমামুল মুতাকাল্লিমিন বলা হয়ে থাকে। তাফসির শাস্ত্রে তাঁর অনন্য কীর্তি হলো, 'মাফাতিহুল গায়িব' নামক সুবিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ যা আজও আহলুস সুন্নাতের এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া ইলমুল কালামসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে তিনি বহু বই রচনা করেছেন।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি আকিদাগতভাবে ছিলেন আশআরি। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দুই স্তম্ভের অন্যতম আশআরি আকিদার ওপর তিনি রচনা করেছেন 'আল-আরবায়িন ফি উসুলিদ দীন' নামক বইটি। বিদআতি মুজাসসিমাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার কারণে ইমাম তাজউদ্দিন সুবকি রাহ. তাঁর 'আস-সায়ফুস সাকিল' বইয়ে 'মুজাসসিমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কোষমুক্ত তরবারি' বলে অভিহিত করেন। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহ. তাঁকে শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম ইবনুল আসির রাহ. তাঁর বই 'আল-কামিল' এ ইমাম রাজিকে 'তাঁর যুগের দুনিয়ার ইমাম' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, কিন্তু ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের তাকফিরি মেশিন থেকে বাদ যায় নি এমনি এক মহান ইমামকেও। 'আদ-দুরারুস সানিয়া' এ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি ইমাম রাজিকে তাকফির করে বলেন, তিনি তারকাপূজার ওপর বই রচনা করেছেন। ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের আগে ইবনু তাইমিয়া ইতিপূর্বে ইমাম রাজি রাহ.-এর বিরুদ্ধে কুফুরের মিথ্যা অভিযোগ এনেছিলেন এবং জ্যোতিষবিদ্যায় বিশ্বাসের অপবাদ দিয়েছিলেন। তবে ইবনু তাইমিয়া মিথ্যা অপবাদ আরোপের পর এটাও বলেছিলেন যে, ইমাম রাজি রাহ. পরবর্তীতে রুজু করেছিলেন ও দীনে ইসলামের ওপর টিকে ছিলেন। যদিও এ জ্যোতিষবিদ্যায় বিশ্বাস ও রুজুর কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন গল্পকথা মাত্র। ইমাম রাজি রাহ. তাঁর তাফসিরগ্রন্থে জ্যোতিষবিদ্যার ওপর বিষদ আলোচনা করেছেন এবং নিষিদ্ধ জ্যোতিষবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে তিনি সতর্ক করেছেন। الاختيارات العلائية في الاختيارات السمائية বইয়ের ভূমিকায়ও তিনি নিষিদ্ধ জ্যোতিষবিজ্ঞান চর্চা নিয়ে সতর্ক করেন।

তবে ইবনু তাইমিয়া তাঁর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার পর রুজুর কাহিনীও রচনা করেছেন; কিন্তু ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি রুজুর বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে ইমাম রাজি রাহ.-কে তাকফির করেছেন। তিনি ইমাম রাজি রাহ.-এর বিষয়ে বলেছেন,

যেমনভাবে রাজি তারকাপূজার ব্যাপারে লিখেছেন, আর তা (তারকাপূজার বিষয়ে লেখা) মুসলিমদের ঐক্যমতে রিদ্দা (ইসলাম

২৫৮. আদ দুরারুস সানিয়াহ ফিল আজওয়াবাতিন নাজদিয়্যাহ, খন্ড ৮, : ৩৬৬

ত্যাগ)।[২৫৯]

৮. শায়খে আকবার ইমাম ইবনুল আরাবি রাহ. (৬৩৮ হি.) -কে তাকফির

হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় ইসলামি সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র আন্দালুসে যেসব মহামনীষী জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, শায়খুল আকবার ইমাম মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি রাহ.। তাঁর পুরো নাম ছিল, মুহাম্মাদ ইবনু আলি ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল আরাবি আল-হাতিমি আত-তায়ি আল-আন্দালুসি। ৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দে রমজান মাসে আন্দালুসের মুরসিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইবনুল আরাবি ছিলেন একজন মুজতাহিদ পর্যায়ের আলিম। শরিয়ত ও তরিকতে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকার কারণে তাঁকে শায়খুল আকবার, ইমামুল মুহাক্কিকিন, বাহরুজ জাখির প্রভৃতি উপাধীতে ভূষিত করা হয়। ইবনু আরাবি রচিত জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-ফুতুহাতুল মাক্কিয়া' এ তিনি শরিয়ত ও তরিকতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দার্শনিক ভঙ্গিমায় আলোচনা করেছেন। তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রসিদ্ধি জগদ্ধাত্রীর প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। যুগে যুগে আহলুস সুন্নাতের স্বনামধন্য ইমামরা তাঁর প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ষোড়শ শতাব্দীর আলজেরিয়ার মালিকি মাজহাবের স্বনামধন্য ইমাম শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মাককারি রাহ.। আকিদা, ইতিহাস, তাসাউফ প্রভৃতির উপরে রয়েছে তাঁর একাধিক রচনাবলী। তিনি ইমাম ইবনুল আরাবি রাহ. সম্পর্কে বলেন, '...ইমাম ইবনুল আরাবি যিনি ছিলেন সৎ আওলিয়া, নসিহতকারী আলিম, আর যারা তাঁর কথাকে বুঝতে পারেননি তারা তাঁর দিকে তিরস্কারের তীর তাক করেছিল।'[২৬০]

ইমাম মুহিব্বুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু মাহমুদ ইবনুন নাজ্জার রাহ. ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর ইলমের নগরী বাগদাদের বিখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিস। তিনি ইবনুল আরাবি রাহ. সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, '...তিনি তরিকত গ্রহণ করেন, হজ করেন এবং উলুমুল কাওম, পাশ্চাত্যের সুফি ও মাশায়িখদের ইতিহাস নিয়ে বই লিখেছেন। তাঁর সুন্দর কাব্যও রয়েছে...'[২৬১]

আহলুস সুন্নাহর চার মাজহাবের অন্যতম হানাফি মাজহাবের ফিকহি সমুদ্রকে যেসব আইম্মায়ে কিরাম মণিমুক্তায় পরিপূর্ণ করেছেন তাঁদের একজন হলেন, ইমাম আলাউদ্দিন হাসকাফি রাহ.। দিমাশকের এ মনীষী একাধারে ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুফতি ও ইমাম ছিলেন। তিনি তাঁর `আদ-দুররুল মুখতার' এ ইমাম ইবনুল আরাবি রাহ.-এর `ফুসুসুল হিকাম' গ্রন্থের ব্যাপারে বলেন, 'আমি যে বিষয়টিতে নিশ্চিত হয়েছি সেটা হলো, কিছু ইয়াহুদি শায়খের ওপর অপবাদ দিয়েছে, অতএব সেসব কালিমা অধ্যায়ন পরিত্যাগের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।'

ইমাম ইবনু কামাল পাশা রাহ. ছিলেন পঞ্চদশ শতকের বিখ্যাত হানাফি ফকিহ ও মুহাদ্দিস। তাঁর নতুন করে কোনো পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ইমাম ইবনু ইমাদ হাম্বলি রাহ. ইবনু কামাল পাশা রাহ.-এর বই থেকে তাঁর شذرات الذهب বইয়ে ইবনুল আরবি রাহ. সম্পর্কে একটি কথা নকল করেছেন। যেখানে ইবনু কামাল পাশা ইবনু আরাবির প্রসংশায় বলেন, '...কুতবুল আরিফিন ওয়া ইমামুল মুয়াহহিদিন মুহাম্মাদ ইবনু আলি ইবনুল আরাবি আত-তায়ি আল-আন্দালুসি ছিলেন কামিল মুজতাহিদ, মহান মুরশিদ, তাঁর আশ্চর্য মানাকিব ছিল আর ছিল আজব কারামাত, তাঁর ছিল বহু ছাত্র, উলামা ও ফুজালাদের কাছে তিনি ছিলেন গ্রহণযোগ্য। যে ব্যক্তি তাঁকে অমান্য করল সে ভুল করল। আর যে ব্যক্তি তাঁর বিরোধিতায় অনড় থাকল সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল...'

ইমাম ইবনু আবিদিন রাহ. ইমাম ইবনুল আরাবি সম্পর্কে বলেন 'তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আলি ইবনু মুহাম্মাদ আল-হাতিমি আত-তায়ি আল-আন্দালুসি বড় পীর ইবনুল আরাবি... তিনি প্রত্যেক ইলমে তাঁর দেশবাসীর সবার থেকে বেশি ইলম রাখতেন।'[২৬২]
ইমাম আলুসি রাহ. তাঁর 'তাফসিরে রুহুল মাআনি' গ্রন্থে ইবনুল আরাবি রাহ.-কে মাওলানা ও শায়খুল আকবার বলে ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। বিখ্যাত শাফিয়ি ফকিহ ও মুহাদ্দিস ইমাম ইবনু হাজার হাইতামি রাহ. ইবনুল আরাবি রাহ. সম্পর্কে বলেন, 'শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি রাহ. হলেন এমন এক ইমাম যিনি ইলম ও আমলের অধিকারী ছিলেন।'[২৬৩]

---

২৫৯. আদ-দুরারুস সানিয়া সানিয়া : ১০/৭৬
২৬০. زهر الرياض في اخبار عياض
২৬১. ذيل تاريخ بغداد
২৬২. ফাতওয়ায়ে শামি
২৬৩. আল ফাতাওয়াতে

ইমাম জালালুদ্দিন রাহ.-এর ছাত্র ও নবম হিজরি শতাব্দীর প্রখ্যাত ইমাম আবশিহি রাহ. ইমাম ইবনুল আরাবি রাহ.-এর একটি কাব্য উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর নাম এভাবে নিয়েছেন, 'আশ-শায়খুল আকবার সাইয়িদি মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি রাহিমাহুল্লাহু তাআলা...'[২৬৪] যা ইমাম রাহ.-এর প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তির পরিচায়ক। নবম হিজরি শতকের বিখ্যাত শাফিয়ি ফকিহ, মুফাসসির, গণিতজ্ঞ নিজাম উদ্দিন নিসাপুরি রাহ. তাঁর 'গারায়িবুল কুরআন' বইয়ে ইবনুল আরাবি রাহ.-এর কথা নকল করতে গিয়ে তাঁকে শায়খে কামিল মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবি বলে অভিহিত করেন। ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. ইবনুল আরাবি রাহ.-এর প্রসংশায় বলেন, 'তিনি হলেন (ইলমের ঢেউয়ে) তরঙ্গায়িত সমুদ্র যার কোনো তীর নেই এবং যার ঢেউয়ের কোনো শব্দ শোনা যায় না।'

হানাফি মাজহাবের বিশিষ্ট ইমাম মুরতাজা জাবিদি রাহ. ইবনুল আরাবিকে শায়খে কাবির বা মহান শায়খ নামে অভিহিত করেন। ইমাম খতিব তিবরিজি রাহ. মিশকাতে ইবনুল আরাবি রাহ.-এর কথা নকল করতে গিয়ে তাঁকে 'আশ-শায়খুল আকবার' নামে আখ্যায়িত করেন। প্রখ্যাত শাফিয়ি ইমাম আবদুল ওয়াহহাব আশ-শারানিও ইবনু আরাবিকে 'শায়খে আকবার' লকব দ্বারা মহিমান্বিত করেন। ইমাম নববি রাহ. তাঁকে 'আউলিয়া' মনে করতেন। ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রাহ. তাঁর 'হাময়াত' নামক বইয়ে ইমাম ইবনুল আরাবিকে 'শায়খে আকবার' নামে আখ্যায়িত করে তাঁর তরিকতকে মকবুল তরিকত বলেছেন।

ইমাম ইবনুল আরাবি রাহ.-এর ওয়াহদাতুল উজুদের ধারণাটির কারণে কিছু কিছু ইমাম তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইমাম জাহাবি রাহ.। তিনি ইবনুল আরাবির 'ফুসুসুল হিকাম' গ্রন্থের বিভিন্ন কথার ঘোর সমালোচনা করেন, কিন্তু কঠোর সমালোচক হওয়ার পরও তিনি তাঁকে তাকফির করার মতো ধৃষ্টতা দেখাননি। তাঁর ব্যাপারে জাহাবি রাহ. বলেন, حاكي الكفر ليس بكافر। এমনকি তিনি ইবনুল আরাবি রাহ.-কে আউলিয়াদের মধ্যে গণ্য করে বলেন,

وقولي انا فيه انه يجوز أن يكون من أولياء الله الذين اجتذبهم الحق الى جنابه عند الموت وختم لهم بالحسنى.

জাহাবি রাহ. ইমাম ইবনু আরাবি রাহ. সম্পর্কে বলেন, 'ইবনুল আরাবি রাহ.-এর কথার মধ্যে ব্যাপকতা (গভীর অর্থ) ছিল, তাঁর ছিল বিচক্ষণতা, তীব্র স্মৃতিশক্তি, সুফিবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আর ছিল মারিফাত বিষয়ক বেশ কিছু বই। তাঁর কথা ও কাব্যমালাতে যদি শাতহা না থাকত তাহলে (তাঁর কিছু শরিয়তবিরোধী কথা যেমন : হুলুল ও ইত্তিহাদ মনে হয় এমন ধরনের জন্য) তাঁর বিরুদ্ধে ইজমা হয়ে যেত। সম্ভবত সেটা (শাতহা) তাঁর (ফানার) মত্ততা ও গায়বতের হালতে প্রকাশ পেয়েছিল। তাই আমরা তাঁর জন্য ভালো আশা রাখি (বা তাঁর ব্যাপারে আমরা সুধারণা রাখব)।'[২৬৫]

শাফেয়ী মাযহাবের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম শাইখুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন আল বুলকিনি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর জীবনের প্রথমদিকে শাইখে আকবরের বিরোধী ছিলেন। পরে যখন তাঁর কথাগুলো তাহকীক করেন তখন তিনি গভীরভাবে অনুতপ্ত হন। পরে একসময় তদানীন্তন কাজীউল কুযাত শাইখ ইবনুস সুবকী (ইনি ইমাম তাজউদ্দীন সুবকী নন) শাইখের আল ফুসূস কিতাবের কোন একটি বিষয়ে রদ লেখেন। তখন শাইখুল ইসলাম বুলকিনী রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে পত্র পাঠিয়ে উপদেশ দেন,

" ওহে কাজিউল কুযাত! শাইখের রদ্দ করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক হও। যদি তুমি রদকারী হয়েই থাকো, তাহলে শাইখের যারা রদ করেছে তাদের রদ করো, নতুবা রদ করা ছাড়।"[২৬৬]

মধ্যযুগের জগদ্বিখ্যাত ইমাম হযরত জালালুদ্দিন আস সুয়ুতি রাহ. এঁর মুরিদ ও যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম এবং মুজাদ্দিদ আবুল মাওয়াহিব আব্দুল ওয়াহহাব আশ শা'রানি রাহ. যাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি মুজতাহিদে মুতলাক স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি শাইখে আকবর রাহ. এঁর সমর্থনে কলম ধরেন। তিনি তাঁর আজওয়াবাতুল মারদ্বিয়্যাহ গ্রন্থে ইমাম ইবনু আরবি রাহিমাহুল্লাহ এঁর সমর্থনে একটি গোটা অধ্যায় রচনা করেন। এছাড়া শাইখে আকবর রাহ. এঁর উপর রয়েছে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল কিবরিতুল আহমার। উভয়টি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

২৬৪. المستطرف

২৬৫. তারিখুল ইসলাম : ৪৬/৩৮১

২৬৬. আল আজওয়াবাতুল মারদ্বিয়্যাহ, ইমাম শারানী রাহ. , পৃষ্ঠা ২৪১-২৪২

শাতহা কি

তাসাউফ চর্চাকালে ইশকে ইলাহির পথে কোনো সালিক যখন ফানা ফিল্লাহর হালতে পৌঁছে যায় তখন প্রমত্তার আধিক্যের কারণে তাঁর থেকে মাঝেমধ্যে শরিয়তবিরোধী কথাবার্তা অথবা কাজকর্ম প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ সময় উক্ত ব্যক্তি পাগলপারা হয়ে যান এবং তাঁর কথা ও কাজের উপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এ হালতে উক্ত ব্যক্তি থেকে প্রকাশিত শরয়িতবিরোধী কথা বা কাজকে ইসতিলাহান বা পরিভাষায় শাতহা বলা হয়ে থাকে। শাতহার বিষয়ে শায়খ ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন,

> এ ফানাতে তিনি (অর্থাৎ, আশিক) বলতে পারেন, আমি আল্লাহ অথবা সুবহানি অথবা (আমার) জুব্বাটির মধ্যে আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই...এটা হলো কিছু পিরের শাতহা।[২৬৭]

শরিয়তে শাতহার হুকুম হলো, এর কারণে উক্ত আল্লাহর আশিককে দোষারোপ করা যাবে না, যেহেতু তিনি পাগল বা মাতাল অবস্থায় এগুলো বলেছেন। তবে এ হালতে তাঁর থেকে সংঘটিত কথাবার্তা বা কাজকর্মকে শরিয়তের মধ্যে প্রবেশ করানো যাবে না। ইবনু তাইমিয়া এ বিষয়ে বলেন,

> আর তাদের উপর হুকুম দেওয়া হবে, যদি তাদের কারও আকল হারাম নয় এমন কারণে লোপ পায়, সে ক্ষেত্রে তাদের থেকে যে হারাম কথাবার্তা বা কাজকর্ম প্রকাশ পায়, তার জন্য কোনো অপরাধ হবে না।[২৬৮]

ইবনুল আরাবি রাহ. যে কারণে তাঁর সমালোচকদের কাছ থেকে অধিক আক্রমণের শিকার হন সেটি হলো, তাঁর ওয়াহদাতুল উজুদ তত্ত্ব। যদিও ইবনুল আরাবি কর্তৃক ওয়াহদাতুল উজুদের সংজ্ঞায়নের আগ থেকেই এর অস্তিত্ব ছিল। তবে তিনি ওয়াহদাতুল উজুদের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। ওয়াহদাতুল উজুদ অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়। সে কারণে এ তত্ত্ব দীর্ঘকালযাবৎ বেশ আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে। যুগে যুগে এ বিষয়ে লেখা হয়েছে একাধিক গ্রন্থও। দেওবন্দের বরেণ্য আকাবির শায়খ আশরাফ আলি থানবি রাহ. (১৩৬২ হি) তাঁর ওয়াহদাতুল উজুদ তত্ত্বের সমর্থনে লিখেছেন 'আরমাগানে ইবনুল আরাবি'। ওয়াহদাতুল উজুদ তত্ত্বের উপর এটি একটি আকরগ্রন্থ। এখন পাঠক মানসে ওয়াহদাতুল উজুদ নিয়ে কৌতূহল জাগতে পারে। সে কারণে আমি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে বিষয়টির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

অহদাতুল উজুদ

ওয়াহদাতুল উজুদ নিয়ে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে কৌতূহল, আলোচনা ও সমালোচনার অন্ত নেই। অনেকের ধারণা ওয়াহদাতুল উজুদ হলো, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সত্ত্বাগত মিলনের আকিদা; কিন্তু স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সত্ত্বাগত মিলনের আকিদা একটি মারাত্মক কুফুরি আকিদা। এ ধরনের আকিদাকে হুলুল ও ইত্তিহাদ বলা হয়। কেউ যদি এ আকিদা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাআলা সত্ত্বাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান বা তিনি তাঁর কোনো সৃষ্টির মধ্যে রয়েছেন অথবা আরশের উপরে সমন্বিত হয়েছেন, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। ইবনুল আরাবি রাহ. তাঁর 'আল-ফুতুহাতুল মাক্কিয়া' বইয়ে এ ধরনের আকিদার ঘোর বিরোধিতা করেছেন। তিনি তাঁর বই আল-ফুতুহাতের মধ্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন, 'যে ব্যক্তি হুলুল (আকিদার) কথা বলল সে হলো ব্যাধিগ্রস্থ।'[২৬৯] অতএব দেখা যাচ্ছে, শায়খে আকবার রাহ. নিজেও হুলুলি আকিদার ঘোরবিরোধী ছিলেন। তাহলে ওয়াহদাতুল উজুদ বলতে কি বোঝায়?

তাসাউফ তথা ইশকে ইলাহির আধ্যাত্মিক পথে একজন সালিক যখন পা বাড়ায়, তখন সে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। ইলমে তাসাউফ বা সুফিতত্ত্বের পরিভাষায় এসব অবস্থাসমূহকে হালাত বলা হয়ে থাকে। সালিকরা তাসাউফচর্চার মাধ্যমে বিভিন্ন হালাত অতিক্রম করার পর একপর্যায়ে আল্লাহ প্রেমে একেবারেই নিমজ্জিত হয়ে যায়। যেমন : কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকা অথবা কোনো প্রেমিকা তার প্রেমিকের প্রেমে অন্ধ হয়ে যায় এবং প্রেমাগলে দগ্ধ হতে হতে একসময় নিজকে প্রেমাস্পদের মধ্যে হারিয়ে ফেলে ঠিক তেমনি খোদাপ্রেমিক ব্যক্তির খোদার প্রেমে গভীরভাবে নিমজ্জনের ফলে সে খোদাপ্রেমে নিজেকে হারিয়ে বসে, খোদার প্রেমে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে ফেলে। এ অবস্থায় তার কাছে সৃষ্টবস্তুর অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। সর্বদা সে খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকে। একসময় নিজের অস্তিত্বকেও সে বিলীন করে দেয়। শরিয়তের পরিভাষায় এ অবস্থাকে ফানা ফিল্লাহ বলে।

---

২৬৭. মাজমুয়ুল ফাতওয়া : ১০/৩৩৯-৩৪০

২৬৮. মাজমুয়ুল ফাতওয়া : ১০/৩৪০

২৬৯. আল-ফুতুহাতুল মাক্কিয়া : ৪/৩৭৯

ফানা ফিল্লাহর হালতে সালিক কেবল একজনকেই অনুভব করে থাকে। আর তিনি হলেন আশিক, খালিক ও মালিক, আল-বাকি—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। প্রেমিক অথবা প্রেমিকা যেমন প্রেমাগলে দগ্ধ হওয়ার ফলে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে ফেলে তেমনি একজন সালিক বা আশিক ইশকে ইলাহির পথে ফানা ফিল্লাহ হওয়ার পর, অধিক তাওয়াজুর কারণে নিজেকে অস্তিত্বহীন বা অস্তিত্বহীনের মতো (যেহেতু তার ক্ষয়িষ্ণু দেহ প্রকৃত অর্থে বা বাস্তবে অস্তিত্বহীন হয় না) মনে করে এবং আল্লাহকে কুল্লুন ও বাকি বা একমাত্র চিরঞ্জীব সত্ত্বা মনে করে। এ ধারণাকে রূপকার্থে ওয়াহদাতুল উজুদ বলে। ওয়াহদাতুল উজুদের হাকিকি অর্থ নেওয়া বা এমনটি মনে করা যে, 'আল্লাহ তাআলার সঙ্গে বান্দার সত্তাগত মিলন ঘটে' এটা শিরক। ইবনুল আরাবির ওয়াহদাতুল উজুদ ধারণা বিরুদ্ধ। আশরাফ আলি থানবি তাঁর 'আশরাফুত তরিকা ফিশ শরিয়া ওয়াল হাকিকা', ইমাম জালালুদ্দিন রুমি তাঁর 'ফিহি মা ফিহি' এবং আহলুস সুন্নাতের ইমামরা তাদের স্ব স্ব বইয়ে ওয়াহদাতুল উজুদের এই ব্যাখ্যা করেছেন।

ওয়াহদাতুল উজুদের ব্যাখ্যাটি আরও স্পষ্ট হয় ইবনু তাইমিয়া রাহ.-এর সুফিদের ফানা ফিল্লাহর ব্যাখ্যা থেকে। ইবনু তাইমিয়া রাহ. তাঁর 'মাজমুয়ুল ফাতাওয়া' এর দশম ও একাদশ খণ্ডদ্বয় ইসলামি সুফিতত্ত্বের ওপর রচনা করেছেন। এ খণ্ডদ্বয়ের মধ্যে তাসাউফের বিভিন্ন দিক নিয়ে এবং তরিকতের উজুবাত নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর বইয়ের দশম খণ্ডের মধ্যে ফানা ফিল্লাহর বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি ওয়াহদাতুল উজুদ ধারণার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইবনু তাইমিয়া রাহ. ফানাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ পূর্বক বলেন, 'দ্বিতীয় প্রকার (ফানা) হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর দর্শন ও চিন্তা থেকে ফানা হওয়া। এটি অনেক সালিকেরই অর্জিত হয়ে থাকে। কেননা, তারা আল্লাহর জিকিরের প্রতি অধিক আসক্তি, অধিক ইবাদত ও মুহাব্বাত এবং অন্তরের মুজাহাদার মাধ্যমে এমন স্তরে উন্নীত হন যে, তাদের অন্তর আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যক্ষ করেন না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও প্রতি তাদের কলব ধাবিত হয় না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু তাদের কল্পনায়ও আসে না; বরং তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু অনুভব করতে পারেন না। যেমন : মুসা আ.-এর মা সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'সকালে মুসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয় দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মুসা জনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন।[২৭০]সুফিরা বলেছেন, তাঁর হৃদয় মুসা আ.-এর স্মরণ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে গেছে।

এটি অনেক ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। যেমন: কেউ অধিক ভয়, মুহাব্বাত কিংবা অধিক আশায় নিপতিত হলে, তার অন্তর অন্য সবকিছু থেকে খালি হয়ে যায় এবং তার অন্তর ভয়, মুহাব্বাত কিংবা আশা ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সে তার উদ্দিষ্ট বিষয়ে এতটা নিমগ্ন থাকে যে, অন্য কিছুর অস্তিত্বই অনুভব করতে পারে না। ফানার অধিকারীর ওপর যখন এ অবস্থা প্রবল হয়, তখন সে তার অস্তিত্ব ভুলে যায়, নিজের ধ্যান থেকে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়, নিজের কথা ভুলে আল্লাহকে স্মরণ করে, এমনকি অস্তিত্বহীন সকল কিছু তাঁর কাছে ফানা হয়ে যায় অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত করা—সবকিছু অস্তিত্বহীন মনে হয় এবং এককভাবে আল্লাহ তাআলাই তাঁর অন্তরে বিদ্যমান থাকে।

সুতরাং মূল উদ্দেশ্য হলো, বান্দার ধ্যান থেকে, বান্দার স্মরণ থেকে মাখলুকাত ফানা হওয়া এবং বান্দা এ সমস্ত জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব কিংবা ধ্যান থেকে ফানা হওয়া। এ অবস্থা যখন প্রবল হয়, তখন প্রেমিক দুর্বল হয়ে পড়ে এমনকি তাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতা। মাঝে ত্রুটি দেখা যায়, তখন সে নিজেকেই তার প্রেমাস্পদ মনে করতে শুরু করে। যেমন : বলা হয়, 'এক ব্যক্তি নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে তার প্রেমিকও তার পিছে পিছে ঝাঁপ দিয়েছে। তখন সে তার প্রেমিককে জিজ্ঞেস করল, আমি নিজে পড়েছি, তোমাকে কে নিক্ষেপ করল? সে বলল, তোমার ধ্যানে আমি আমার নিজের অস্তিত্ব ভুলে গেছি। আমি মনে করেছি তুমিই আমি।'[২৭১]

ইবনু তাইমিয়া তাঁর এ বক্তব্যের মধ্যে ওয়াহদাতুল উজুদের নির্যাস তুলে ধরেছেন। ওয়াহদাতুল উজুদের এত সুন্দর ব্যাখ্যা আমি অন্য কোথাও দেখিনি। ওয়াহদাতুল উজুদের হালাতে অতিরিক্ত নিমজ্জনের ফলে অনেকে সময় সালিক থেকে ভুল বা শরিয়তবিরোধী কথার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে শাতহার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রেমিক যখন প্রেমাস্পদের প্রেমের সমুদ্রে ডুব দেয় তখন এক পর্যায়ে সে প্রেমাস্পদের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সে বলে তুমি আর আমি এক হয়ে গেছি। তোমার মধ্যেই আমি আমাকে দেখি। বরং তুমি

২৭০. সুরা কাসাস : ১০

২৭১. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১০/২১৯

হলেম আমি আর আমি হলেম তুমি। এর অর্থ এই নয় যে, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সত্তাগত মিলন ঘটেছে। অনুরূপভাবে বান্দা যখন ইশকে ইলাহির মধ্যে গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়ে নিজেকে ফানা করে দেয়, তখন তার থেকে মাঝেমধ্যে শরয়তবিরোধী কথা প্রকাশ পায়। শরিয়তের পরিভাষায় এ ধরনের ভুলগুলোকে শাতহা বলে। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলোর জন্য আশিককে মাজুর ধরতে হবে এবং তাকে দোষারোপ করা যাবে না।

আবার সুফিরা অনেক সময় রূপক ব্যবহার করেন। সে ক্ষেত্রে সুফিদের কোনো কথা বাহ্যিকভাবে শরয়তবিরোধী মনে হলেও তার অন্তর্নিহিত ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকে। সেগুলো না জেনে তাঁদের বিরুদ্ধে কথা বলা মুসলিমের জন্য সমীচীন নয়। ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন, 'জেনে রাখো, তাসাউফ এবং তার ইলম বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। সুফিদের কথায় তাসাউফসংক্রান্ত বিভিন্ন ইঙ্গিত থাকে। কখনো কখনো তারা শব্দকে ব্যাপক রাখেন, তাদের পরিভাষার ওপর বিভিন্ন ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেন, তারা বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা করে থাকেন, যার মর্ম কেবল তারাই অনুধাবন করেন। প্রকৃতপক্ষে যে তাদের সংস্পর্শ অবলম্বন না করে এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত না হয়ে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করবে, তবে সে অপদস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'[২৭২]

অতএব আউলিয়াদের কোনো কথা বাহ্যিকভাবে শরিয়তবিরোধী মনে হলে সে ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক ব্যাখ্যা জেনে নিতে হবে, তা সম্ভব না হলে সে ক্ষেত্রে উসুল হলো, এসব কথাবার্তার তাবিল করতে হবে।

এ পর্যন্ত আমরা ওয়াহদাতুল উজুদ নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি ধারণা পেলাম। ইলমে তাসাউফের পথে পদচারণার সময় বড় বড় অলি-আউলিয়াদের এ ধরনের ফানা ফিল্লাহ ও বাকা বিল্লাহর অতি উচ্চ মাকাম অর্জিত হয়েছিল। যেমন : হাল্লাজ রাহ. ফানা ফিল্লাহর হালাতে উত্তীর্ন হওয়ার ফলে তাঁর থেকে শাতহা প্রকাশ পায়। ফলে তিনি বলেছিলেন আনাল হক বা আমি আল্লাহ। এ কথার মাধ্যমে তিনি নিজেকে খোদা দাবি করেননি; বরং তিনি রূপকার্থে আনাল হক বলেছিলেন যার অর্থ হলো, আমি অস্তিত্বহীন এবং আল্লাহ হলেন চিরস্থায়ী। উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, হাল্লাজের ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কতিপয় ইমাম যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইবনু তাইমিয়া ও অন্যান্যরা তাঁদের মতে হাল্লাজের আনাল হক কথাটি তিনি শাতহা হালতে নয় বরং মুস্তাইকিযান তথা সাধারণ জাগ্রত অবস্থায় তিনি বলেছেন। তাই তাঁরা হাল্লাজের কঠিন বিরোধিতা করেছেন এমনকি তাকফির পর্যন্ত করেছেন। আবার বহু ইমাম তাঁর পক্ষে মত পোষণ করেছেন যাঁদের মধ্যে ইমাম কুশাইরি সহ বহু যুগশ্রেষ্ঠ ইমামগণ রয়েছেন। তাঁরা বলেন, হাল্লাজের শরয়ী বিরোধী কথা সমূহ জাগ্রত নয় বরং শাতহা হালতে প্রকাশ পায়। তাঁরা তাঁর বচনসমূহের তাবিল করেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দ্বিতীয় মতটি অধিক সত্য বলে প্রতীয়মান হয়।

ইমাম জালালুদ্দিন রুমি তাঁর 'ফিহি মা ফিহি' বইয়ে হাল্লাজ রাহ.-এর আনাল হক কথাটির ব্যাখ্যায় বলেন,

> বাস্তবিকভাবে আনাল হক কথাটি হলো অত্যন্ত তাওয়াজু (অত্যন্ত বিনয়)-এর (প্রকাশ)।

'অর্থাৎ, খোদার সামনে অত্যাধিক বিনয়। তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, এর অর্থ হলো, انا عدم هو الكل। এখানে স্পষ্ট ইবনু তাইমিয়া রাহ.-এর ব্যাখ্যাটি ফুটে উঠেছে। আর এটাই হলো ওয়াহদাতুল উজুদ।' যাইহোক, ফিরে আসা যাক মূল প্রসঙ্গে। ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ইবনুল আরাবিকেও তাকফির করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'আর ইবনুল আরাবি, ইবনু সাবয়িন ও ইবনুল ফারিদ তাদের কিছু ইবাদত, সদাকাত, কাশফ ও জুহদ ছিল। আর তারা ছিল পৃথিবীর নিকৃষ্টতম অথবা তারা ছিল পৃথিবীর নিকৃষ্টতম কাফিরদের মধ্যে থেকে (তিন জন)।'[২৭৩]

উল্লেখ্য : এখানে ইবনুল আরাবি রাহ. ছাড়াও বাকি দুই ব্যক্তি অর্থাৎ, ইবনু সাবয়িন ও ইবনুল ফারিদ উভয়েই ছিলেন বিদগ্ধ আলিম ও আউলিয়া। এভাবে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের কলম থেকে রক্ষা পাননি যুগশ্রেষ্ঠ ইমামরাও।

২৭২. মাজমুয়ুল ফাতাওয়া : ৫/৭৯

২৭৩. আদ-দুরারুস সানিয়া : ৮/৩৬৬

৯. ইমাম মানসুর বুহুতি রাহ. (১০৫১ হি.)–কে মিথ্যাবাদি বলা

ইমাম মানসুর আল-বুহুতি রাহ. হলেন একাদশ হিজরির মিশরের সুবিখ্যাত হাম্বলি ইমামদের একজন। তাঁকে হাম্বলি মাজহাবের স্তম্ভ মানা হয়ে থাকে। তাঁর প্রণিধানযোগ্য কিতাবাদির মধ্যে রয়েছে كشاف القناع, الروض المربع প্রভৃতি।

ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের মিথ্যাচার থেকে বাদ পড়েননি অমন এক হাম্বলি ইমামও। ইমাম আবদুল্লাহ হাম্বলি রাহ. তাঁর বইয়ে এ বিষয়ে বলেন, ইবনু আবদুল ওয়াহহাব মানসুর আল বুহুতি রাহ.-এর বিষয়ে বলতেন,

> ইনি হলেন বুহুত (মিথ্যাবাদী), বুহুতি নন কারণ, তিনি শারহুল মুনতাহাতে আশিটি মিথ্যাচার করেছেন।[২৭৪]

এভাবে ইবনু আবদুল ওয়াহাব ও ওয়াহাবিরা যুগশ্রেষ্ঠ ইমামদের তাকফির ও তাঁদের শানে বেআদবি করেছিল। আমি এখানে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছি। তাদের কিতাবাদিতে এ রকম ভুরিভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

www.muslimdm.com

২৭৪. الصواعق ٢٥٠

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়াহাবি আন্দোলনের বিরোধিতায় আহলুস সুন্নাতের আইম্মায়ে কিরাম

নজদের বুকে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের নেতৃত্বে যখন ওয়াহাবি দাওয়াহর প্রচলন ঘটল আর তিনি ও তাঁর অনুসারীরা দীনের মধ্যে বিকৃতি, মুসলিমদের অবৈধভাবে তাকফির, হত্যা, মুসলিম রমণীদের সঙ্গে অপকর্ম, তাদের সঙ্গে মুশরিক নারীদের মতো আচার-ব্যবহার, আলিম-উলামাদের হত্যা ও গুপ্ত হত্যা ইত্যাদি নানান প্রকারের জুলুম ও খোরাফাতের মাধ্যমে নজদে ব্যাপক ত্রাসের সৃষ্টি করলেন, তখন উম্মতে মুসলিমাহকে হিফাজতের জন্য খাওয়ারিজদের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে ইলমি বিপ্লব শুরু হলো।

প্রথম নজদের উলামায়ে কিরামরা ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। তাঁরা ওয়াহাবিদের মতাদর্শ রদকরণের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে কলমযুদ্ধ শুরু করলেন। পরে যখন ওয়াহাবিদের ফিতনার খবর নজদের গণ্ডি পেরিয়ে হিজাজ, ইরাক, শাম, ইসতাম্বুল, ভারত ও মিসরসহ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল, তখন বিশ্বজুড়ে আহলুস সুন্নাতের আইম্মায়ে কিরাম নজদিদের নিন্দাজ্ঞাপন করলেন এবং তাদের মতাদর্শের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। তাঁরা কুরআন-সুন্নাহর দলিলের আলোকে নজদি ফিতনার অসারতাকে জনসম্মুখে প্রচার করতে শুরু করলেন, মানুষকে বোঝাতে শুরু করলেন যে, ওয়াহাবি মতাদর্শ একটি বাতিল মতাদর্শ।

এদের মধ্যে আবার কিছু কিছু আলিম ছিলেন, যারা নজদিদের বিষয়ে সম্যক ধারণা না থাকায় প্রথমদিকে নজদি দাওয়াত দ্বারা প্রভাবিত হন, কিন্তু পরবর্তীতে যখন তারা নজদি দাওয়াত ও তাদের ফাসাদাত সম্পর্কে অবগত হন, তখন তারা তাদের আগের অবস্থান থেকে রুজু করেন এবং ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। এভাবে বিশ্বজুড়ে ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাতের আলিমরা সংগ্রাম শুরু করলেন। আমরা এ অধ্যায়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের কতিপয় মাশহুর আহলুস সুন্নাতের আইম্মায়ে কিরামদের বিষয়ে জানব, যারা ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন।

ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে নজদ ও আহসার প্রসিদ্ধ উলামায়ে কিরাম

নজদ ও আহসা অঞ্চল সর্বপ্রথম ওয়াহাবিদের আন্দোলনের শিকার হয়। নজদের বিখ্যাত উলামায়ে কিরাম যারা ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,

১. শায়খ আবদুল ওয়াহহাব নজদি (১১৫৩ হি.)

শায়খ আবদুল ওয়াহহাব নজদি ছিলেন নজদের প্রসিদ্ধ হাম্বলি আলিমদের একজন। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন, ওয়াহাবি দাওয়াতের জনক মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির পিতা। প্রথম পর্বে তাঁর বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের ওপর শৈশব থেকেই রুষ্ট ছিলেন। তিনি ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের শৈশবে পদস্খলন উপলব্ধি করে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে, তাঁর ছেলে থেকে ভবিষ্যতে বড় ফিতনা প্রকাশ পাবে।

ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির সমসাময়িক নজদের প্রসিদ্ধ আলিম ইবনু হুমাইদ নজদি রাহ. বলেন, '...তিনি (শায়খ আবদুল ওয়াহহাব) তাঁর ছেলে মুহাম্মাদের প্রতি তার পূর্ববর্তীগণ ও সমসাময়িকগণের অনুরূপ ফিকহ চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে রাজি না হওয়ায় রুষ্ট ছিলেন এবং তার

বিষয়ে তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন যে, তাঁর মাধ্যমে খারাপ জিনিস সংঘটিত হবে। তিনি মানুষদের বলতেন, তোমরা একদিন মুহাম্মাদের মাধ্যমে খারাপ জিনিস (ঘটতে) দেখবে।'[২৭৫]

ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির সমসাময়িক মক্কার শাফিয়ি গ্র্যান্ড মুফতি শায়খুল ইসলাম জাইনি দাহলান রাহ. বলেছেন, 'তাঁর পিতা, ভাই ও শিক্ষকরা তার (ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের) বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন যে, শিঘ্রই তাঁর থেকে বিচ্যুতি ও পথভ্রষ্টতা প্রকাশ পাবে।'[২৭৬]

ইরাকের প্রসিদ্ধ আলিম ও আরবি সাহিত্যিক জামিল সিদকি রাহ. বলেন, 'আর অনুরূপভাবে তাঁর পিতা আবদুল ওয়াহহাব যিনি সৎ আলিম ছিলেন তাঁর (ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের) বিষয়ে ইলহাদের (দীন থেকে বেরিয়ে যাবার) ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন এবং মানুষকে তার বিষয়ে সচেতন করতেন।'[২৭৭]

ইবনু আবদুল ওয়াহহাব তাঁর দাওয়াতের সূচনালগ্নে ইরাক থেকে বিতাড়িত হয়ে বিভিন্ন স্থান ঘুরে নজদের হুরায়মালাতে আসেন, সেখানে তাঁর পিতা অবস্থান করছিলেন। ইবনু আবদুল ওয়াহহাব যখন সেখানে মানুষের ওপর শিরক বিদআতের অপবাদ দিয়ে দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন, তখন তাঁর পিতা আবদুল ওয়াহহাব তাঁর ওপর চরমভাবে অসন্তুষ্ট হন। ওয়াহাবি ইতিহাসবিদ উসমান ইবনু বিশর বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, 'এমনকি তাঁর ও তাঁর পিতার মধ্যে বাকবিতন্ডা ঘটে।'[২৭৮] তিনি এই তথ্যও দিয়েছেন যে, পিতার সঙ্গে বাকবিতন্ডা হওয়ার পর ইবনু আবদুল ওয়াহহাব বেশ কিছু দিন চুপচাপ ছিলেন এবং যখন তাঁর পিতার মৃত্যু হলো, তিনি প্রকাশ্যে তাঁর দাওয়াতি কাজ শুরু করেন।

২. শায়খ সুলায়মান ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি (১২০৮ হি.)

শায়খ সুলায়মান ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি ছিলেন, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির ভাই এবং তদানীন্তন নজদের হাম্বলি মাজহাবের প্রসিদ্ধ আলিমদের একজন। ১১৫৩ হিজরিতে মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির পিতা শায়খ আবদুল ওয়াহহাব নজদি মৃত্যুবরণ করলে, হুরায়মালা প্রদেশে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন সুলায়মান। নজদে যখন ওয়াহাবি ফিতনার প্রসার ঘটে তখন পিতার মতো সুলায়মানও ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে সরব হন। তিনি ওয়াহাবি মতাদর্শ রদ করে একটি বই রচনা করেন যার নাম হলো, الصواعق الالهية في الرد علي الوهابية। সুলায়মান যখন ওয়াহাবি দাওয়াতের বিরোধিতা শুরু করেন, তখন তাঁর ভাই ও ওয়াহাবি মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা শায়খ ইবনু হুমাইদ রাহ. তাঁর 'আস-সুহুবুল ওয়াবিলা' বইয়ে বর্ণনা করেছেন।

ইতিহাসবিদ ইবনু লাবুন তাঁর ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের ১৬৩ পৃষ্ঠায় বলেন, 'তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ও আবদুল আজিজ তাঁকে ঘৃণা করতেন এবং তাঁকে দিরিয়াতে অবস্থান করতে বাধ্য করেন।

সম্প্রতি আরবি সালাফিরা একটি ভূয়া চিঠি দিয়ে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে থাকেন যে, পরবর্তীতে সুলায়মান তাঁর অবস্থান থেকে রুজু করেছিলেন, কিন্তু এ প্রোপাগান্ডা রদ করেছেন স্বয়ং ওয়াহাবি মতাদর্শী ইতিহাসবিদ ও তাদের ইমাম ইবনু বাসসাম। তিনি তাঁর উলামাউ নাজদ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫৪ পৃষ্ঠায় উক্ত চিঠিটি ভূয়া হওয়ার বিষয়ে মত প্রদান করেছেন।

৩. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল লতিফ (১১৮১ হি.)

শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল লতিফ শাফিয়ি রাহ. ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির সমসাময়িক নজদের বরিষ্ঠ শাফিয়ি মাজহাবের আলিমদের একজন। একসময় স্বয়ং ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেন। নজদে যখন ওয়াহাবি ফিতনার আবির্ভাব ঘটে তখন ইবনু আবদুল লতিফ ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। মিসবাহুল আনাম বইয়ের তৃতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে, 'ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের রদ করেছেন তাঁর শায়খ ইমাম মুহাক্কিক আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল লতিফ একটি বইয়ে, যার নাম হলো, سيف الجهاد لمدعي الاجتهاد

২৭৫. আস-সুহুবুল ওয়াবিলা : ২৭৫

২৭৬. ফিতনাতুল ওয়াহাবিয়া : ৪

২৭৭. আল-ফাজরুস সাদিক : ১২

২৭৮. উনওয়ানুল মাজদ ফি তারিখিন নজদ : ১/৩৭

৪. ইমাম ইবনু আফালিক হাম্বলি (১১৬৩ হি.)

ইমাম ইবনু আফালিক আল হাম্বলি রাহ. ছিলেন, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির সমসাময়িক একজন মুজাদ্দিদ পর্যায়ের সুবিখ্যাত হাম্বলি আলিম। তাঁর পুরো নাম ছিল, মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান ইবনু হুসাইন আল-আফালিকি আল-আহসায়ি। তিনি ১১০০ হিজরি—১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে নজদের আল-আহসা প্রদেশে বিখ্যাত কাহতান গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্য তাঁকে আল-কাহতানিও বলা হতো। শৈশব থেকে ইবনু আফালিক ছিলেন অত্যন্ত ধীশক্তির অধিকারী। তিনি হারামাইন শরিফাইন, দিমাশক, বাগদাদ ও বসরার মতো ঐতিহাসিক শহরগুলো ভ্রমণ করে সেখানকার বিখ্যাত আলিমদের থেকে ইলম হাসিল করেন। নজদের বুকে যখন ওয়াহাবি ফিতনা শুরু হয়, তখন শায়খ আফালিক রাহ. ইবনু আবদুল ওয়াহহাবকে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের কাছে বেশকিছু প্রশ্নের উত্তর চেয়ে পাঠান, কিন্তু স্বল্পজ্ঞানী ইবনু আবদুল ওয়াহহাব সেসব প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম হয়েছিলেন। শায়খ ইবনু আলাবি বলেন, 'আর ইবনু আবদুল ওয়াহহাব শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আফালিক রাহ. যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার কোনোটির উত্তর দিতে সক্ষম হলো না।'[২৭৯]

নজদে যখন ওয়াহাবি ফিতনা ব্যাপক প্রভাব ফেলতে শুরু করে, তখন ইবনু আফালিক রাহ. অন্যান্য আলিমদের মতো ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। তিনি ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি ও তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে একাধিক রিসালা লেখেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিল, تهكم المقلّدين في مدعي تجديد الدين

তিনি ওয়াহাবিদের তাওহিদের বিকৃতি দেখে তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তোমাদের তাওহিদের অর্থ হলো, মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা ও তাদের তাকফির করা।' ইমাম আফালিক রাহ. তাঁর শেষজীবন পর্যন্ত ওয়াহাবিদের বিরোধিতা করে গেছেন।

৫. ইমাম ইবনু ফিরুজ হাম্বলি (১২১৬ হি.) ও ইমাম সালিহ ইবনু আবদুহ

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির সমসাময়িক নজদের যত মহান মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন, ইমাম ও মুজাদ্দিদ ইবনু ফিরুজ হাম্বলি রাহ.। তাঁর পুরো নাম ছিল, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুহ ইবনু ফিরুজ আল-হাম্বলি আল-আহসায়ি আত-তামিমি। ১১৪২ হিজরির ১৮ রবিউল আউয়াল নজদের আল-আহসা প্রদেশে এক সম্ভ্রান্ত দীনি পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ফিরুজ রাহ. ছিলেন সে যুগের একজন বিশিষ্ট ফকিহ। শৈশবে মাত্র নয় বছর বয়সে জুদারি বা গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। ফলে কেবল লাল রঙ ছাড়া অন্য কোনো রঙ দেখতে পেতেন না। কিন্তু তাঁর খোদাভীরুতা ও উৎসাহ তাঁকে ইলম অর্জন থেকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তদানীন্তন নজদ ও হিজাজের বিখ্যাত বিখ্যাত শায়খদের থেকে তিনি হাদিস, ফিকহ, নাহু, বায়ানসহ সকল বিষয়ে গভীর ইলম অর্জন করেন। তাঁর উসতাজরা তাঁর প্রসংশায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তিনি হাদিস শিক্ষা নেন তদানীন্তন হিজাজ ও নজদের সুবিখ্যাত শায়খদের কাছে থেকে। যাদের মধ্যে ছিলেন, শায়খ আবুল হাসান সিন্ধি রাহ., মুহাম্মাদ সায়িদ সফরুল মাদানি রাহ., শায়খ ইমাম হায়াত সিন্ধি হানাফি ও শায়খ ইমাম ইবনুল আফালিক হাম্বলি রাহ. প্রমূখের থেকে। অল্পকালের মধ্যেই ইবনু ফিরুজ নজদের শ্রেষ্ঠতম আলিমদের মধ্যে একজন হয়ে উঠলেন। তাঁর জীবদ্দশায় নজদে ওয়াহাবি ফিতনার উদ্ভব ঘটে। ওয়াহাবিদের বিচ্যুতি ও তাদের কর্তৃক নিষ্পাপ মুসলিমদের তাকফির তাঁকে চরমভাবে ব্যথিত করে তোলে। ফলে তিনি ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে মসি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির দাওয়াত কে রদ করে একাধিক রিসালা রচনা করেন। ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের রদে লিখিত তাঁর রিসালাসমূহের মধ্যে অন্যতম দুইটি রিসালা হলো, الرسالة المرضية في الرد على الوهابية و الرد على من كفر أهل الرياض ومن حولها من المسلمين। এমনকি নজদে ওয়াহাবিদের ফিতনার ভয়াবহতা অবলোকন করে তিনি তদানীন্তন উসমানি খলিফা সুলতান আবদুল হামিদ খান আওয়াল রাহ.-কে পত্রের মাধ্যমে ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেন। তদানীন্তন নজদের বিশিষ্ট শায়খ ইবনু হুমাইদ হাম্বলি রাহ. বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন, 'তিনি (ইবনু ফিরুজ) সুলতান আবদুল হামিদ খানের সঙ্গে নজদে খারিজি বাগীদের (ওয়াহাবিদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আবেদন করে চিঠি বিনিময় করেন।'[২৮০]

নজদে ইমাম ইবনু ফিরুজ রাহ.-এর নেতৃত্বে একটি ওয়াহাবিবিরোধী বিপ্লব গড়ে উঠেছিল। যদিও শেষপর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর পর সেই বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী

২৭৯. মিসবাহুল আনাম : ৪।

২৮০. আস-সুহুবুল ওয়াবিলা : ৪০১

হতে পারেনি।

৬. ইমাম আবদুল্লাহ জুবাইরি (১২২৫ হি.)

ইমাম ইবনু ফিরুজের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনু দাউদ জুবাইরি হাম্বলি। তিনিও ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের মতাদর্শ রদ করে একটি বই লিখেছেন যার নাম হলো, 'আস-সাওয়ায়িকু ওয়ার রুয়ুদ'। এ বইয়ে তিনি ওয়াহাবিদের গুরু ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ও প্রথম আবদুল আজিজ ইবনু সৌদকে রদ করেছেন।

৭. শায়খ সুলায়মান ইবনু সুহাইম (১২৩০ হি.)

শায়খ সুলায়মান ইবনু সুহাইম আল-আনাজি আল-হাম্বলি রাহ. ছিলেন, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সময়ের রিয়াদের শ্রেষ্ঠ হাম্বলি ফকিহদের একজন। তাঁর ইলমি গভীরতা, প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের জন্য একসময় তিনি রিয়াদের কাজি নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রথমদিকে নজদের বুকে যখন ওয়াহাবি মতাদর্শের আবির্ভাব ঘটে তিনি ওয়াহাবিয়াত দ্বারা প্রভাবিত হন। পরবর্তী সময়ে যখন ওয়াহাবি মতাদর্শের স্বরূপ তাঁর সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল, তখন তিনি রুজু করলেন এবং ওয়াহাবিদের ঘোর বিরোধিতা শুরু করলেন। তাঁর পিতা সুহাইমও ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকিহ ও কট্টর ওয়াহাবি মতাদর্শবিরোধী আলিম। যেহেতু তারা ওয়াহাবি মতাদর্শের ঘোরবিরোধী ছিলেন, তাই ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ইবনু সুহাইম রাহ. ও তাঁর পিতা উভয়কেই তাকফির করেন। আদ-দুরারুস সানিয়ার দশম খণ্ডের ৩১ নম্বর পৃষ্ঠায় ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের একটি চিঠি নকল করা হয়েছে, যাতে তিনি উপরোক্ত ফকিহদ্বয়কে তাকফির করেন। চিঠিটির শুরুতে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব উভয়কে তাকফির করে বলেন,

و قبل الجواب: نذكر لك انك انت و اباك مصرحون بالكفر و الشرك و النفاق[281]

উক্ত চিঠিতে ইবনু সুহাইম ও তাঁর পিতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরও বলেন যে, 'তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মর্মার্থ বোঝ না।' অত্যন্ত হাস্যকর বিষয় হলো, যে কেবল ওয়াহাবি মতাদর্শের বিরুদ্ধে থাকার কারণে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ইবনু সুহাইম ও তাঁর পিতার মতো প্রখ্যাত আলিমকে কালিমার অর্থ জানেন না এমন এক হাস্যকর এবং গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি লেখেন, 'এ বিষয়টি তোমার কাছে আমরা স্পষ্টরূপে উন্মোচিত করব যাতে তুমি আল্লাহর কাছে তাওবা করো এবং ইসলামে প্রবেশ করো'। এরপর ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ইবনু সুহাইমের ওয়াহাবিয়াতের বিরোধিতা ও লোকদের ওয়াহাবিয়াতের বিরুদ্ধে সচেতন করাকে ইসলামের বিরোধিতা হিসেবে দেখিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন।

ইমাম সুলায়মান ইবনু সুহাইম রাহ. ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদি ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে একটি রিসালা লিখে নজদি ও তাঁর মতাদর্শকে রদ করেছেন। যাতে তিনি ওয়াহাবিদের কুকর্মের বিষদ বর্ণনা দিয়েছেন। উক্ত রিসালায় তিনি ইবনু আবদুল ওয়াহহাবকে বিদআতি ও পথভ্রষ্ট বলেছেন।

৮. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু সুহাইম হাম্বলি

শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ছিলেন নজদের সুদাইর অঞ্চলের কাজি। ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে বিশেষত তাদের তাকফিরি মতাদর্শের বিরুদ্ধে তিনি সদাসোচ্চার ছিলেন। ওয়াহাবি ইতিহাসবিদ ইবনু বাসসাম তাঁর 'তারিখে নজদ' এ শায়খ আবদুল্লাহকে সালাফি দাওয়াতের বিরোধী বলে অভিহিত করেছেন।

৯. শায়খ নাসির ইবনু সুলায়মান হাম্বলি

ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের যুগের নজদের হাম্বলি আলিমদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শায়খ নাসির রাহ.। তাকওয়া-পরহেজগারীতে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইমাম ইবনু ফিরুজ, শায়খ উসমান বসরিদের মতো সে যুগের রত্নরাও তাঁর প্রসংশায় পঞ্চমুখ ছিলেন। শায়খ নাসির ছিলেন কট্টর ওয়াহাবিবিরোধী আলিম। কেবল তিনি নন তাঁর পিতামহ ও পিতাও নজদি দাওয়াতের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। শায়খ ইবনু হুমাইদ এ প্রসঙ্গে বলেন,

---

২৮১. الدرر السنية في الاجوبة النجدية، ج ١٠، ص ٣١

আর তাঁর সম্মানিত দাদা তাদের একজন যারা আরিজের বিদআতিটার (ইবনু আবদুল ওয়াহাবের) বিদআতকে দমন করেছিলেন।[২৮২]

ওয়াহাবি ইতিহাসবিদ ইবনু বাসসাম নাসির রাহ.-এর পরিবারের বিষয়ে বলেন, 'এ জ্ঞানী পরিবার ছিল, ওই সকল ব্যক্তির মধ্যে যারা ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সালাফি দাওয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং তাঁর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করেন।'[২৮৩]

১০. শায়খ মিরবাদ ইবনু আহমাদ হাম্বলি (১১৭১ হি.)

শায়খ মিরবাদ ছিলেন নজদের আরও একজন প্রসিদ্ধ আলিম। তিনি হুরায়মালা প্রদেশের কাজি ছিলেন। নজদ ও শামের ফকিহদের কাছ থেকে তিনি ইলম অর্জন করেন। অন্যান্য শায়খদের মতো তিনিও ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাতের কাফেলায় যোগদান করেন। ইবনু বাসসাম তাঁর 'তারিখু নজদ' এর পঞ্চম খণ্ডের ৪১৬ পৃষ্ঠায় তাঁকে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের শত্রু হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এ সময় নজদের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন সানআনি রাহ.। প্রথমদিকে ওয়াহাবিদের বিষয়ে তাঁর সম্যক ধারণা না থাকায় তিনি ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির প্রসংশায় কবিতা রচনা করেন। পরে মিরবাদ রাহ. যখন ইয়ামেন গমন করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং দলিলসহ ওয়াহাবি দাওয়াতের স্বরূপ তাঁর সামনে তুলে ধরেন। ফলে তাঁর আগের অবস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনি সুদীর্ঘ ৯৩ বায়ত (পংক্তি) বিশিষ্ট কাসিদা রচনা করেন, যার শুরুটা করেছেন এভাবে,

আমি নজদির বিষয়ে বলা কাব্য থেকে রুজু করলাম
আমার কাছে তাঁর সম্পর্কে যা (ধারণা) ছিল তার বিপরীতটা সঠিক প্রতীয়মান হলো
আমি তার ব্যাপারে সুধারণা রেখেছিলাম এবং এই সেই বলেছিলাম
আমি তাকে নসিহতকারী ভেবেছিলাম যে মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করে ও নিজে হিদায়াত প্রার্থনা করে
তার ব্যাপারে (আমাদের) ধারণাটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে আমাদের নসিহতটা নয়।

'দিওয়ানুস সানআনি'এর ১৩৬ থেকে ১৪০ পৃষ্ঠায় কাব্যটি সংরক্ষিত রয়েছে। ওয়াহাবি ইতিহাসবিদ ইবনু বাসসাম তাঁর 'উলামাউ নজদ' বইয়ের পঞ্চম খণ্ডের ৪২০ পৃষ্ঠায় কাসিদাটির কথা উল্লেখ করেছেন এবং সানআনির রুজুর ঘটনাটি সত্যায়িত করেছেন। নবাব সিদ্দিক হাসান খান তাঁর 'আবজাদুল উলুম' গ্রন্থে শায়খ সানআনি ওয়াহাবিদের সমর্থন থেকে রুজুর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে শায়খ মিরবাদ তামিমি হাম্বলি রাহ.-কে ১১৭১ হিজরি সনে ওয়াহাবিরা হত্যা করে।

১১. শায়খ আহমাদ আল-মিসরি (১৪০৫ হি.)

শায়খ আহমাদ ছিলেন ওয়াহাবিদের রদকারী উলামায়ে নজদের একজন। 'মিসবাহুল আনাম' বইয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একটি রিসালার শরাহে ওয়াহাবিদের রদ করেছেন।

১২. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইসা

আবদুল্লাহ ইবনু ইসা মুয়াইসি ছিলেন ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সমসাময়িক নজদের একজন সুপ্রসিদ্ধ হাম্বলি আলিম। তিনি নজদের হুরমা শহরে বনু তামিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। নজদ থেকে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি পাড়ি জমান শাম দেশের দিমাশকে। সেখানে তিনি বিখ্যাত আলিমদের থেকে দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর উসতাজদের মধ্যে ছিলেন, বিশ্ববরেণ্য হাম্বলি ইমাম শায়খ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ সাফফারিনি হাম্বলি রাহ.। সাফফারিনির মতো শায়খ মুয়াইসিও ওয়াহাবি মতাদর্শের বিরোধী ছিলেন। 'মিসবাহুল আনাম 'বইয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ওয়াহাবিদের রদে তাঁর কিছু পত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩. শায়খ সাইফ ইবনু আহমাদ

২৮২. আস-সুহুবুল ওয়াবিলা : ১১৪৪
২৮৩. উলামাউ নজদ

শায়খ সাইফ ইবনু আহমাদ আল-আতিকি রাহ. নজদের একজন জাহিদ মুত্তাকি আলিম ছিলেন। ইমাম ইবনু হুমাইদ রাহ. তাঁকে খোদাভীরু, সৎ ফকিহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সাইফ ইবনু আহমাদের পরিবার ছিল হাম্বলি মাজহাবের অনুসারী। নজদে ওয়াহাবি ফিতনার সূচনা ঘটলে তিনি ও তাঁর ছেলে সালিহ ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতরণ করেন। 'আস-সুহুবুল ওয়াবিলা' বইয়ের ১২৬ পৃষ্ঠায় আরিজের সীমালংঘনকারী ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪. সাইয়িদ আল-মুনয়িমি

শায়খ সাইয়িদ আল-মুনয়িমি রাহ. নজদের একজন বিশিষ্ট আলিমে দীন। ওয়াহাবিদের ফিতনা তাঁকে পীড়া দিত। ইতিহাস পর্বে আমরা হাজিদের ওপর ওয়াহাবিদের দমনপীড়ন নিয়ে আলোচনা করার সময় জেনেছি, ওয়াহাবিরা বলপূর্বক হাজিদের নেড়া করত। তারা মুসলিম রমণীদেরও নেড়া করা থেকে রেহাই দিত না। একদা ইবনু আবদুল ওয়াহহাব বেশ কিছু মুসলিমকে নেড়া না হওয়ার অপরাধে হত্যা করলে, শায়খ আল-মুনয়িমি নজদির বিরুদ্ধে একটি কাব্য রচনা করেন যার সূচনাটি ছিল এরকম,

أفي حلق رأسي بالسكاكين و الحد

حديث صحيح بالاسانيد عن جدي

'মিসবাহুল আনাম' বইয়ের ছয় নম্বর পৃষ্ঠায় কাসিদাটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫. শায়খ রাশিদ ইবনু খিন্নিন হানাফি (১২০৬ হি.)

ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সময়কার নজদের প্রসিদ্ধ আলিম ও হানাফি মাজহাবের অনুসারী কাজিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শায়খ রাশিদ ইবনু খিন্নিন হানাফি রাহ.। তিনি তদানীন্তন খারজ অঞ্চলের কাজি ছিলেন। ইবনু আবদুল ওয়াহহাব যখন আউলিয়াদের কবর জিয়ারত নিয়ে বাড়াবাড়ি করছিলেন এবং মুসলিমদের তাকফির করছিলেন, তখন শায়খ হানাফি রাহ. তাঁর বিরুদ্ধে একটি কাসিদা লেখেন। কাসিদাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হয়েছে,

وكن قاصدا بالسير منك زيارة

لمن حلها رغما لانف المماذق

فمن قال لا تشدُد رِحالك نجوه

على القصد بل في ضمن شيء مطابق

فقد خالف الاجماع منه ضلالة

فسحقا لمن يتبع ضلالة مارق

فزر قبره إن الزيارة سنة

على كل مشتاق اليه وشائق

ونافس بها أيام عمرك كلها

تفقها وفاقا عند أهل التوافق

توجه على وجه الوجيه مقابلا

وشاهد لانوار الحبيب البوارق

وقف من بعيد مطرقا متادبا

ولا تتفكر في نقوش السرادق

وسلم بلا صوت رفيع على الذي

تلوذ به من كل خطب مضائق

محمد الجالى عن القلب رينه

ومن فاق حقا في العلي كل فائق

'মিসবাহুল আনাম' বইয়ের ৭৬ পৃষ্ঠায় কাসিদাটির উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়াও গুগলে কাব্যটি সহজলভ্য।

১৬. শায়খ উসমান ইবনু আবদুল আজিজ মানসুর

ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির সমসাময়িক নজদের প্রসিদ্ধ আলিমদের একজন ছিলেন শায়খ উসমান। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন কোনো এক অঞ্চলের কাজি। তিনি ওয়াহাবিদের রদে একাধিক বই রচনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে جلاء الغمة عن تكفير هذه الامة, غسل الدرن عما ركبه هذا و الرجل من المهن, تبصرة اولي الالباب و منهج المعارج لاخبار الخوارج।

১৭. শায়খ উসমান বসরি

নজদি ওয়াহাবিবিরোধী আলিমদের মধ্যে ছিলেন শায়খ উসমান বসরি রাহ.। তিনি তাঁর বই مطالع السعود بطيب اخبار الوالي داوود-এর মধ্যে ওয়াহাবিদের রদ করেছেন।

১৮. ইমাম উসমান ইবনু আবদুহ হাম্বলি

ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সমসাময়িক নজদি হাম্বলি আইম্মায়ে কিরামদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম উসমান। তাঁর বংশধররা মাদানি ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতামহ ও ভাই মদিনা মুনাওয়ারা থেকে চলে আসেন নজদে। তাঁর দাদা জামেসহ তাদের বংশধরদের অনেকেই ছিলেন সে যুগের গণ্যমান্য আলিম, এ কারণে আলে জামে-কে তখনকার সময় জ্ঞানীদের বংশধর হিসেবে গণ্য করা হতো। শায়খ উসমান শিক্ষাজীবনে যত মনীষীদের সান্নিধ্য লাভ করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইমাম ইবনু ফিরুজ রাহ.। নজদে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের ফাসাদাত সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের ফিতনাসমূহের একটি ছিল, তিনি নামাজ বা কোনো ইবাদতের পর হাত তুলে দুআ করার ঘোরবিরোধী ছিলেন। এ বিষয়টি রদ করতে গিয়ে শায়খ উসমান রাহ. ইবনু আবদুল ওয়াহহাবকে আরিজের সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

> এরপর যখন আরবের অত্যাচারী ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের দুআর সময় হাত তোলার ক্ষেত্রে নিষেধের ফাসাদটি তোমার কাছে স্পষ্ট হলো...[২৮৪]

এ ছাড়াও বইটার জায়গায় জায়গায় ইমাম উসমান রাহ. ইবনু আবদুল ওয়াহহাবকে আরিজের সীমালঙ্ঘনকারী বলে অভিহিত করেছেন। সাম্প্রতিক ওয়াহাবিরা বইটির নতুন নুসখা প্রকাশ করেছে, যেখানে অধিকাংশ জায়গা থেকে طاغية العارض শব্দটি মুছে ফেলে '...' বসিয়ে দিয়েছে। তবে কিছু জায়গায় তাদের অন্যমনস্কতা বশত শব্দটি হুবহু রয়ে গেছে।

১৯. শায়খ আবদুল আজিজ হাম্বলি

নজদি আলিমদের মধ্যে আরও একজন হলেন শায়খ আবদুল আজিজ আল-হানজালি। ওয়াহাবি ইতিহাসবিদ ইবনু বাসসাম তাঁর তারিখু নজদের তৃতীয় খণ্ডের ৫৪০ পৃষ্ঠায় বলেন যে, 'তিনি ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ও তাঁর দাওয়াতের রদ করেছেন।'

২০. শায়খ সালিহ ইবনু মুহাম্মাদ হাম্বলি

শায়খ সালিহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-উনায়জি আল-হাম্বলি রাহ. নজদের বিখ্যাত আলিমদের একজন ছিলেন। ওয়াহাবি ইতিহাসবিদ ইবনু বাসসাম তাঁর তারিখু নজদের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৪০ পৃষ্ঠায় তাঁর বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তিনি নজদের মহান উলামাদের একজন হয়ে ওঠেন।'

ইমাম সানআনি রাহ. প্রথমদিকে যখন পরিপূর্ণ অবগতি না থাকার কারণে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের প্রসংশায় কাব্য রচনা করেন, তখন তাঁর কাব্যের জবাবে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের দাওয়াতের বিরুদ্ধে শায়খ সালিহ একটি কাব্য রচনা করেন যার শুরু ছিল এভাবে,

سلام من الرحمن احلي من الشهيد
و اطيب عرفا من شذي المسك و الورد

'আস-সুহুবুল ওয়াবিলা' এর ৪৩০ পৃষ্ঠায় কাসিদাটির উল্লেখ রয়েছে।

---

২৮৪. الفوائد المنتخبات في شرح اخضر المختصرات : ২০৭

দুই. ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে হিজাজের উলামায়ে কিরাম

ওয়াহাবি মতাদর্শ ও তার জনক ইবনু আবদুল ওয়াহাব নজদির বিরুদ্ধে হিজাজের যেসব প্রসিদ্ধ উলামায়ে কিরাম কলম ধরেছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,

১. ইমাম আহমাদ জাইনি দাহলান (১৩০৪ হি.)

হিজাজ শরিফের প্রসিদ্ধ আইম্মায়ে কিরামদের মধ্যে প্রথম যার নাম নিতে হয় তিনি হলেন ইমাম আহমাদ জাইনি দাহলান আশ-শাফিয়ি। জাইনি দাহলান ১২৩২ হিজরি মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে মক্কার গ্র্যান্ড মুফতি, গবেষক ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ছিলেন। উসমানিরা তাঁকে শায়খুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত করে। ইমাম আহমাদ জাইনি দাহলান রাহ. তাঁর একাধিক বইয়ে ওয়াহাবিদের বর্বরতার ইতিহাস তুলে ধরেছেন এবং এই মতাদর্শকে রদ করেছেন। ওয়াহাবি মতাদর্শ রদে তাঁর লিখিত কিতাবাদির মধ্যে রয়েছে,

ক. 'খুলাসাতুল কালাম ফি বায়ানি উমারায়িল বালাদিল হারাম' বইটির শেষের দিকে ওয়াহাবিদের ইতিহাস সবিষদে তুলে ধরেছেন।

খ. 'আল-ফুতুহাতুল ইসলামিয়া' প্রিয় হাবিব সাঃ-এর ইহলোক ত্যাগের পর থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিজয়গাথা সম্বলিত বই। এর দ্বিতীয় খণ্ডটি ওয়াহাবিদের ইতিহাস নিয়ে রচিত। উক্ত খণ্ডের নাম হলো, আল-ফিতনাতুল ওয়াহাবিয়া।

গ. 'আদ-দুরারুস সুন্নিয়া ফির রাদ্দি আলাল ওয়াহহাবিয়া' ওয়াহাবিদের বিভিন্ন বিদআতের রদে তিনি এ বইটি রচনা করেছেন।

২. শায়খুল ইসলাম হুমাইদান ইবনু তুরকি হাম্বলি (১২৯৫ হি.)

তিনি ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের সময়কার মদিনা মুনাওয়ারার প্রসিদ্ধ হাম্বলি আলিমদের একজন ছিলেন। তিনি একজন মারজা আলিম। শরিয়ত ও তরিকতের বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'শায়খুল ইসলাম' বলা হতো। আরবে ওয়াহাবিদের উদ্ভব ঘটলে তাদের রদ করতে তিনি কলম ধরেন। 'আস-সুহুবুল ওয়াবিলা' বইয়ের ৬৬৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'তাঁর রচনা রয়েছে যার দ্বারা তিনি আরিজের স্বেচ্ছাচারীদের রদ করেছেন।'

৩. শায়খ ইবনু সুলায়মান কুর্দি (১১৯৪ হি.)

আবু আবদুহ মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান আফেন্দি আল-কুর্দি আল-মাদানি (ওফাত ১১৯৪ হিজরি) ছিলেন, মদিনা শরিফের একজন জ্ঞানবৃদ্ধ আলিম। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন ওয়াহাবি মতাদর্শের জনক ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির শিক্ষক। ইবনু আবদুল ওয়াহহাব যখন নজদে তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন, তখন তাঁর শিক্ষক সুলায়মান নিজ ছাত্র ইবনু আবদুল ওয়াহাব ও ওয়াহাবি মতাদর্শের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। ওয়াহাবি মতাদর্শের বিরুদ্ধে তাঁর একাধিক রিসালা রয়েছে। 'মিসবাহুল আনাম' বইয়ের শেষের দিকে তাঁর একটি সুদীর্ঘ রিসালা নকল করা হয়েছে যেটি তিনি ওয়াহাবিদের রদ করে রচনা করেছিলেন। এ ছাড়াও مسائل و اجوبة و ردود علي الخوارج নামে তাঁর একটি রিসালা রয়েছে। উক্ত রিসালায় তিনি ওয়াহাবিদের খারিজি বলে অভিহিত করেন।

৪. শায়খ আতাউল্লাহ মাক্কি

হিজাজ শরিফের নজদিবিরোধী কাফেলার আরও একজন কান্ডারি হলেন শায়খ আতাউল্লাহ মাক্কি। ওয়াহাবি মতাদর্শ রদে তাঁর একটি রিসালা রয়েছে যার নাম হলো, 'আস-সারিমুল হিন্দিইয়ু আলা উনুকিন নজদি'।

৫. ইমাম আবদুল ওয়াহহাব ইবনু আহমাদ বারাকাত মাক্কি (১৪১৮ হি.)

ওয়াহাবি দাওয়াতের সূচনালগ্নে হিজাজে প্রথম যে ব্যক্তি ওয়াহাবি মতাদর্শ রদে কলম ধরেছিলেন তিনি হলেন, ইমাম আবদুল ওয়াহহাব ইবনু আহমাদ বারাকাত রাহ.। তিনি তদানীন্তন হিজজের শাফিয়ি উলামাদের অন্যতম ছিলেন। ওয়াহাবি মতাদর্শ রদে তাঁর একটি বই রয়েছে যার নাম হলো ردع الضلالة و قمع الجهالة।

৬. ইমাম সাইয়িদ আবদুল্লাহ ইবনু ইবরাহিম মিরগিনি (১২০৭ হি.)

তিনি হিজাজি আউলিয়ায়ে কিরামদের একজন ছিলেন। ওয়াহাবিদের রদকারী প্রথম পর্যায়ের আলিমদের তিনি একজন। ওয়াহাবিদের রদে তাঁর লিখিত বই হলো, تحريض الاغبياء علي الاستغاثة بالانبياء و الاولياء। বইটিতে তিনি আগবিয়া বা নির্বোধ ওয়াহাবিদের সমালোচনা করেন।

৭. ইমাম সালিহ ইবনু ইবরাহিম জমজমি

ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের রদে মাক্কি উলামাদের তিনি ছিলেন একজন। ওয়াহাবিদের রদে তাঁর একটি রিসালা রয়েছে যার নাম হলো, 'আর-রাদ্দু আলাল ওয়াহহাবিয়া' |

৮. ইমাম সাবি মালিকি (১২৪১ হি.)

মালিকি মাজহাবের যুগশ্রেষ্ঠ মুফিসসির ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আস-সাবি ১১৭৫ হিজরিতে মিসরের গারবিয়া প্রদেশের সল হাজার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন| পরবর্তী সময়ে তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন। তিনি সেখানে কাছ থেকে ওয়াহাবিদের ফাসাদাত অবলোকন করেন। ওয়াহাবিদের জুলম-অত্যাচার ও দীনের মধ্যে তাহরিফ লক্ষ্য করে তিনি তাদের খারিজি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি তাফসিরে জালালাইনের একটি শরাহ লিখেছেন যা 'তাফসিরে সাবি 'বা 'হাশিয়াতুস সাবি আলাল জালালাইন ' নামে পরিচিত। বিখ্যাত এ তাফসির গ্রন্থের সুরা ফাতিরের ৬ নম্বর আয়াতে খারিজিদের ব্যাখ্যায় তিনি ওয়াহাবিদের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। সেখানে তিনি ওয়াহাবিদের খাওয়ারিজ ও শয়তানের দল নামে অভিহিত করে লেখেন,

> আর বলা হয়, এ আয়াতটি খারেজিদের বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা কুরআন-সুন্নাহর তাবিলে বিকৃতি ঘটাত এবং মুসলিমদের রক্ত ও সম্পদকে হালাল করত, যেমনটি আজকাল হিজাজের ভূমিতে তাদের অনুরূপ একটি দলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যাদেরকে ওয়াহাবি বলা হয়। তারা মনে করে তারা কিছু একটা। সাবধান, ওরাই তো মিথ্যাবাদী, শয়তান তাদের উপর প্রভাব খাটিয়ে বসেছে, আর তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। জেনে রাখো, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।[২৮৫]

ওয়াহাবিরা এ বইয়ের সংস্করণ করে ওয়াহাবিয়া শব্দটি মুছে ফেলেছে, ফলে কিছু কিছু নুসখায় ওই অংশটির স্থান ফাঁকা পড়ে আছে। তবে মূল নুসখা বা অন্যান্য নুসখায় ওয়াহাবিয়া শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।

www.muslimdm.com

২৮৫. حاشية تفسير الجلالين للإمام احمد بن محمد الصاوي المالكي قدس سره، سورة فاطر : ٦

তিন. ওয়াহাবিদের রদে ইয়ামেনি উলামায়ে কিরাম

হিজাজ ও নজদের আলিমদের পাশাপাশি ইয়ামেনি আহলুস সুন্নাহ মতাদর্শী আইম্মায়ে কিরামরাও ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে কলমযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ইয়ামেনের বিশেষ বিশেষ আলিমদের মধ্যে ছিলেন,

১. শায়খ ইউসুফ ইবনু ইবরাহিম সানআনি

তিনি ছিলেন পূর্বোল্লিখিত ইমাম সানআনির পৌত্র। ওয়াহাবিদের রদে তাঁর একটি রিসালা রয়েছে যার নাম القول المبين في ادحاض حجج الوهابيين। উক্ত রিসালাটির নুসখা জামিআতুল মালিক সৌদে আজও সংরক্ষিত রয়েছে।

২. ইমাম আলাবি হাদ্দাদ

ইয়ামেনি প্রসিদ্ধ শায়খ ও অলি আলাবি আল-হাদ্দাদ রাহ. ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাতের সংগ্রামের অংশগ্রহণ করেন। ওয়াহাবিদের রদে তাঁর লেখা বিখ্যাত একটি বই হলো 'মিসবাহুল আনাম'। উক্ত বইয়ে তিনি ওয়াহাবি মতাদর্শকে রদ করার পাশাপাশি তদানীন্তন আরবের আহলুস সুন্নাতের আইম্মায়ে কিরামদের ওয়াহাবিদের বিষয়ে অবস্থানকে সাবলিল ভাষায় দালিলিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

3. ইমাম আহমাদ ইবনু ইদরিস (১২৫৩ হি.)

ইমাম আহমাদ ইবনু ইদরিস আল-ফাসি রাহ. ১১৬৩ হিজরিতে মাগরিবে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে ইয়ামেনে চলে আসেন। তিনি তাঁর যুগের বিখ্যাত আলিম ও আউলিয়া ছিলেন। ইয়ামেনের ইদরিসি তরিকা তাঁর থেকে শুরু হয়। ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে শায়খ ইবনু ইদরিসের প্রচেষ্টা ইতিহাস বিখ্যাত। শায়খের সঙ্গে ওয়াহাবিদে এক সময় মুনাজারা অনুষ্ঠিত হয়, যার বিষদ বিবরণ 'আল-মুনাজারাতুল কুবরা' বইয়ে রয়েছে। উক্ত মুনাজারাতে তিনি ওয়াহাবিদের রদ করেছিলেন।

4. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইসা (১২২৪ হি.)

শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু ইসা আল-হাসানি আল-কাউকাবানি ১১৭৫ হিজরিতে ইয়ামেনের সানা প্রদেশের কাছে স্থ মুহাফাজাতু মাহবিত প্রদেশের কাউকাবান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আলিম, মুহাদ্দিস, ফকিহ ও শায়ির। শায়খ শাউকানি রাহ.-এর সঙ্গে তাঁর একাধিক ফিকহি আলোচনা হয়। শায়খ কাউকাবানি শাফিয়ি রাহ. ওয়াহাবি মতাদর্শ রদে একটি বিখ্যাত রিসালা রচনা করেন। রিসালাটির শিরোনাম হলো, السيف الهندي في إيانة طريق الشيخ النجدي।

5. শায়খ মুহসিন ইবনু আবদুল কারিম (১২৬৬ হি.)

ইয়ামেনের বড় বড় আলিম যারা ওয়াহাবিদের রদ করেছিলেন তাদের একজন হলেন, মুহসিন ইবনু আবদুল কারিম সানআনি রাহ.। ওয়াহাবিদের রদে তিনি রচনা করেন لفحات الوجد من فعلات اهل نجد।

6. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু হাসান ফিল ফকিহ (১২৭২ হি.)

ইমাম শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু হাসান ফিল ফকিহ আল-আলাবি আল-হুসাইনি আত-তুরাইমি রাহ. ১১৯৮ হিজরি ইয়ামেনের তুরাইম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শরিয়ত ও তরিকত উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর পারদর্শিতা প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি একাধারে ছিলেন আলিম, ফকিহ ও সুফি। ওয়াহাবি মতাদর্শের রদে তিনি লিখেছেন, كتابه في الرد علي الخوارج و من نحا نحوهم।

চার. ওয়াহাবি মতাদর্শের বিরুদ্ধে মিসরি উলামায়ে কিরাম

www.muslimdhara.com

ওয়াহাবি মতাদর্শ রদে বিখ্যাত বিখ্যাত মিসরি আলিমদের মধ্যে রয়েছেন,

১. ইমাম আবদুল ওয়াহহাব ইবনু আহমাদ বারাকাত

অষ্টাদশ শতাব্দীর মিসরি বিশিষ্ট আলিমদের একজন ছিলেন শায়খ আবদুল ওয়াহহাব ইবনু বারাকাত রাহ.। তিনি পরবর্তী সময়ে মক্কায় গমণ করেন। ওয়াহাবি মতাদর্শ রদে তিনি একটি রিসালা লিখেন যার নাম, 'আর-রাদ্দু আলাল ওয়াহহাবিয়া'। সম্ভবত ওয়াহাবিদের মক্কা দখলের আগে তিনি উক্ত রিসালা লিখেন।

২. সাইয়িদ মুসতাফা বুলাকি (১২৬৩ হি.)

সাইয়িদ বুলাকি রাহ. সানআনি রাহ. যখন প্রথমদিকে ওয়াহাবিদের প্রসংশায় কাব্য লেখেন, তাঁর রদে একটি কাব্য রচনা করেন যার শুরু ছিল এভাবে,

بحمد ولي الحمد لا الذم استبدي

و بالحق لا بالخلق للحق استهدي

কাসিদাটির কথা সাআদাতুদ দারাইন বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. শায়খুল ইসলাম ইমাম জাহিদ কাউসারি (১৩৭১ হি.)

বিংশ শতাব্দীর প্রবাদপ্রতিম ইমামদের অন্যতম একজন হলেন, শায়খুল ইসলাম ইমাম জাহিদ বিন হাসান আল-হিলমি আল-কাউসারি রাহ.। তিনি একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, উসুলবিদ, কালাম বিশারদ, দার্শনিক ও সাহিত্যিক ছিলেন। ১২৯৬ হিজরি সনের ২৭ মতান্তরে ২৮ শাওয়াল খিলাফতের রাজধানী ইসলাম্বুল থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত দুজ, যার অনিন্দ্যসুন্দর হাজ হাসান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীশক্তির অধিকারী। ইসলাম্বুলস্থ ফাতিহ জামেতে তিনি বিদ্যার্জন করেন এবং সেখানেই তিনি পরবর্তী সময়ে শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। শরিয়ত ও তরিকতে গভীর পাণ্ডিত্যের কারণে স্বল্পকালেই তিনি একজন মহান ইমাম ও শায়খুল ইসলাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে খিলাফতের পতন হলে কামালপন্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলে তিনি খিলাফতের পবিত্র ভূমি ছেড়ে বিলাদুশ শাম, এরপর মিসরে গমন করেন। ১৩৭১ খৃষ্টাব্দের ১৯ জিলকদ মিশরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করে পরম প্রেমাস্পদের কাছে গমন করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বলতে গিয়ে মিশরের বরিষ্ঠ আলিম ও কাজি শায়খ আবু জুহরা রাহ. বলেন,

> আমি জানি না, কোন আলিম মৃত্যুবরণ করার ফলে তাঁর স্থান ততটা খালি হয়েছে যতটা ইমাম কাউসারির মৃত্যুর ফলে হয়েছে।[২৮৬]

ইমাম জাহিদ কাউসারি ইলমের ময়দানে একজন সিংহ ছিলেন। শরিয়তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত উসুল ও কালামের বিষয়ে তিনি রচনা করেছেন বহু বই। পাশাপাশি আহলুল বিদাদের বিরুদ্ধে তিনি আমরণ সংগ্রাম করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু বই হলো,

مقالات الكوثري،

صفعات البرهان على صفحات العدوان،

العقيدة وعل الكلام من أعمال الإمام محمد زاهد الكوثري،

الفقه وأصول الفقه من أعمال الإمام محمد زاهد الكوثري،

تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب،

نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الأخرة،

الإشفاق على أحكام الطلاق في الرد على من يقول: إن الثلاث واحدة،

اللامذهبية قنطرة اللادينية،

محق التقول في مسألة التوسل،

الاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار

ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে লেখা তাঁর বইয়ের একটি অন্যতম বই হলো, تحذير الخلف من مخازي أدعياء السلف। পাশাপাশি মাকালাতুল কাউসারি গ্রন্থে তিনি ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদিকে তাশবিহকারিদের নেতা হিসেবে উল্লেখ করে ওয়াহাবিদের ফিতনা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

---

২৮৬. العقيدة و علم الكلام من اعمال الامام محمد زاهد الكوثري ، ص ٥ ، دار الكتب العلمية

পাঁচ. ওয়াহাবিদের রদে শামি উলামায়ে কিরাম

শামি বা সিরীয় আলিম যারা ওয়াহাবিদের রদ অভিযানে শামিল হয়েছেন, তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আইম্মায়ে আহলুস সুন্নাহ হলেন,

১. ইমাম ইবনু আবিদিন শামী (১২৫২ হি.)

হানাফি মাজহাবের একজন বিশ্ববরেণ্য ফকিহ হলেন ইমাম ইবনু আবিদিন আদ-দিমাশকি আশ-শামি। তাঁর পুরো নাম ছিল মুহাম্মাদ আমিন ইবনু উমর ইবনু আবদুল আজিজ ইবনু আবদুর রহিম ইবনু নাজমুদ্দিন ইবনু মুহাম্মাদ সালাহুদ্দিন আশ-শামি। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে শামের ঐতিহ্যবাহী দিমাশক নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ পরম্পরা আলি রা. পর্যন্ত গিয়ে মিলেছে। তিনি একাধারে ফকিহ, মুফাসসির ও কাজি ছিলেন। তিনি হানাফি মাজহাবের একজন মারজা ফকিহ। তাঁর লিখিত 'রদ্দুল মুহতার' হানাফি মাজহাবের একটি অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ।

উপমহাদেশে এ বই ফাতওয়ায়ে শামি নামে পরিচিত। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন এ যুগের মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওহাব নজদির সমসাময়িক ব্যক্তি। 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থের ১৩ নং খণ্ডের কিতাবুল জিহাদের বাবুল বুগাতের মধ্যে তিনি খারিজিদের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ওয়াহাবি ও তাদের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ে তিনি নজদিকে খাওয়ারিজ আখ্যা দিয়ে এ নামে একটা আলাদা অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন, مطلب في اتباع عبد الوهاب الخوارج في زماننا। উক্ত অনুচ্ছেদে ওয়াহাবিদের তাকফিরি মতাদর্শ ও তাদের খারিজিয়াত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

> যেমনটা আমাদের সময়ে আবদুল ওয়াহহাবের অনুসারিদের মধ্যে হয়েছে, যারা নজদ থেকে বেরিয়েছিল এবং হারামাইনের উপর নিয়ন্ত্রণ এনেছিল। তারা হাম্বলি মাজহাব লালন করত, কিন্তু তারা মনে করত তারাই মুসলিম আর যারা তাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যেত তারা মুশরিক, আর তার দ্বারা আহলুস সুন্নাহ ও তাদের উলামাদের হত্যা করা বৈধ মনে করেছিল। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের বাড় ভেঙে দিয়েছিলেন এবং তাদের দেশকে ধ্বংস করে দেন, আর মুসলিমবাহিনী ১২৩৩ (হিজরি) সনে তাদের উপর বিজয়ী হয়।[২৮৭]

২. ইমাম সাফফারিনি হাম্বলি (১১৮৮ হি.)

শামি আইম্মায়ে হানাবিলাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জগদ্বিখ্যাত ফকিহ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আস-সাফফারিনি আল-হাম্বলি রাহ.। তিনি ফিলিস্তিনের সাফফারিনে জন্মগ্রহণ করেন। তদানীন্তন সময়ে ফিলিস্তিন শামের অংশ হিসেবে পরিগণিত ছিল। ইমাম সাফফারিনির আকিদা, তাফসির, ফিকহসহ শরিয়তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান অনস্বীকার্য। ওয়াহাবিদের রদে তিনি শামি কাফেলার একজন মর্দে মুজাহিদ হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে তাঁর একটি সুবিখ্যাত বই হলো الاجوبة النجدية عن الاسئلة النجدية। এ ছাড়াও তিনি ওয়াহাবি মতাদর্শ রদে রিসালা রচনা করেছেন।

৩. ইমাম হাসান ইবনু উমর শাত্তি (১২৭৪ হি.)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শামি হানাবিলা ফুকাহায়ে কিরামদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন, ইমাম হাসান ইবনু উমর আশ শাত্তি রাহ.। ১২০৫ হিজরিতে শামের দিমাশক নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ফিকহ, ফারায়িজ, আকায়িদ ও আরবি সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ওয়াহাবি মতাদর্শ রদে তাঁর একটি বিখ্যাত বই হলো, النقول الشرعية في الرد علي الوهابية।

৪. ইমাম ইউসুফ নাবহানি (১৩৫০ হি.)

বিখ্যাত শামি উলামাদের একজন হলেন, হানাফি মহীরুহ ইমাম ইউসুফ ইবনু ইসমাইল আন-নাবহানি রাহ.। ১২৬৫ হিজরি সনে ফিলিস্তিনের হাইফা নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ফিলিস্তিনের বনু নাবহান গোত্রের দিকে নিসবত করে তাঁকে নাবহানিও বলা হতো। তিনি একাধারে ফকিহ, আদিব, দার্শনিক ও কবি ছিলেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর তিনি ফিলিস্তিনের নাবলুসের জানিন অঞ্চলে কাজির দায়িত্বও পালন করেন। এরপর তিনি অধুনা কাজাখস্তানের আস্তানা গমন করেন এবং সেখানে 'জারিদাতুল জাওয়ায়িব' পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিতাবাদি তাসহিহের পবিত্র কর্মে মনোনিবেশ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কুই অঞ্চলের কাজি এরপর বিলাদুশ শামের লাজিকিয়া অঞ্চলে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন।

---

২৮৭. حاشية ابن عابدين رد المحتار علي الدر المختار ، الجزء الثالث عشر، باب البغاة، ص ١٣٥

শেষজীবনে তিনি মদিনায় গমন করেন এবং সেখানে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কিছুদিন অতিবাহিত করেন। এরপর ১৩৫০ হিজরি সনে তিনি রফিকে আলার সান্নিধ্যে গমন করেন।

দীনের খিদমতে তাঁর রয়েছে বিরাট অবদান। ইসলামি শরিয়তের উপর তিনি বহু মূল্যবান বই রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু বই হলো,

إتحاف المسلم بإتحاف الترهيب والترغيب من البخارى ومسلم،

الأحاديث الأربعين في فضائل سيد المرسلين،

الأنوار المحمدية،

التحذير من اتخاذ الصور والتصوير،

جامع كرامات الأولياء،

القول الحق في مدائح خير الخلق

দীনের খিদমতের পাশাপাশি আহলে বিদআত ও তাকফিরিদের বিপক্ষে তিনি কঠিন অবস্থান গ্রহণ করেন। ওয়াহাবিদের বিপক্ষে ছিল তাঁর অবস্থান। তিনি তাঁর 'শাওয়াহিদুল হক' গ্রন্থে ওয়াহাবিদের বিদআতি আখ্যায়িত করে বলেন,

> ওয়াহাবিরা বিদআতি, যারা নজদের দেশে প্রকাশ পেয়েছিল এবং তাদের মাজহাব অঞ্চলটির চারপাশে বিস্তার লাভ করেছিল।[২৮৮]

এ ছাড়াও তিনি ওয়াহাবিদের বিপক্ষে রচনা করেছেন হিজাগাথা।

www.muslimdm.com

২৮৮. শাওয়াহিদুল হক : ৩৩

ছয়. ওয়াহাবিদের রদে ইরাকি আইম্মায়ে কিরাম

ওয়াহাবিবিরোধী ইরাকি কাফেলার বিশেষ বিশেষ আইম্মায়ে কিরাম হলেন,

১. শায়খ আবদুর রহমান আহদাল

ইরাকের প্রথম যুগের নজদিবিরোধী আলিমদের একজন হলেন শায়খ আবদুর রহমান আল-আহদাল রাহ.। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল, সাইয়িদ আবদুর রহমান ইবনু সুলায়মান আল-আহদাল। তিনি ইরাকের জুবাইদ অঞ্চলের মুফতি ছিলেন। ওয়াহাবিদের রদে তাঁর রয়েছে বিশেষ অবদান। 'মিসবাহুল আনাম ' বইয়ে তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বিভিন্ন হাদিসের আলোকে খারেজিদের বৈশিষ্ট্যসমূহের সবটাই ওয়াহহাবি নজদিদের মধ্যে বিদ্যমান তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।[২৮৯]

২. ইমাম আহমাদ ইবনু আলি

ইরাকের ওয়াহাবিবিরোধী কাফেলার আরও এক পথিকৃৎ হলেন, ইমাম আহমাদ ইবনু আলি আশ-শাফিয়ি রাহ.। 'মিসবাহুল আনাম' এ তাঁর ওয়াহাবি মতাদর্শ রদে একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. ইমাম আবদুল মুহসিন উশায়কিরি

ইরাকের বসরা নগরীর আইম্মায়ে হানাবালাদের অন্যতম ছিলেন শায়খ আবদুল মুহসিন আল-উশাইকিরি রাহ.। তিনি ছিলেন বসরার কাজি। ওয়াহাবিদের রদে তাঁর একটি বই রয়েছে 'আর-রাদ্দু আলাল ওয়াহহাবিয়া ' নামে।

৪. ইমাম আলি ইবনু আবদুহ বাগদাদি

ইরাকের উলামায়ে শাফিয়িদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। তিনি রাফিজি শিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। ইরাকের ঐতিহাসিক নজফ শহরে একটি সম্মেলনে প্রকাশ্যে তিনি শিয়াদের মসজিদুল কুফাতে মুসলিমদের জন্য নামাজ বাতিল বলে ঘোষণা করেন। শিয়া রাফিজি মতাদর্শের পাশাপাশি ওয়াহাবি মতাদর্শের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন কঠোর। ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে তিনি লেখেন المشكاة المضيئة في الرد علي الوهابية। এ রিসালাটি বার্লিন যাদুঘরে ২১৫৬ সংখ্যায় আজও সংরক্ষিত আছে।

৫. সাইয়িদ ইয়াসিন তবাতবায়ি

ইরাকের আলিমদের মধ্যে আরও একজন ইমাম হলেন, ইয়াসিন আত-তবাতবায়ি। তিনি ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে একটি কাসিদা রচনা করেছেন, যা 'সাআদাতুদ দারাইন ' বইয়ে উল্লেখিত হয়েছে।

৬. ইমাম দাউদ ইবনু সাইয়িদ সুলায়মান বাগদাদি (১২৯৯ হি.)

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইরাকের বাগদাদ নগরীর বিখ্যাত আইম্মায়ে কিরামদের একজন হলেন ইমাম দাউদ ইবনু আস-সাইয়িদ সুলায়মান আল-বাগদাদি আন-নাকশবন্দি আল-খালিদি রাহ.। ওয়াহাবিদের মতাদর্শ রদে তাঁর একটি বই রয়েছে যার নাম হলো المنحة الوحبية في رد الوهابية।

২৮৯. مصباح الانام و جلاء الظلام، ص ٩

সাত. ওয়াহাবিদের রদে তিউনিসিয়ার আইম্মায়ে কিরাম

ওয়াহাবি মতাদর্শের রদে তিউনিসিয়ার বিশেষ বিশেষ উলামায়ে কিরামরা হলেন,

১. ইতিহাসবিদ আহমাদ ইবনু আবিজ জিআফ (১২৯১ হি.)

ইতিহাসবিদ আহমাদ ইবনু জিআফ রাহ. ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর তিউনিসিয়ার এক মনীষী। তিনি একাধারে আলিম, রাজনীতিবিদ, কবি ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। তাঁর লিখিত বিখ্যাত ইতিহাসের বই হলো, اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس و عهد الامان। বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় তিনি ওয়াহাবিদের বর্বরতার ইতিহাস তুলে ধরেছেন, সেখানে তিনি ইবনু আবদুল ওয়াহহাব সম্পর্কে লিখেছেন,

> তাকে মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব বলা হতো, যিনি ইবনু তাইমিয়া হাম্বলির শিষ্যদের একজন। তিনি কবর জিয়ারত এমনকি আম্বিয়াদের কবর জিয়ারত নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তাওয়াসসুল করা নিষিদ্ধ করেছিলেন। যে ব্যক্তি তা করত তাঁকে কুফুরির দায়ে অভিযুক্ত করতেন এবং তাঁকে মুশরিক বলতেন এই ধারণা করে যে, কবর জিয়ারত ও তাওয়াসসুল ইবাদত যা আল্লাহ ছাড়া কারও করা যায় না।

২. শায়খ সালিহ কাওয়াশ (১২১৮ হি.)

ওয়াহাবি তাকফিরিদের বিরুদ্ধে তিউনিসিয়ার শায়খ সালিহ আল-কাওয়াশ রাহ. একটি বই রচনা করেছেন যার নাম 'আর-রাদ্দু আলাল ওয়াহহাবিয়া'।

৩. শায়খ ইসমাইল তামিমি (১২৪৮ হি.)

তিউনিসিয়াতে ওয়াহাবি মতাদর্শ বিরোধী পথিকৃৎদের একজন হলেন ইমাম ইসমাইল আত-তামিমি। পূর্বোল্লিখিত اتحاف اهل الزمان বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ওয়াহাবি মতাদর্শ রদে একটি বই লিখেছেন। এর নাম হলো, المنح الالهية في طمس الضلالة الوهابية।

৪. শায়খ আবুল ফজল কাসিম মালিকি (১১৯০ হি.)

তিউনিসিয়ার শায়খ আবুল কাসিম রাহ. ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির তিউনিসিয়াবাসীর উদ্দেশ্যে লেখা একটি রিসালার জবাবে একটি দীর্ঘ রিসালা রচনা করেন। যাতে তিনি নজদির উদ্দেশ্যে বলেন,

> আর যদি তোমরা শরয়িসিদ্ধ বিষয়কে নিষিদ্ধ বিষয়ে আপতিত হওয়ার ভয়ে সাদ্দান আনিজ জারায়ি নিষিদ্ধ করার ঠেকা নিয়ে থাকো, তাহলে তা ইসলামের সব ইবাদতের ক্ষেত্রে যেগুলোর বিষয়ে মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে থাকা (নিয়্যত) ছাড়া কোনো পার্থক্য নেই এটা করো। কারণ, (এটাও) সন্দেহ করা যেতে পারে যে, মসজিদের মুসল্লিরা (আল্লাহর ইবাদত নয় বরং) পাথর পূজার নিয়ত করে (নামাজ পড়ে), যেমনভাবে জবাইকারী ও জিয়ারতকারীর বিষয়ে সন্দেহ করা হয়, আর (এটাও) সন্দেহ করা যেতে পারে যে, রোজাদাররা (আল্লাহর সন্তুষ্টি নয় বরং) মেজাজ ঠিক করা অথবা চিকিৎসা ও প্রতিকারের নিয়ত করে (রোজা রাখে)...আর যদি তোমরা এটা করো তবে ইসলামের সকল স্তম্ভকে তোমরা ভেঙে ফেললে।[২৯০]

অতএব, হে মানুষ (ইবনু আবদুল ওয়াহহাব) দেখো, এটা কি ধরনের প্রলাপ? কিভাবে শয়তান তোমার সঙ্গে খেলল? কিসে তোমায় ধ্বংসের মধ্যে ফেলল? এ প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরে আসো। আর বলো, 'হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর জুলুম করেছি। আর যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের উপর রহম না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

২৯০. اتحاف اهل الزمان، ج ২ ، ص ৭৩

আট. ওয়াহাবিদের রদে লিবিয়া ও মাগরিবের উলামায়ে কিরাম

ওয়াহাবিদের রদে আফ্রিকার মুসলিম দেশ লিবিয়া ও মাগরিবের (মরক্কো) উল্লেখযোগ্য উলামায়ে কিরাম হলেন,

১. ইমাম ইবনু গলবুন লিবি (১১৫৩ হি)

ইমাম ইবনু গলবুন আল-লিবি ছিলেন, ইবনু আবদুল ওয়াহাব নজদির সমসাময়িক লিবিয়ার ইতিহাসবিদ ও আলিম। তিনি লিবিয়ার মিসরাতাতে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে তারাবলুসে (ত্রিপোলি) গমণ করেন। তাঁর বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, লিবিয়ার ইতিহাস ‘তারিখু লিবিয়া’। ওয়াহাবিদের রদে তিনি একটি কাব্য রচনা করেন। ‘সাআদাতুদ দারাইন ফির রাদ্দি আলাল ফিরকাতাইন’ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯৫ পৃষ্ঠায় কাব্যটির উল্লেখ রয়েছে।

২. ইমাম তাইয়িব ইবনু কিরান ফাসি (১২২৭ হি.)

মাগরিবি ওয়াহাবিবিরোধী কাফেলার নেতৃস্থানীয় আইম্মায়ে কিরামদের একজন হলেন ইমাম আত-তাইয়িব ইবনু কিরান আল-ফাসি। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আত-তাইয়িব ইবনু আবদুল মাজিদ ইবনু আবদুস সালাম ইবনু কিরান আল-ফাসি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাগরিবি দিকপাল ইমামদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তিনি জামিয়া আল-কারাবিইয়িন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর হাতে গড়ে ওঠেন ইমাম আহমাদ ইবনু ইদরিস আল-ফাসি, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলি আস-সানুসির মতো যুগশ্রেষ্ঠ রত্নরা। ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে ইমাম তাইয়িব ছিলেন কঠোর। তিনি ওয়াহাবিদের রদে লেখেন ‘আর-রাদ্দু আলা মাজহাবিল ওয়াহাবিইয়িন’।

৩. শায়খ মাখদুম আল মাহদি (১৩৪২ হি.)

শায়খ আল-মাখদুম রাহ. ছিলেন মরক্কোর বিখ্যাত ফকিহ। তিনি মাগরিবের ফাস নগরীর মুফতি ছিলেন। ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে তাঁর একটি রিসালা রয়েছে ‘আর-রাদ্দু আলাল ওয়াহাবিয়া’ নামে।

৪. শায়খ আহমাদ ইবনু আবদুস সালাম বান্নানি (১১৬৩ হি.)

মরক্কোর আলিমদের মধ্যে আরও একজন হলেন, শায়খ আহমাদ ইবনু আবদুস সালাম আল-বান্নানি রাহ.। ওয়াহাবিদের রদে তিনি একটি রিসালা লিখেছেন যার শিরোনাম হলো الفوضيات الوهبية في الرد علي الوهابية।

৫. মুহাদ্দিস ফাল্লানি (১২১৮ হি.)

মাগরিবের অপর এক আলিম ছিলেন শায়খ সালিহ আল-ফাল্লানি। তিনি ছিলেন সে যুগের মরক্কোর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসিনদের একজন। ওয়াহাবিদের রদে তিনি একাধিক রিসালা রচনা করেন। ‘মিসবাহুল আনাম’ এ তাঁর কথা এসেছে।

নয়. ওয়াহাবিদের রদে উপমহাদেশীয় উলামায়ে কিরাম

ওয়াহাবিদের রদে উপমহাদেশীয় আলিমদের একটি বড় অংশ অবদান রেখেছেন। তাদের উল্লেখযোগ্যরা হলেন,

১. ইমাম শাহ আবদুল আজিজ দেহলবি (১২৩৯ হি.)

ভারতীয় আলিমদের মধ্যে প্রথম যার নাম নিতে হয় তিনি হলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় প্রবাদপ্রতিম ইমাম ও মুজাদ্দিদ শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি নাকশবন্দি রাহ.। ১৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামি ভারতের দিল্লির শাহজাহানাবাদে ঐতিহ্যবাহী দীনি পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন অলিকুল শিরোমণি ইমাম শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবি রাহ.। শায়খ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবি রাহ. একাধারে মুহাদ্দিস, ফকিহ ও

www.muslimdm.com

মুজাদ্দিদ ছিলেন। ওয়াহাবিদের মতাদর্শ রদ করে তিনি একটি রিসালা লিখেছেন। বিখ্যাত ভারতীয় আলিম আহমাদ সায়িদ আল-মুজাদ্দিদি রাহ. প্রণীত 'ইসবাতুল মাউলিদ ওয়াল কিয়াম' বইয়ের سعیهادی حضرات نقشبندیه در رد وهابیه শীর্ষক অধ্যয়ে রিসালাটির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবি রাহ. খোদ ওয়াহাবিবাদ রদে একটি রিসালাহ রচনা করেছেন।
> শায়খ হাজি খাজা দুস্ত মুহাম্মাদ কান্দাহারি রাহ. তাঁর 'মাকতুবাত' এর ৯৯ পৃষ্ঠার ২৬ নম্বর মাকতুবে রিসালাটির কথা উল্লেখ করেছেন।

২. ইমাম গুলাম আলি দেহলবি (১২৪০ হি.)

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় অপর এক সুবিখ্যাত আলিমে দীন ছিলেন শায়খ ইমাম গুলাম আলি দেহলবি রাহ.। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাবের পাটিয়ালা নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় বিখ্যাত হানাফি মারজা আলিম শায়খুল মাশায়েখ ইমামুল ফুজালা শায়খ গুলাম মুহিউদ্দিন কসুরি রাহ. এবং সুলতানুল হিন্দ মাওলানা আওরঙ্গজেব আলমগিরের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ও প্রখ্যাত ভারতীয় আলিম, মুফাসসির ও মুহাদ্দিস ইমাম মিরজা মাজহার জানে জানা রাহ.-এর মুরিদ। ইমাম গুলাম আলি রাহ. ও তাঁর পীর ইমাম কসুরি রাহ. ছিলেন ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে কঠোর। ইমাম কসুরি রাহ. ওয়াহাবিদের পথভ্রষ্ট জামাত হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

> اخیر عمر خود ایشان در مذمت فرقهٔ ضالهٔ نجدیه وهابیه از حد زیاده میکردند دوستان و آشنایان خود را از کید و مکر آن مردودان خبردار میفرمودند[২৯১]

৩. ইমাম শাহ আহমাদ সায়িদ (১২৭৭ হি.)

ইমাম ও মুজাহিদ শাহ আহমাদ সায়িদ মুজাদ্দিদি দেহলবি রাহ. ভারতের উত্তরপ্রদেশের রামপুরের মুসতাফা আবাদে ১২১৮ হিজরি—১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নুজহাতুল খাওয়াতিরের সপ্তম খণ্ডের ৪০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে, তিনি আবদুল কাদির ইবনু শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রাহ.-এর কাছে দীক্ষালাভ করেন এবং শাহ আবদুল আজিজ দেহলবির কাছ থেকে ইজাজতপ্রাপ্ত হন। তিনি গুলাম আলি দেহলবির হাতে তাসাউফের বায়আত গ্রহন করেন। ইমাম সাইয়িদ আহমাদ ইবনু ইরফান বেরলবি রাহ.-এর হাতে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন। ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন কঠোর। তিনি বলেন, 'তাদের (ওয়াহাবিদের) সংসর্গের নূন্যতম ক্ষতি হলো ইশকে রাসুল, যা শ্রেষ্ঠতম ইমানের আরকানসমূহের একটি, তা ক্রমে ক্রমে কমতে থাকে। এভাবে একসময় রসম ছাড়া তার আর কিছুই বাকি থাকে না।'[২৯২]

৪. ইমাম ফজলে রাসুল বাদায়ুনি (১২৮৯ হি.)

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় উলামায়ে আহনাফদের মধ্যে বিখ্যাত একজন ছিলেন ইমামু আহলুস সুন্নাত জামিউশ শরিয়ত ওয়াত তরিকত ফজলে রাসুল বাদায়ুনি রাহ.। ১২১৩ হিজরি—১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের বাদায়ুনে তাঁর জন্ম। মুঘল জামানায় তিনি সদর ও মুফতিয়ে আজম ছিলেন। ওয়াহাবিদের রদে তাঁর বিখ্যাত বইসমূহের উল্লেখযোগ্য হলো, 'সাইফুল জাব্বার, আল-বাওয়ারিকুল মুহাম্মাদিয়া লিরাজমিশ শায়াতিনিন নাজদিয়া ও ওয়াহাবি তাহরিক'।

৫. হুসাইন আহমাদ মাদানি (১৩৭৭ হি.)

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ আকাবিরে দেওবন্দের শিরোতাজ মুহাদ্দিস হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহ. ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উত্তরপ্রদেশের উন্নাউ জেলার বাঙ্গারমাউতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহ.-এর পর ভারতীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হানাফি মাদরাসা দারুল উলুম দেওবন্দের কুলপতির দায়িত্ব পালন করেন। গভীর শিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি হিজাজে গমন করেন, সেখানে বেশ কিছুকাল অবস্থানের পর ১৩১৮ হিজরিতে তিনি ভারতে ফেরেন। তিনি মদিনায় থাকাকালীন সেখানে ওয়াহাবি তাণ্ডব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর তিনি ওয়াহাবিদের শক্ত সমালোচনা করেন এবং তাদের মতাদর্শ খণ্ডন করেন। তিনি ওয়াহাবিদের খারিজি হিসেবে অভিহিত করেছেন। ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

---

২৯১. امام الدین: مقامات طیبین قلمی ص ۱۴، برائی تفصیلیش رجوع کنید به مقدمه ملفوظات شریفه صفحه ۶۹

২৯২. আল-মানাকিবুল আহমাদিয়া ওয়াল মাকামাতুস সায়িদিয়া : ১৭৪; ইসবাতুল মাওলিদ ওয়াল কিয়াম : ২৪৭

মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাবের আকিদা এটা ছিল যে, সারা বিশ্ব হলো, মুশরিক দেশ ও সকল মুসলিম হলো, কাফির আর তাদের হত্যা ও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং তাদের সম্পদকে তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হালাল ও জায়িজ বরং ওয়াজিব।[২৯৩]

একটি সন্দেহ নিরসন

পরবর্তীতে অপর এক ভারতীয় দেওবন্দি আলিম মানজুর নুমানি রাহ. 'শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব আওর হিন্দুস্তান কে উলামায়ে হক' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন ইবনু আবদুল ওয়াহাবের রদে। যথাযথ গবেষণা না করে একপাক্ষিক লেখার কারণে বইটিতে প্রচুর ভুল ও বানোয়াট তথ্যের সমাহার ঘটেছে। মানজুর নুমানি তাঁর বইয়ের ৪৮ পৃষ্ঠায় দাবি করেছেন, ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে 'একটি আখবারি বয়ানে মাদানি রাহ. মুখালিফিনদের বই পড়ে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন' এটা স্বীকার করে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের ব্যাপারে তাঁর 'আশ-শিহাবুস সাকিব' এর মত থেকে রুজু করেছিলেন। তাঁর এ দাবির ফলে মানুষের মধ্যে একটি ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে যে, মাদানি রাহ. পরবর্তীতে রুজু করেছিলেন। কিন্তু এ দাবিটির সত্যতা কতটুকু? মাদানির রাসায়িল থেকে জানা যায় দাবিটি সত্য নয়।

চলুন আমরা দেখি প্রকৃত বাস্তবতা। শায়খুল ইসলাম মাদানি রাহ.-এর 'মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম' এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৯ নম্বর মাকতুবটা নুমানি রাহ.-এর দাবিটি ভুল প্রমাণিত করেছে। এ মাকতুবটি তিনি ১৩৭০ হিজরি—১৯৫০/৫১ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছিলেন। অর্থাৎ, তাঁর এ জগৎ ছাড়ার মাত্র ২-৩ বছর আগে। উক্ত মাকতুবে তাঁর ওয়াহহাবিয়াত নিয়ে রুজু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি স্পষ্ট ভাষায় লেখেন,

(ওহাবিদের বিষয়ে) এখনো আমার ওই মাসলাক যেটা ওই বইয়ে (আশ-শিহাবুস সাকিবে) বলা হয়েছে।[২৯৪]

এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, মাদানি রাহ. ওয়াহাবিদের বিষয়ে রুজু করেননি; বরং মানজুর নুমানি সাহেবের উদ্ধৃত ১৯২৫ সনের চিঠি ও তাঁর দাবি ভিত্তিহীন। তা ছাড়া তাঁর ছাত্র ও শাগরিদরাও এ দাবিটি ভিত্তিহীন বলেছেন। মাদানি সাহেবের কাছের শাগরিদদের একজন হলেন, জাহিদ হুসাইনি। তিনি তাঁর 'চেরাগে মুহাম্মাদ' গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় মাদানি সাহেবের রুজুর বিষয়টি বিদআতিদের তৈরি বানোয়াট কিচ্ছা প্রমাণ করেছেন। 'মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম' এর তৃতীয় খণ্ডে শায়খ হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহ.-এর আরও একটি চিঠি সংকলিত হয়েছে যেটি ১৩৭১ হিজরি—১৯৫১/৫২ সনে লেখা। উক্ত পত্রেও তিনি ইবনু আবদুল ওয়াহহাবকে খারিজি হিসেবে উল্লেখ করে লিখেছেন,

> এই ধরনের শিক্ষার ফল কি এমনটা ছিল না যে, নাহরাওয়ান ইত্যাদি জায়গায় খারিজি কর্তৃক মুসলিম, আলি ও মুয়াবিয়া রা.-এর অনুগামী ও সহচরবৃন্দের রক্ত প্রবাহিত করার রূপে প্রকাশ পেয়েছিল এবং যেটা মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির অনুসারিরা হিজাজ, মক্কা ও মদিনায় ১২২০ হিজরি থেকে ১২৩৩ হিজরি পর্যন্ত মুসলিমদের রক্তের সমুদ্র বইয়ে দেওয়ার রূপে জন্ম দিয়েছিল?[২৯৫]

এরপর তিনি ইমাম শামি রাহ.-এর কথাটি উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে তিনি ওয়াহাবিদের খারিজি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এসব চিঠি ও দলিল—প্রমাণ করে মাদানি রাহ. তাঁর জীবনের অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত ওয়াহহাবিদের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান থেকে রুজু করেননি।

৬. খলিল আহমাদ সাহারানপুরি (১৩৪৬ হি.)

খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রাহ. ছিলেন আকাবিরে দেওবন্দের অপর এক বিশিষ্ট আলিম। তাঁর পুরো নাম হলো আবু ইবরাহিম খলিল আহমাদ ইবনু মাজিদ মুহাজির মাদানি চিশতি রাহ.। তিনি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কি রাহ.-এর মুরিদানদের একজন। হাদিসশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ভারতের সাহারানপুরে অবস্থিত মাজাহিরুল উলুমে তিনি শিক্ষকতা করেছেন। একসময় দেওবন্দ আন্দোলন বিশেষ কিছু বিষয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হলে, আরব থেকে উলামায়ে কিরামরা দেওবন্দের কাছে আকিদাসংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর চেয়ে পাঠান। উক্ত প্রশ্নসমূহের জবাবে শায়খ সাহারানপুরি একটি পুস্তিকা রচনা করেন 'আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ' নামে, যাতে তদানীন্তন প্রায় সব আকাবিরে দেওবন্দ দস্তখত প্রদানপূর্বক বইটির সত্যায়ন করেন। এই বইটি দেওবন্দের আকিদার বই হিসেবে স্বীকৃত। বইটিতে দস্তখত দিয়েছেন বড় বড় দেওবন্দি

---

২৯৩. আশ-শিহাবুস সাকিব : ২২২

২৯৪. مكتوبات شيخ الاسلام ج ٢ ص ٣٤٤

২৯৫. مكتوبات شيخ الاسلام ج ٣ ص ٧٩

আকাবিররা। বইটিতে ১২ নম্বর প্রশ্নটি ছিল, ইবনু আবদুল ওয়াহাব ও ওয়াহাবি মতাদর্শ সংক্রান্ত। উক্ত প্রশ্নের জবাবে শায়খ সাহারানপুরি ইমাম শামি রাহ.-এর ফাতওয়া উল্লেখপূর্বক নজদিকে খারিজি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 'আল-মুহান্নাদ' এ তিনি লেখেন,

> আমাদের কাছে উনার বিষয়ে হুকুম হলো, যেটা দুররে মুখতার প্রণেতা বর্ণনা করেছেন।[২৯৬]

ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির ব্যাপারে মুহান্নাদে দেওয়া মতটিই প্রথম সারির আকাবিরে দেওবন্দের মত। কারণ, প্রথমসারির দেওবন্দের আকাবিররা প্রায় সবাই বইটির সত্যায়ন করেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন, আশরাফ আলি থানবি, মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ, শায়খ আমরুহিসহ তদানীন্তন আকাবিরে দেওবন্দ এবং তারা এ বইটির তাসদিক করেছেন।

মাওলানা মানজুর নুমানি তাঁর বইয়ে শায়খ সাহারানপুরি রাহ. ওয়াহাবি মতাদর্শ সংক্রান্ত অবস্থান থেকে রুজু করার দাবি করেছেন। এ দাবি প্রমাণে তিনি দুইটি পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। পত্র দুটির অস্তিত্ব যদিও স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবু উক্ত চিঠির কোনো অংশ থেকে এ কথা কোনোভাবেই প্রমাণিত হয় না যে, ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির ব্যাপারে সাহারানপুরি রাহ. তাঁর অবস্থান থেকে রুজু করেছিলেন।[297]

৭. আশরাফ আলি থানবি (১৩৬২ হি.)

দেওবন্দি আকাবিরদের অন্যতম প্রবাদপ্রতিম ও সর্বজনবিদিত আলিম হলেন শায়খ আশরাফ আলি থানবি চিশতি রাহ.। ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগরের থানা ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। শরিয়ত ও তরিকতের একজন কামিল আলিম ছিলেন তাই তাঁকে হাকিমুল উম্মত বলা হতো। শায়খ থানবি নাসায়ির শারাহর হাশিয়ায় ওয়াহাবিদের চরিত্র তুলে ধরেছেন এবং তাদেরকে বাতিল আকিদাধারী হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁর ভাষায়,

> যে ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের ধর্মকে কবুল করে আর উসুল ও ফুরুয়ে তাঁর পথে চলে তাদেরকে আমাদের শহরে ওয়াহহাবি ও গায়র মুকাল্লিদিন বলা হয়ে থাকে। ওয়াহহাবিরা মনে করে যে, আইম্মায়ে আরবায়া রা.-এর মধ্যে কাউকে তাকলিদ করা শিরক আর যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা মুশরিক। ওয়াহহাবিরা আমাদের আহলুস সুন্নাতকে হত্যা আর আমাদের মহিলাদের বন্দী করাকে হালাল মনে করে। তাদের কিছু বাতিল আকিদা যেগুলো নির্ভরযোগ্য উলামা মারফত আমাদের কাছে পৌঁছেছে, কেউ কেউ তাকে (নজদিকে) খারিজিও বলেছেন।[২৯৮]

এ ছাড়াও সাহারানপুরির 'আল-মুহান্নাদ' বইয়ে সত্যায়নকারীদের তিনি একজন ছিলেন। যাতে ওয়াহাবিদের সুস্পষ্টরূপে খারিজি বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৮. আনওয়ার শাহ কাশমিরি (১৩৫২ হি.)

আকাবিরে দেওবন্দের একজন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইমাম সাইয়িদ আনওয়ার শাহ কাশমিরি রাহ.। ১২৯২ হিজরিতে তিনি কাশমিরে জন্মগ্রহণ করেন। শরিয়ত ও তরিকতে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকার কারণে একদা তাঁকে দারুল উলুম দেওবন্দের আচার্য হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। উলামায়ে দেওবন্দের যারা নজদির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন তিনি তাদের একজন। তাঁর লেখা 'ফায়জুল বারি' তে ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদিকে নির্বোধ ও স্বল্পজ্ঞানী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> আর মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের বিষয়টি হলো, সে ছিল নির্বোধ ও স্বল্পজ্ঞানের অধিকারী। সে কুফুরি হুকুম লাগাতে তাড়াহুড়া করত।[২৯৯]

---

২৯৬. المهند على المفند، ص ٣٨

২৯৭. জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকার সম্মানিত উস্তাযুল হাদীস মুফতী মামুন আব্দুল্লাহ কাসেমী হা. ইবনু আব্দিল ওয়াহাব ও ওয়াহাবী আন্দোলন সম্পর্কে ওলামায়ে দেওবন্দের অবস্থান ও হযরত মাওলানা মানযুর নোমানীর বক্তব্য সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যবহুল ও শক্তিশালী আলোচনা করেছেন। মুহতারামের আলোচনাটি বইয়ের ২ নং পরিশিষ্টে যোগ করা হয়েছে। সম্মানিত পাঠককে উক্ত লেখাটি পড়ার বিশেষ অনুরুধ রইল।

২৯৮. সুনানু নাসায়ির হাশিয়া, কিতাবুজ জাকাত, বাবু মুয়াল্লাফাত কুলুবুহুম।

২৯৯. فيض الباري، ج ١، ص ٢٥٢

৯. আহমাদ রেজা খান বেরলবি (১৩৪০ হি.)

ভারতীয় ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী প্রসিদ্ধ আলিমদের অন্যতম একজন হলেন আলা হজরত আহমাদ রেজা খান বেরলবি রাহ.। তিনি ১২৭২ হিজরির ১০ শাওয়াল উত্তরপ্রদেশের বারেলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ইসলামি শরিয়তের বিদগ্ধ পণ্ডিত, দার্শনিক, কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর অনুসারীরা উপমহাদেশে বেরলবি নামে পরিচিত। ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে লেখা তাঁর একটি দীর্ঘ রিসালা রয়েছে যার নাম, النير الشهابي علي تدليس الوهابي। রিসালাটি 'ফাতওয়ায়ে রাজবিয়া' এ সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম শায়খ সদরুল আফাজিলও নজদিদের রদে বই রচনা করেছেন যার নাম 'ফিতনাতুল ওয়াহহাবিয়া।' বইটিতে তিনি নজদে ওয়াহাবিদের ফিতনা নিয়ে সবিষদ আলোচনা করেছেন।

১০. আবদুল হক আকরবি (১৪০৯ হি.)

দেওবন্দ আকাবিরদের উল্লেখযোগ্য হলেন শায়খ আবদুল হক আকরবি রাহ.। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের সুবিখ্যাত দারুল উলুম হাক্কানিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম আচার্য। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'ফাতওয়ায়ে হাক্কানিয়া' এর প্রথম খণ্ডের ৩৪০ পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনু আবিদিন রাহ. ও কাশমিরি রাহ.-এর ফাতওয়া নকল করে ইবনু আবদুল ওয়াহাবকে তাকফিরি খারিজি প্রমাণিত করে বলেন, 'জনসাধারণের তাঁর আকিদা ও মতাদর্শ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি।'

১১. শায়খুল আরব ওয়াল আজম দাজবি (১৪৪০ হি.)

ভারত উপমহাদেশ যত মহান ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে তাদের একজন হলেন, শায়খুল আরব ওয়াল আজম মাওলানা হামদুল্লাহ জান দাজবি রাহ.। তাঁর পূর্ণ নাম হলো, হামদুল্লাহ জান ইবনু আবদুল হাকিম আদ-দাজবি। তিনি একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন। তাঁর মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান থেকে প্রকাশিত নুন পত্রিকায় বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন এ যুগের ইবনু খালদুন ও গাজালি। তিনি ১৩৩৪ হিজরি—১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে মারদান প্রদেশের দাজিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা আবদুল হাকিম রাহ. শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রাহ.-এর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুরে গমন করেন এবং সেখানে তাফসিরে জালালাইন, বায়জাবি, মিশকাত ও হিদায়ার পাঠ গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন। তিনি জাকারিয়া কান্ধলবি চিশতি রাহ.-এর কাছ থেকে হাদিস পাঠের সৌভাগ্য হাসিল করেন। এ ছাড়াও মাহমুদ হাসান দেওবন্দি ও মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহ.-এর সুহবত হাসিল করেন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হজ পালনের সময় শায়খ মাওলানা মাহমুদ নাজির আত-তিরাজি আত-তুর্কিস্তানি রাহ.-এর কাছ থেকে ইজাজতপ্রাপ্ত হন। প্রায় ৪২ বছর ইলম ও তাসাউফের পথে সফর করার পর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন। তাঁর প্রণীত একটি উল্লেখযোগ্য বই হলো, البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر। বইটি পাকিস্তানের পেশোয়ারের মাজহারি কুতুবখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বইয়ে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব সম্পর্কে বলেন,

> তাই আমরা বলি, তুমি ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের অবস্থা সম্পর্কে জানলে যে, সে খারিজিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সে নজদ থেকে বের হয়েছিল।[৩০০]

১২. শায়খ রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (১৩২৩ হি.)

আকাবিরে দেওবন্দের অপর একজন প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন শায়খ রশিদ আহমাদ রাহ.। তিনি তাঁর 'ফাতওয়ায়ে রশিদিয়া' এ ইবনু আবদুল ওয়াহাব ও ওয়াহাবিদের ক্ষেত্রে কিছুটা নম্রতাভাব পোষণ করেছেন। এর কারণ হিসেবে শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহ. তাঁর 'মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম' এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৯ নম্বর মাকতুবে বলেন, 'মাওলানা গাঙ্গুহি অনেক পরের লোকদের থেকে ভারতে বসবাসকারীদের একজন। তাঁর এ জামাআতের (ওয়াহাবিদের) অবস্থা সম্পর্কে অতটা অবগতি ছিল না।'

তবে গাঙ্গুহি রাহ. ইবনু আবদুল ওয়াহাবকে সমর্থন করেননি। কিছু মানুষ তাঁর 'ফাতওয়ায়ে রশিদিয়া' থেকে কিছু বাক্যাংশ উদ্ধৃত করে নজদির

---

৩০০. البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر للشيخ الداجوي، ص ٢٣١

সমর্থনে লাগানোর চেষ্টা করেন, তাঁরা মূলত একপ্রকার শঠতার আশ্রয় নেন। কারণ, গাঙ্গুহি রাহ. তাঁর 'আল-কাউকাবুদ দুররি' এর মধ্যে নজদির বিরোধিতা করেছেন। আল-কাউকাবুদ দুররি গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডের ২৭৬ পৃষ্ঠায় তিনি ওয়াহাবিদের দ্বারা ফিতনা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে 'নিশ্চয় ফিতনাটি (ওয়াহাবি ফিতনা) ঘটেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই...'। তাঁর ভাষায়,

> কেউ কেউ বলেন, এটা ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির দিকে ইঙ্গিত করে। তারা ভুল করেননি। কারণ, ফিতনাটা হয়েছে যাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও তিনি যা বলতেন তার অধিকাংশই সুন্নাহ মোতাবিক ছিল, কিন্তু তিনি তাতে বাড়াবাড়ি করেছেন যা অভিষ্ট উদ্দেশ্যের সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল, আর সেটি ছিল নিন্দনীয় ও ফিতনা। (যেমন) তিনি মানুষ নামাজের জামাআতে উপস্থিত না হলে হত্যা করতেন, ইত্যাদি।[৩০১]

১৩. ইমাম আবু জাফর সিদ্দিকি কুরাইশি (১৪২৩ হি.)

উভয় বাংলায় ইসলামি বিপ্লব ঘটানোর ক্ষেত্রে যেসব আহলুস সুন্নাত অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ফুরফুরা শরিফ। দাদাহুজুর পির আবু বকর সিদ্দিকি আল-কুরাইশি রাহ.-এর হাত ধরে এ জামাআতের পথচলা শুরু। তাঁর ছেলে মুফতিয়ে আজম ইমাম আবু জাফর সিদ্দিকি আল-কুরাইশি রাহ. ছিলেন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন। ১৯০২ অথবা ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের শুক্রবার ইমাম আবু বকর রাহ.-এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

শায়খ উজাইর সিদ্দিকি অনুবাদকৃত 'তাবাকাতুল ইজাম ' বইয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, মাত্র দেড় মাস বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। শৈশব থেকে তিনি ছিলেন প্রবল ধীশক্তির অধিকারী। পিতার কাছে তিনি শরিয়ত ও তরিকতের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। অচিরেই তিনি একজন বিদগ্ধ আলিম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর পিতা ফুরফুরার পির আবু বকর সিদ্দিকির নির্দেশে 'আল-মাউজুআত' নামে জাল হাদিস সংবলিত উর্দুভাষায় একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে মাসিক নিদায়ে ইসলামের মাধ্যমে তিনি বইটির বঙ্গানুবাদ শুরু করেন। ইমাম আবু জাফর সিদ্দিকি রাহ.-এর আগে কোনো ভারতীয় আলিম, ভারতীয় কোনো ভাষায় এ বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছেন বলে জানা যায় না। বিশেষত কোনো বাঙালি আলিম রচিত জাল হাদিস বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ এটি। ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে শায়খে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। তাঁর বইয়ে ওয়াহাবিদের বিষয়ে বিষদ আলোচনা করেছেন এবং তাদের আকিদাগত বিচ্যুতি তুলে ধরে তিনি বলেন,

> আমাদের দেশে ওয়াহাবি নামে একটি জামায়াত বাহির হইয়াছে। তাহাদের জঘন্য মতামত ও আকায়েদ সম্পর্কে প্রবীণ আলিম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশেষভাবে অবগত আছেন। কিন্তু আজকালের অনেকেই উহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। উহারা ধর্মের দোহাই দিয়া সাধারণ মুসলমানের অন্তরে এমন বিষ প্রবেশ করাইয়া থাকে, যাহা দ্বারা দেশে দলাদলি, বিবাদ, বিসম্বাদ ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া সুস্থ সমাজকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। তাই বলি, সুযোগ সন্ধানী ওয়াহাবিরা দল পাকাইবার তালে ঘুরিতেছে। অতএব সাবধান! দেশ ভাগাভাগির পর হইতে এই বাংলায় কত দল আর কত জামায়াত গজাইয়া উঠিল, আরও যে কত গজাইবে তার ইয়ত্তা নাই। এই ভেজালের যুগে মুসলিমদের ভাল-মন্দ ঠিক করিতে না পারিয়া গোলকধাঁধায় পড়া অপেক্ষা ওই সমস্ত নতুন দল বা জামায়াত হইতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। জামায়াতের নাম শুনিলেই যে উহাতে ঢুকিয়া পড়িতে হইবে ইহারই বা অর্থ কি? আমরা হানাফি, আমাদের জন্য পুরাতন হানাফি জামায়াতই যথেষ্ট।[৩০২]

তিনি আরও বলেন,

> হযরতের শাফায়াত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার কথা প্রয়োগ করে। হযরত নবি সাঃ-এর প্রতি বেয়াদবী বাক্য প্রয়োগ করে। হযরত নবি সাঃ-এর অসীলা দেওয়াকে নাজায়িয বলে। উহারা মুরাকাবা, জিকির, ফিকির, পীরি-মুরীদি, পীরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন এগুলিকে বাজে বস্তু এবং বিদয়াত কার্য বলিয়া ধারণা করে। উহারা প্রকাশ্যে হাম্বলির দাবি করিলেও উহাদের কার্যকলাপ সমস্ত মাসআলায় ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রাহ.-এর মতানুযায়ী নহে। নিজের জ্ঞান অনুযায়ী যে মাসয়ালাকে হাদিসের বিপরীত মনে করে, তখন ফিকাহের মাসআলাকে ত্যাগ করিয়া দেয়। উহারা ইয়া রাসুলাল্লাহ বলাকে সরাসরি নিষেধ করে। আরবের ওয়াহাবিদিগের কাছে বারংবার শুনিতে

---

৩০১. الكوكب الدري، ج ٨، ص ٢٧٦-٢٧٧

৩০২. ওহাবীদের পরিচয় : ১

পাওয়া গিয়াছে যে, তাহারা আস্সালাতু আস্সালামু আলায়কা ইয়া রাসুলুল্লাহ বলাকে কঠোর ভাবে নিষেধ করে। এইরূপ বাক্য লইয়া আরববাসীর প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। উহারা বেশী দরুদ সালাম পড়াকে খুবই খারাপ মনে করে। ওয়াহাবিরা, হযরতের পয়দায়েশের প্রকৃত বর্ণনাকে খুবই মন্দ বিদয়াত বলে। এইরূপ ওলীদের বয়ান বর্ণনাকেও মন্দ মনে করে। সাইফুল জাব্বার পুস্তকে লিখিত আছে, সে মক্কা মদিনা শরিফের নিরীহ ব্যক্তিদিগকে ব্যাপকভাবে খুন করে। সৈয়দ বংশীয় সকলকে হত্যা করতঃ তাঁদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। মদিনার মসজিদের মখমলের বিছানা-পত্রাদি, দামী ঝাড় ও ফানুসগুলি নজদে লইয়া যায়। সমস্ত সাহাবা ও আহলে-বায়েতের মাযার ও গম্বুজগুলি ভাঙ্গিয়া সমতল করিয়া দেয়। যখন ইহাদের মধ্যে কেহ হযরত নবি সাঃ-এর মাযার ভাঙ্গিতে উদ্যত হয়, তখন খোদার তরফ হইতে উহাকে একটি বিষধর সর্প দংশন করিলে সে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দলের নেতাদের নাম অনুযায়ী ইহারা ওয়াহাবি বলিয়া পরিচিত।[৩০৩]

১৪. নবাব সিদ্দিক হাসান খান (১৩০৭ হি.)

আহলুল হাদিস সম্প্রদায় যারা বর্তমানে নিজেদের সালাফি ও ওয়াহাবি বলে গর্ববোধ করেন, তাঁদের ইমাম ও ভারতের প্রসিদ্ধ আহলে হাদিস আলিম নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী রাহ. ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তিনি তাঁর লেখা 'তারজুমানে ওয়াহাবিয়া' বইয়ে আরবের বুকে নজদিদের ফিতনার আলোচনা করেছেন। ওয়াহাবিদের উত্থানকে ফিতনায়ে আহলে নজদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। উক্ত বইয়ের ৬৯ পৃষ্ঠায় ওয়াহাবিদের ফিতনা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন,

ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে কোনো মুসলিম ওয়াহাবি মাজহাবের অনুসারী নয়। এর কারণ হলো, যে কাজকারবার তারা (ওয়াহাবিরা) আরবদেশে আমভাবে এবং মক্কা ও মদিনা খাস করে ঘটিয়েছে আর তাদের হাতে হিজাজ ও হারামাইন শরিফাইনবাসীকে যে কষ্ট হয়েছে তা ভারতের কারও সঙ্গে আহলে মক্কা ও মদিনা করেনি। এরকম ধৃষ্টতা কোনো ব্যক্তি থেকে হতে পারে না আর এটাও জানা গেছে যে, এ ওয়াহাবি ফিতনা ১৮১৮ সালে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৩০৪]

ভূপালী ছাড়াও আহলে হাদিসদের শায়খুল ইসলাম সানাউল্লাহ অমরিতসরিও ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে ছিলেন।

১৫. শায়খ আবদুল হাকিম হক্কানি হাফি.

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম শরিয়া শাসিত রাষ্ট্র হলো ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান। দেশটির প্রবাদপ্রতিম আলিমে দীন ও বর্তমান প্রধান বিচারপতি হলেন শায়খ আবদুল হাকিম ইবনু খুদায়দার আল-হক্কানি আল-আফগানি আল-কান্দাহারি হাফিজাহুল্লাহ। তিনি একাধারে ফকিহ, মুহাদ্দিস ও মুফাক্কিরুল ইসলাম। ইসলামি শরিয়া ও শাসনব্যবস্থার উপর তাঁর রচিত একাধিক কিতাবাদি রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম একটি বই হলো, 'তাতিম্মাতুন নিজাম'। উক্ত বইয়ের ২৬৬ থেকে ২৬৮ পৃষ্ঠায় তিনি ওয়াহাবি আন্দোলনকে ফিতনা হিসেবে উল্লেখ করেন, পাশাপাশি উসমানিদের তাকফিরি ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিবরণী ও মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহাবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও দালালাত নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১৬. শায়খ নুর আহমাদ ওয়ালি জার হাফি.

ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের মুআসিরিন তথা বর্তমান বিদগ্ধ আলিম-উলামাদের একজন হলেন শায়খ নুর আহমাদ ওয়ালি জার হাফি.। তিনি বর্তমানে ইসলামি ইমারতের আমিরুল মুমিনিন শায়খুল হাদিস হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা হাফি.-এর নির্দেশে ঐতিহাসিক হিরাত প্রদেশের ওয়ালি বা গভর্নর পদে রয়েছেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাতুরিদি আকিদার উপর তাঁর লেখা একটি বই রয়েছে معتمد ماترید من معتقد ما ترید নামে। উক্ত বইয়ে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ওয়াহাবি মতাদর্শ রদ করেছেন। ২০৬ পৃষ্ঠায় ওয়াহাবিদের ইতিহাস বলতে গিয়ে তাদের তাকফিরি হিসেবে অভিহিত করে বলেন, 'এমনকি মহান উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহাবের নেতৃত্বে তাদের থেকে একটি তাকফিরি

৩০৩. ওহাবীদের পরিচয় : ৩

৩০৪. ترجمان وہابیہ صفحہ ۵۹

জামাআত বের হলো। তারা হারাম শরিফ ও অন্যান্য জায়গার মুসলিমদের হত্যা করল। ওই বিপ্লবটি (ওয়াহাবি) ইসলামি খিলাফত (উসমানি খিলাফত) ধ্বংসের একটি বৃহত্তম কারণ ছিল।'

১৭. দাদাহুজুর আবু বকর সিদ্দিকি কুরাইশি (১৩৫৮ হি.)

খিলাফতের আরক্ত বিবস্বান যখন পশ্চিমের রক্তিম দিগন্তে অস্ত যেতে চলছিল, এ অবনি যখন উম্মাহর গৌরবোজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো খসে পড়ার বিষাদ সংবাদে বিধুর হয়ে উঠছিল, তখন বাঙ্গালার তিমিরাচ্ছন্ন অন্তরীক্ষে এক স্নিগ্ধ নক্ষত্রনাথের শুভোদয় ঘটে, যিনি তাঁর আপন চন্দ্রতপসুধা দ্বারা বঙ্গ মুসলিমসমাজকে পুণরায় দীপ্যমান করে তুলেছিলেন, মুর্মূর্ষ এক জাতির অন্তরে করেছিলেন নবরূপে প্রাণের সঞ্চার। এ তল্লাটের মানুষ যখন বিদআত ও শিরকের বেহাগধ্বনীর বেসুর তালে নৃত্যে মত্ত হয়েছিল, তখন তিনি বলিষ্ঠ হাতে তুলে ধরেছিলেন তৌহিদের শাশ্বত মশালখানি। এ মহামনীষী হলেন জ্ঞানতাপস, মুজাদ্দিদ, বাংলার গৌরব ফুরফুরা শরিফের শিরোমণি ইমাম আবু বকর সিদ্দিকি আল-কুরাইশি রাহ.। তিনি ছিলেন চতুর্দশ হিজরির মুজাদ্দিদ। বাংলা ও ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শরিয়ত ও তরিকতের নুরকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পাশাপাশি ওয়াজ-নসিহত, মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, পত্রপত্রিকা প্রকাশ ও শিক্ষা বিস্তারে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর ব্যপারে আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহ. বলেন,

> তিনি দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং ইসলামকে সমর্থন করেছেন।[৩০৫]

ওয়াহাবিদের বিষয়ে শায়খ আবু বকর সিদ্দিকির অবস্থান ছিল আহলে সুন্নাতের অনুরূপ। মৌলবি মুহাম্মাদ আবদুর রাহমান সাহেবের ইজাহুল হক বইয়ে ফুরফুরা শরিফের মুজাদ্দিদে জামান দাদাহুজুর রাহ. লিখেছেন,

> মুহাম্মাদি ফিরকা, লা-মাজহাবি, ওয়াহাবি নামে প্রসিদ্ধ—এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদির তরিকা বা মতবাদ। নিঃসন্দেহে এ মুহাম্মাদি দলের অনুসারীরা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।[৩০৬]

আমায় তথ্যটি প্রদান করেছেন পিরজাদা সৈয়দ আবু সাঈদ মুহাম্মদ সৌদ সিদ্দিকি হাফি.। গ্রন্থটি তাঁর গ্রন্থাগারে আজও সংরক্ষিত রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

১৮. শায়খ রুহুল আমিন বশিরহাটি (১৩৬৪ হি.)

উপমহাদেশ বিশেষত বাংলার নক্ষত্রসম আলিমদের একজন হলেন 'ফাতওয়ায়ে আমিনিয়া' গ্রন্থপ্রণেতা শায়খ রুহুল আমিন বশিরহাটি রাহ.। তিনি একাধারে একজন বিদগ্ধ ইমাম সমাজসংস্কারক সুফি ও বাগ্মী বক্তা ছিলেন। ফুরফুরা শরিফের দাদাহুজুর আবু বকর সিদ্দিকি কুরাইশি রাহ.-এর স্বনামধন্য শিষ্যদের তিনি একজন। বঙ্গসমাজে ইসলামের খিদমতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিদআতি তাকফিরিদের বিরুদ্ধে শায়খ রুহুল আমিন বশিরহাটি রাহ. সর্বদা কঠিন অবস্থান নিয়েছিলেন। ওয়াহাবিদের বিষয়ে তাঁর অবস্থান ছিল অন্যান্য আলিম-উলামাদের মতো শক্ত। তিনি তাঁর 'প্রশ্নোত্তরে মাসআলা মাসায়িল' বইয়ে ফাতওয়ায়ে শামির উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াহাবিদের তাকফিরি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও 'ফাতওয়ায়ে আমিনিয়া' তে ওয়াহাবিদের রদ করেছেন।

১৯. আবুস সাআদাত শিহাবুদ্দিন আহমাদ কুআ

দক্ষিণ ভারতের প্রবাদপ্রতিম উলামাদের একজন হলেন শায়খ আবুস সাআদাত শিহাবুদ্দিন আহমাদ কুআ আশ-শালিয়াতি রাহ. মাজহাবান তিনি ছিলেন শাফিয়ি। দক্ষিণ ভারত বিশেষত কেরালায় তিনি ইসলামি সংস্কার আন্দোলনে বিশাল অবদান রেখেছেন। মাজহাবে শাফিয়ি হলেও চার মাজহাবের উপর তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। ১২৪৫ হিজরি তিনি সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড মুফতি তথা মুফতিয়ে নিজামে হায়দারাবাদ হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি বিদআতিদের বিরুদ্ধে তাঁর লৌহবৎ অবস্থান প্রসংশার দাবি রাখে। ওয়াহাবিদের বিপক্ষে তাদের যুক্তি ও মতাদর্শ খণ্ডন করে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে, الفتاوي الدينية بتنكب الحفلة الايكية ও الارشادات الجفرية في الرد علي الضلالات النجدية

---

৩০৫. الشيخ ابو بكر الصديقي الفرفروي للشيخ منير الاسلام ص ٧١

৩০৬. ইজাহুল হক : ১৮-১৯। ২য় সংস্করণ।

২০. শায়খ হাসান মিসলিয়ার

কেরালার বিখ্যাত উলামাদের একজন হলেন শায়খ হাসান মিসলিয়ার। তিনি তাঁর 'আল-বারাহিনুল খামসা' বইয়ে ওয়াহাবি মতাদর্শ রদ করেছেন। এ ছাড়াও দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠতম উলামায়ে কিরাম যারা ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন বা করছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শামসুল উলামা কুতবি মুহাম্মাদ মিসলিয়ার, শামসুল উলামা আবু বকর মিসলিয়ার, আহমাদ ইসমাইল নাটকটি। এ ছাড়া রয়েছেন বিখ্যাত আলিমে দীন ও মুফতিয়ুদ দিয়ারিল হিনদিয়া সুলতানুল উলামা শায়খ আবু বকর আহমাদ হাফি. প্রমূখ।

২১. শায়খ আহমাদ ইয়ার খান নায়িমি রাহ. (১৩৯১ হি.)

শায়খ আহমাদ ইয়ার খান নায়িমি রাহ. ১৩২৪ হিজরি সনে ভারতের উত্তরপ্রদেশের বাদায়ু জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি ও আদিব ছিলেন। অগাধ পান্ডিত্যের জন্য তাঁকে হাকিমুল উম্মতও বলা হয়ে থাকে। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে অন্যতম হলো 'জাআল হক' । উক্ত বইয়ের মুখবন্ধে তিনি নানান ফিতনার কথা উল্লেখের পর ওয়াহাবিদের ফিতনা সম্পর্কে বলেন,

> কিন্তু ওই সকল ফিতনার মধ্যে মারাত্মক ফিতনা এবং ওই সকল মুসিবতের মধ্যে মারাত্মক মুসিবত ছিল ওয়াহাবি নজদিদের ফিতনা, যার সত্যায়ন নবি আগেই দিয়ে দিয়েছিলেন।

আট. ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে হাম্বলি ইমামদের পরিবার

নজদে আবির্ভূত ওয়াহাবি ফিতনার বিরুদ্ধে বিখ্যাত বিখ্যাত যেসব হাম্বলি আলিমদের পরিবার অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন,

1. আলে আফালিক (নজদ, জুবাইর ও আহসা)
2. আলে ফিরুজ (আহসা ও জুবায়র)
3. আলে সালুম (আহসা ও জুবাইর)
4. আলে জামে (আহসা ও জুবাইর)
5. আলে সুহায়ম (আহসা, নজদ ও জুবাইর)
6. আলে শাত্তি (দিমাশক)
7. আলুল কদুমি ও নাবলুসি আলিমরা (ফিলিস্তিন)
8. আলে শাব্বানা (নজদ)
9. আলুল আতিকি (আহসা, নজদ ও জুবাইর)
10. আলুর রুহায়বানি (দিমাশক)
11. আলুল বারকাবি (শাম)
12. আলে নাসিরি
13. আলে হুমায়দ
14. আলে আবদুর রাজ্জাক

এভাবে সেই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে আলিমরা সংগ্রাম করে আসছেন। এ অধ্যয়ে আমরা সমগ্র বিশ্বের ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী চার মাজহাবের বেছে বেছে শ্রেষ্ঠ আলিমদের নাম উল্লেখ করলাম। এ ছাড়া আরও আলিমরা রয়েছেন তাদের সবার নাম উল্লেখ করলে অধ্যায় বড় হয়ে যাবে।

পরিশিষ্ট–১

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা পূর্ববর্তী ওয়াহাবিদের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি, ওয়াহাবিরা দীনের মধ্যে কিরূপ বিকৃতি সাধন করে উগ্রবাদ, তাকফির চর্চা ও খারিজিয়াত চর্চার মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকহারে ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়েছিল এবং পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে ইসলামি শরিয়তে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে তাদের নিজস্ব মনগড়া উসুল তৈরি করে তা দিয়ে মুসলিমদের তাকফির করে হত্যা করেছিল। তাদের এ খারিজিয়াত চর্চার ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান।

www.muslimdm.com

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যখন প্রাকৃতিক ও খনিজসম্পদে সুসমৃদ্ধ মুসলিম বিশ্বের ওপর তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হলো, তখন তারা মুসলিমদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করতে এবং মুসলিম দেশসমূহের শক্তি খর্ব করে তাদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে তাদের দাসানুদাস সৌদিআরবের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে ওয়াহাবিবাদ প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করে। এ বিষয়টি সত্যায়ন করেছেন সৌদিআরবের যুবরাজ মুহাম্মাদ ইবনু সালমান। ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২২ মার্চ আমেরিকার পত্রিকা 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ দেওয়া প্রায় ৭৫ মিনিটের একটি ইন্টারভিউয়ে তিনি বলেন, মুসলিম দেশগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব কমানোর উদ্দেশ্যে সৌদিআরব পশ্চিমের অনুরোধ সাপেক্ষে মুসলিম বিশ্বে ওয়াহাবিয়াতের প্রসার ঘটায়। একজন ক্রাউন প্রিন্সের থেকে এ ধরনের ঘোষণা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

এই সময় থেকে ওয়াহাবিরা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশে তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শ ও উগ্রবাদ প্রসার করতে শুরু করল। সৌদি থেকে আসা ওয়াহাবিরা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত প্রভাবিত মুসলিম দেশগুলোতে প্রবেশ করল এবং প্রচার করতে শুরু করল যে, এতদিন মুসলিমরা যে আকিদা বিশ্বাস পালন করে এসেছে, তা সবই ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ। মুসলিমদের জান্নাত পেতে হলে কেবল তাদের ব্যাখ্যাকৃত মতাদর্শ ও আকিদা-বিশ্বাস মানতে হবে।

এরপর তারা প্রচার করতে শুরু করল, মুসলিম বিশ্বের শাসকরা সবাই মুশরিক ও কাফির। খারিজিদের শাশ্বতবাণী `লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ' ধ্বনি তুলে তারা মুসলিমদের শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে শুরু করল। ফলে একদিকে মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস ভুল বলার কারণে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সঙ্গে তাদের বিরোধ ও দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল, অপরদিকে শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে মানুষকে উসকে দিয়ে মুসলিম দেশগুলোতে ভয়ানকভাবে অশান্তি তৈরি করতে শুরু করল। ফলে মুসলিমদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিতে শুরু করল। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ওয়াহাবিরা একশ্রেণির ধর্মজ্ঞানহীন মুসলিমদের জান্নাতের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের মতাদর্শে দীক্ষিত করতে শুরু করল, এরপর তাদের মাধ্যমে খারিজিয়াত ও উগ্রবাদিতা মুসলিমসমাজে সূক্ষ্মভাবে প্রচার-প্রসার করার মাধ্যমে মুসলিমদের শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম দেশগুলোকে দুর্বল করে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিতে লাগল। যারা তাদের মতাদর্শ মানল না, তাদের তারা ওয়াহাবিসুলভ কাফির, মুরজিয়া, বিদআতি, মুশরিক ইত্যাদি বলে তাকফির-তাবদি করতে শুরু করল।

মুসলিম তরুণ ও যুবশ্রেণি—আগামী মুসলিমজাতির গুরুদায়িত্ব যাদের ওপর রয়েছে, তাদেরকে ওয়াহাবিরা ভুল বুঝিয়ে নিজের দলে টানতে শুরু করল এবং তাদের উগ্রবাদী বানানোর মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের দিকে ঠেলে দিয়ে তাদের মূল্যবান জীবনকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিতে লাগল। এসব কর্মকাণ্ড অনেক সময় তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে করছে আবার অনেক সময় তারা করছে পশ্চিমাদের সহায়তা নিয়ে—তাদের এজেন্ট হয়ে। তাদের এসব কর্মকাণ্ডের ভয়াবহ পরিণাম আজ সমগ্র মুসলিমবিশ্ব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। কেবল তাদের কারণেই লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক ও ইয়ামেনের মতো দেশগুলো আজ মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে, জন্ম নিয়েছে আল-কায়দা, বোকো হারাম, দায়িশের প্রভৃতির মতো খারিজি মতাদর্শী সংগঠন এবং গ্লোবাল টেরোরিজমের মতো বিধ্বংসী ফিতনা, যা একে একে গ্রাস করছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে, ধ্বংস করে ফেলছে মুসলিমদের, বাকি রাখছে না একটি জনপদও।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে দেশে ওয়াহাবিদের ফিতনা ও বিভৎসতার কিছু নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো,

ওয়াহাবিদের কবলে আফগানিস্তান

উপমহাদেশের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে ঘেরা নিসর্গ ছবির মতো দেশটির নাম হলো আফগানিস্তান। আশির দশকে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তান আক্রমণ দেশটির অনিন্দ্য চিত্র পরিপূর্ণরূপে বদলে দেয়, শুরু হয় একটি রক্তাক্ত অধ্যায়। আফগানিস্তান আক্রমণ করে তারা নিরীহ আফগান জনগণের ওপর নির্মম অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু করে। বিশেষকরে ইসলামপন্থিদের ওপর নেমে আসে দূর্ভাগ্যের আঁধার। ইসলামি আচার-বিধানে বাধা, আলিম-উলামাদের গ্রেপ্তার, কারাগারে তাদের ওপর বিভৎস নির্যাতন, গণহত্যা, ধর্ষণ সে সময় আফগানিস্তানে সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। রুশবাহিনীর বর্বরতা যখন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল তখন নির্যাতিত-নিষ্পেষিত আফগানরা দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হলো। তারা অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করল। শুরু হলো রুশবিরোধী ইসলামি জিহাদের পদযাত্রা।

আফগানিস্তান আহলুস সুন্নাহ অনুসারী দেশ। সুফিদের পদধূলি বিধৌত দেশটির প্রায় ৯০-৯৫% মুসলিম হানাফি মাজহাব অনুসরণ করে থাকেন। রুশবিরোধী আফগান জিহাদে মুজাহিদদের অধিকাংশই ছিলেন হানাফি। তবে তাদের মধ্যে আবদুর রব রাসুল সাইয়াফ নামক একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন, যিনি মতাদর্শগতভাবে সালাফি ওয়াহাবি ছিলেন। আরবি ওয়াহাবি প্রধান দেশ সৌদিআরবের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি আফগানিস্তানে অবস্থিত আরবি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের একটি শাখার সদস্য ছিলেন।

এদিকে আফগানিস্তানে যখন জিহাদ শুরু হয় তখন আরবের প্রভাবশালী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিন আফগানযুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য ও আফগানিদের সহায়তার জন্য আরবজুড়ে ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে। তারা টিভি-রেডিয়োর মাধ্যমে আরবদের আফগান জিহাদে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করে। সালাফি-ইখওয়ানি মতাদর্শী হওয়ায় ইখওয়ানের পূর্ণ সমর্থন ছিল সাইয়াফের প্রতি। তাঁকে তাদের একজন প্রতিনিধি ও মুখপাত্র জ্ঞান করত। আরবি সালাফিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় সাইয়াফ আফগানযুদ্ধে অংশগ্রহণে আগ্রহী আরবি সালাফিদের আফগানিস্তানে আমদানি করতে শুরু করে। আরবদের আফগানিস্তানে আগমন শুরু হয় মূলত ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের আশপাশে। এ সকল আরব যোদ্ধাদের অধিকাংশই ছিলেন ইখওয়ান প্রভাবিত ওয়াহাবি সালাফি মতাদর্শী। যাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ আজ্জাম, আবদুল্লাহ আনাস, আবু মুসআব, জারকাবিরা।

আবার আবুল ওয়ালিদ আল-মিসরিদের (মুসতাফা হামিদ) মতো কিছু আহলুস সুন্নাতের অনুসারীরাও আরব থেকে আফগানিস্তানে হিজরত করেন। আফগানিস্তানে আসা আরবদের নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিলিস্তিনি আলিম ও ইখওয়ান প্রভাবিত নেতা অধ্যাপক ডক্টর আবদুল্লাহ আজ্জাম একটি সংগঠন গঠন করেন যার নাম দেন মাকতাবাতুল খিদমাত। সংগঠনটি তৈরির মুখ্য কিছু উদ্দেশ্য হলো, আরবদের সঙ্গে আফগানিদের মেলবন্ধন স্থাপন করা এবং আফগানি অন্তর্বর্তী রাজনীতিতে আরবরা যাতে জড়িত না হয়ে পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখা। মাকতাবাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ আজজামের জামাতা আবদুল্লাহ আনাস তাঁর To the Mountains বইয়ে বলেন,

> Maktabat al-Khadamat was set up due to a logistical necessity. How was one to manage this influx of Arabs who had answered the call of the sheikh? So when I returned to Peshawar from Mazar Sharif to report on my findings discovered that Sheikh Azzam had already established the MAK. I was one of the people whose names was down as one of its founders. The raison d'être behind the establishment of the office was very simple. Very early on there was a recognition that the Arabs had to be organised in order for them to play a vital role in the Afghan Jihad. Afghans revered us due to the fact that the Prophet Muhammad was one of us (an Arab), the Quran was in Arabic and so on. The average Afghan respected us immensely based simply on that. And this could be used as leverage to negotiate the fractious political environment that existed in Afghanistan. If the Arabs could remain neutral throughout the mujahideen infighting and rivalry then perhaps great things could be achieved. That was the idea behind the MAK. [৩০৭]

ডক্টর আবদুল্লাহ আজ্জাম ওয়াহাবি ও সালাফি মতাদর্শী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অনেকটাই নরমপন্থি ও প্রজ্ঞাবান। তিনি তাঁর আকিদার বইয়ে আহলুস সুন্নাতের আশআরি ও মাতুরিদিদের সিফাতের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ থেকে খারিজ করে দিলেও আফগানিস্তানের আশআরি মাতুরিদিদের তিনি সমীহ করে চলতেন। কিন্তু অন্যান্য আরবি সালাফিরা ততটা নরমপন্থি ছিল না। তারা আফগানিস্তানে এসে আফগানিদের সঙ্গে আকিদার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ল। আরব সালাফিদের কাছে আফগান আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীরা ছিল বিদআতি অথবা মুশরিক। আফগানিস্তানে আরব থেকে আসা প্রথম পর্যায়ের যোদ্ধাদের একজন শায়খ আবুল ওয়ালিদ মিসরি হাফি। ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের অফিসিয়াল আরবি মাসিক ক্রোড়পত্র আস-সামুদ-এর ১৭৯ সংখ্যায় সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধের সময় আরব থেকে আগত সালাফি ওয়াহাবিদের তাকফিরি মনমানসিকতার বিষয়ে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি লেখেন, সৌদিআরব, মিসর ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত

৩০৭. To the Mountains : 145-146

আরবি ওয়াহাবি সালাফিরা আফগানদের সঙ্গে আকিদাগত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। কারণ, তাদের কাছে আফগানরা ছিল কবরপূজারী মুশরিক। শায়খ আবুল ওয়ালিদের ভাষায়,

> আর আরবরা—নিজেরাই বিশেষকরে সৌদি, মিশর ইত্যাদির সালাফি ওয়াহাবি তরুণরা এর জন্য (মুজাহিদদের আরব বিদ্বেষের) দায়ি ছিল...তাদের মধ্যে এবং আফগানদের মধ্যে আকিদার লড়াই ঘটেছিল, যারা (অর্থাৎ, আফগানরা) ওইসব যুবকদের নজরে মুশরিক হানাফি কুবুরি জনগণ ছিল।[৩০৮]

এই দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে যায় যখন মিসর থেকে আয়মান আল-জাওয়াহিরি ও সাইয়িদ আল-ইমাম নামক দুই মিসরি নেতা আফগানিস্তানে এসে পৌঁছান। জাওয়াহিরি ও তাঁর গুরু আল-ইমাম উভয়ে ছিলেন কট্টর তাকফিরি। তাদের বিষয়ে ডক্টর আবদুল্লাহ আজজামের জামাতা আবদুল্লাহ আনাস লিখেছেন,

> ...কিন্তু ১৯৮৭ এর পর মিসরীয় উগ্রবাদীরা যেমন আল-জামাআতুল ইসলামিয়ার বিরোধী ইসলামি জিহাদ দলটি আসার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অতিথিশালা গজিয়ে উঠল। এ দলটির নেতৃত্বে ছিলেন, ডক্টর ফজল অথবা সাইয়িদ ইমাম আল-শরিফ ও আয়মান আল-জাওয়াহিরি। এরা ছিল তাকফিরি। কারণ, তারা তাদের মতো আকিদা না রাখলে তোমায় তাকফির করবে বা (তারা মনে করে) যদি তুমি মুসলিম শাসকদের কাফির বলতে ব্যর্থ হও অথবা যদি তুমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হও তাহলে তুমি ইসলামের পরিধির বাইরে চলে গেছ। আর অবশ্যই তারা নির্ধারণ করত, কারা কাফির আর কারা কাফির নয়। আর তারাই ওইসব ধারণা এ সকল আবেগপ্রবণ যোদ্ধাদের মাথায় প্রবিষ্ট করত যা ইসলামের রুহের জন্য ক্ষতিকর ও অসঙ্গতিপূর্ণ।[৩০৯]

জাওয়াহিরি আফগানিস্তানে পৌঁছানোর আগে কট্টর ওয়াহাবি উসামা বিন লাদেন আবদুল্লাহ আজজামের মাকতাবাতুল খিদমাতের সদস্য ছিলেন। কিন্তু জাওয়াহিরি আফগানিস্তানে আসার পর অন্যান্য সালাফি ওয়াহাবিদের মতো তিনিও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন এবং মাকতাবা ছেড়ে জাওয়াহিরির দলে যোগদান করেন। জাওয়াহিরির গুরু ডক্টর ফজল বা সাইয়িদ আল-ইমাম একটি বই লিখেছিলেন 'আল-উমদা ফি ইদাদিল উদ্দা' নামে যেটা তাকফিরিদের আত্মা হিসেবে কাজ করেছিল। ডক্টর আবদুল্লাহ আজ্জাম নিজেও এ বইটির বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, অচিরেই এটি মুসলিমদের রক্তপাত ঘটাবে। পরে হয়েছিলও তাই, উসামা তাকফিরিদের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর জাওয়াহিরি ও উসামা মিলে প্রতিষ্ঠা করেন উগ্রবাদী তাকফিরি ওয়াহাবি সংগঠন তানজিমু কায়িদাতিল জিহাদ, যা বর্তমানে আল-কায়দা নামে পরিচিত। এর পরবর্তী বছর অর্থাৎ, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর আবদুল্লাহ আজ্জাম নিহত হন। বলা হয়ে থাকে, তাঁর হত্যার পেছনে দায়ী ছিলেন আয়মান আল-জাওয়াহিরি। কারণ, তিনি আবদুল্লাহ আজ্জামকে কাফির মনে করতেন এবং তাঁর পেছনে নামাজ পড়তেন না। আনাস আবদুল্লাহ তাঁর বইয়ে জাওয়াহিরি ও আজজামের বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছেন। আজজামের মৃত্যুর পর মাকতাবার পতন ঘটে। এরপর উত্থান ঘটে আল-কায়দা নামক কট্টর তাকফিরি ওয়াহাবি সালাফি সংগঠনের। পরে আফগানিস্তানে যুদ্ধরত আরব সালাফি ওয়াহাবিদের উগ্রবাদী বানানো শুরু হয়। ফজলের বই 'আল-উমদা' কে আল-কায়দার অবশ্যপাঠ্য বই হিসেবে পরিগণিত করা হয়। আল-কায়দার অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে তাকফির চর্চা শুরু হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কয়েকবছর পর তালিবান নেতা মোল্লা উমর রাহ.-এর নেতৃত্বে আফগানিস্তানে প্রথম ইসলামি ইমারত কায়িম হয়। প্রথম ইসলামি ইমারতের যুগে আফগানিস্তানে আল-কায়দার অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু ইসলামি ইমারতের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সালাফি ওয়াহাবিদের সম্পর্ক ভালো ছিল না। স্বয়ং মোল্লা উমর রাহ. সালাফি ওয়াহাবিদের দীনের ভুল ব্যাখ্যার ঘোরবিরোধী ছিলেন। তাঁর দেহরক্ষী জাব্বার উমরি আফগান গবেষক বেটে ড্যামের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। বেটে ড্যামের ভাষায়,

> যদি তিনি কখনো জাব্বার উমরির সামনে আল-কায়দা নিয়ে কিছু বলতেন, তা হতো ইসলামের ওহাবি ব্যাখ্যার সমালোচনা, যা ছিল কোনো না কোনোভাবে আফগানের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় বিশ্বাসের ঘোরবিরোধী। একদা তিনি আল্লাহর আকার প্রদানের ওয়াহাবি তত্ত্বের বিরোধিতা করলেন, যেটা ছিল ইলাহের তাশবিহ, যা ছিল কুরআনের জাহিরি ব্যাখ্যাভিত্তিক। জাব্বার উমরি বললেন, তিনি মোল্লা উমরকে বলতে শুনেছেন, 'যদি তুমি জেনেই থাকো আল্লাহ কোথায় থাকেন, তাহলে তুমি তাঁকে একটি মানুষের রূপ দিয়ে থাকো,

৩০৮. আস-সমুদ : ১৭

৩০৯. To the Mountains : ১৫০-১৫১

কিন্তু তিনি তো সেটা নন।'[৩১০]

ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরও আফগানিস্তানে সালাফি ওয়াহাবিদের তাকফির ও ফিতনা অব্যাহত থাকে। একসময় তদানীন্তন ইসলামি ইমারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে আফগানিস্তান থেকে বহিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। আবুল ওয়ালিদ আল মিসরি (মুসতাফা হামিদ) লেখেন,

> একদা আমি (ইসলামি ইমারতের) পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৃহৎ সম্মেলনে উপস্থিত হতে কাবুলে অবস্থান করছিলাম। দিন শেষে তারা নামাজ পড়তে যাচ্ছিলেন আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানতেন না যে, ঘরে একজন আরব রয়েছেন। তিনি বললেন, 'আসলে এসব ওয়াহাবি আরবদের আফগানিস্তানে আমাদের প্রয়োজন নেই; তারা আমাদের জন্য সমস্যা তৈরি করে আর আমাদের তাকফির করে বেড়ায়।'[৩১১]

উসামা বিন লাদেন ছিলেন একজন কট্টর তাকফিরি ও একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক। আফগানিস্তানে যখন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের নেতৃত্বে ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠা পেল তখন উসমার নেতৃত্বাধীন আল-কায়দা অন্যান্যদের সঙ্গে ইসলামি ইমারতের হাতে বায়আত গ্রহন করেন। কিন্তু প্রচলিত প্রথা অনুসারে তিনি বায়আত গ্রহন করলেও ইসলামি শরিয়ত মোতাবিক তিনি বায়আত রক্ষা করতে পারেন নাই। পদে পদে তিনি মোল্লা উমরের বিরোধিতা করে গেছেন। ইসলামি ইমারত কর্তৃক আফগানিস্তানের ভূমি ব্যবহার করে আফগানিস্তানের বাইরে কোনোপ্রকার আক্রমণ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু উসামা বিভিন্ন সময় আফগানিস্তানের অভ্যন্তর থেকে আফগানিস্তানের বাইরে বিভিন্ন আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং তার দায় অস্বীকার করতে থাকেন। সর্বশেষ ঘটনাটি ছিল টুইন টাওয়ার ট্রাজেডি। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামি ইমারতের সরকারি কর্তৃপক্ষের বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে তিনি আমেরিকাতে ৯/১১-এর মতো হামলা পরিচালনা করেন। যার বিষদ বিবরণ 'আল-আরব ফি হারবি আফগানিস্তান' নামক বইয়ে মুসতাফা হামিদ বর্ণনা করেছেন। এ হামলার ফলে ইসলামি ইমারতের পতন ঘনিয়ে আসে।

উসামা প্রথমদিকে দায় অস্বীকার করে বসেন। ফলে ইসলামি ইমারত উভয় সংকটের মধ্যে পড়ে। একদিকে শরিয়তগত প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা নিরাপরাধ উসামাকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে পারছিল না, অপরদিকে আন্তর্জাতিক প্রবল চাপ আফগানিস্তানের ওপর এসে আছড়ে পড়ে। ফলে একসময় কেবল ওয়াহাবি উসামা ও তাঁর আল-কায়দা নামক উগ্রপন্থি তাকফিরি দলের কারণেই আমেরিকা জোট আফগানিস্তান আক্রমণ করে। সেই সঙ্গে পরিসমাপ্তি ঘটে প্রথম ইসলামি ইমারতের পথচলার। এদিকে আমেরিকা আফগানিস্তানে আক্রমণ করার কয়েক বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই ৯/১১-এর দায় স্বীকার করে আল-কায়দা, তখন ইসলামি ইমারত ধংসস্তুপমাত্র, আর আল-কায়দার সদস্যরাও আফগানিস্তান থেকে ত্যাগ করে আরবের বিভিন্ন দেশে চলে যায়।

ওয়াহাবিদের কবলে আলজেরিয়া

আফ্রিকার মুসলিম দেশ আলজেরিয়াতে ওয়াহাবিদের ফিতনার সূচনা ঘটে ১৯৮৯-এর দিকে। আফগানিস্তানে যখন তাকফিরি মতাদর্শী আল-কায়দা জন্ম নেয়, তখন তাদের মতাদর্শে দীক্ষিত একশ্রেণির তাকফিরি আলজেরিয়ার গণতান্ত্রিক সরকারকে তাকফির করে বসে। এ সময় দেশটিতে ইসলামপন্থিরা রাজনৈতিক অঙ্গনে শক্তিশালী পজিশনে ছিল। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে আলজেরিয়ায় ইখওয়ানপন্থি দল 'আল-জাবহাতুল ইসলামিয়া লিল ইনকাজ' নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ ভোট পেয়ে ক্ষমতায় আসার মুখেই আলজেরিয়ার সেনাবাহিনী একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইসলামপন্থিদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে বলপূর্বক তাদের ওপর জুলুম নির্যাতন শুরু করে। পরবর্তীতে যা আলজেরিয়াকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। আলজেরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হলে আফগানিস্তান থেকে তাকফিরি সালাফিরা দলে দলে আলজেরিয়ায় আসে। সেখানে তারা কয়েকটি সালাফিস্ট দলে বিভক্ত হয়ে যায়, যার একটি হলো 'জামাআতুল ইসলামিয়াতুল মুসাল্লাহা' (GIA)। এ দলটি ছিল সম্পূর্ণ আল-কায়দা মতাদর্শী। আল-কায়দার সক্রিয় সদস্য আবু মুসআব আস-সুরি তাঁর বই 'মুখতাসারু শাহাদাতি আলাল জিহাদ ফিল জাজায়ির'-এর মধ্যে লিখেছেন, দলটি তাঁর বইপত্র ও রাসায়িল পাঠ করে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ওয়াহাবি সালাফি মতাদর্শী GIA গণতান্ত্রিক সরকার ও সেনাবাহিনীকে তাকফির করে আলজেরিয়ায় ব্যাপক ফিতনা তৈরি করল। আলজেরিয়ায় মুসলিমদের আকিদার ঠিক নেই, তারা মুশরিক ইত্যাদি বলে নিরীহ মুসলিমদের হত্যা করতে লাগল। তাদের অপকর্ম থেকে বাদ পড়ল না কেউই। তারা গণতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুসলিমদের হত্যা করে, ধর্ষণ করে মুসলিম রমণীদের। আলজেরিয়ায় GIA-এর বিভৎসতার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আবু মুসআব লেখেন,

---

৩১০. The Secret Life of Mullah Omar by Bette Dam : 13-15
৩১১. Arabs at War in Afghanistan : 220

> উক্ত সশস্ত্র দলটির নেতারা ও আবু আবদুর রহমান আমিনের গ্যাং শায়খ মুহাম্মাদ আস-সায়িদকে তাঁর সাথিদের সঙ্গে বিচার নয় বরং প্রতারণাপূর্বক হত্যা করেছিল, আর তারা এ জন্য ব্যথিতও হয়নি কারণ, তারা তাদের দুর্ঘট ও পথভ্রষ্টতা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলেন। অনুরূপ তারা আরব-আফগান মুজাহিদদের বিদআত, (নতুন) চিন্তাধারা গ্রহণ ও সালাফি আকিদা সহিহ না হওয়ার দাবি করে এবং তাদের কাজে বাধা দেওয়ার কারণে যাকে পেরেছিল হত্যা করেছিল।...আর তারা রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন ও অস্ত্রধারণের দাবি তুলে আলজেরীয় গ্রামবাসী ও দেশবাসীকে গণহত্যা করেছিল। আর তাগুতি মহিলা দাবি তুলে (আলজেরীয় নারীদের) সম্ভ্রম নষ্ট করেছিল, তাদের সঙ্গে জিনা ও ধর্ষণে লিপ্ত হয়েছিল।[৩১২]

শায়খ আবুল ওয়ালিদ মিসরি আলজেরিয়ায় ওয়াহাবি তাকফিরিদের বর্বরতা সম্পর্কে লেখেন,

> All of this played a part, but the people who went to Algeria to fight did not stay for long. Not only were the takfiris there crazy, and doing things that had nothing to do with Islam-killing people, raping women, taking the property of the people-they were also killing Arabs who were fighting there. They did this to prevent the Arabs telling others about the unlawful things happening there and making a bad reputation for the Algerians.[৩১৩]

আলজেরিয়ায় ওয়াহাবি সালাফিদের ফিতনা-ফাসাদের কারণে একসময় প্রায় সাফল্যের মুখ দেখা ইসলামি বিপ্লব মুখ থুবড়ে পড়ে। দুর্বল হয়ে পড়ে ইসলামপন্থিরা, সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল হয়ে পড়ে দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকা আলজেরিয়াও।

ওয়াহাবিদের কবলে লিবিয়া

আফ্রিকার সুসমৃদ্ধ দেশ লিবিয়ায় ওয়াহাবিয়াতের পথচলা শুরু হয় ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। লিবিয়ায় তদানীন্তন শাসক জেনারেল গাদ্দাফি নাজরিয়াতুন আলামিয়াতুন সালিসা (Third International Theory) ঘোষণার পর থেকে তিনি দেশটির প্রবল প্রতাপশালী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী সানুসিদের দমন করতে উদ্যত হন। সানুসিদের দমনের লক্ষ্যে তিনি লিবিয়ায় সালাফিয়াত-ওয়াহাবিয়াত মতাদর্শ আমদানি করেন। কিন্তু খাল কেটে কুমির আনলে যা হয় লিবিয়ায় তাই ঘটল। পরবর্তী সময়ে সালাফিরাই লিবিয়া শাসক গাদ্দাফিকে তাকফির করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল।

১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে আফগান ফেরত লিবিয়ান সালাফিরা তথাকথিত ইসলামি লিবিয়া গঠনের ডাক দেয় এবং আল-জামাআতুল ইসলামিয়া (LIFG) নামক একটি সংগঠন তৈরি করে লিবিয়ার অভ্যন্তরে নাশকতামূলক কার্যক্রম শুরু করে। এ সংগঠনটি ছিল আল-কায়দার শাখা। তাদের মাধ্যমে লিবিয়ায় তাকফিরি ফিতনার গোড়াপত্তন ঘটে। এদিকে জামাআতুল ইসলামিয়াকে দমন করতে গাদ্দাফি সরকার সৌদি থেকে অপর এক উগ্রপন্থি ওয়াহাবি মতবাদ মাদখালিজমের আমদানি করেন। তবুও শেষরক্ষা হলো না। লিবিয়ায় সালাফি ফিতনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

অবশেষে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত গৃহযুদ্ধে LIFG গাদ্দাফিবিরোধী শিবিরে যোগদান করল এবং গাদ্দাফি পতন ঘটিয়ে দম নিল। গাদ্দাফির পতনের পর লিবিয়ায় ইখওয়ানপন্থি সরকার ক্ষমতায় এলে লিবিয়ার সালাফি শিবির দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। LIFG সদস্যদের একটি বড় অংশ লিবিয়ার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের পক্ষে যোগদান করল। অপরদিকে মাদখালিরা যোগদান করল বিদ্রোহী জেনারেল হফতারের পক্ষে। জেনারেল হফতার হলেন একজন গাদ্দাফিবিরোধী বিদ্রোহী নেতা। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে গাদ্দাফির বিরুদ্ধে একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান ঘটানোর ফলে তিনি বিতাড়িত হন। এরপর ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গণতন্ত্রের বুলি আউড়িয়ে গাদ্দাফিবিরোধী অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেন। গাদ্দাফির পতন ঘটলে তাঁর ইচ্ছা ছিল, লিবিয়ার গদি দখল করা, কিন্তু সে ইচ্ছা যখন পূরণ হলো না। তখন তিনি কিছু স্বৈরতান্ত্রিক আরব রাজবংশ ও পশ্চিমাদের সহায়তায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। গাদ্দাফি একসময় সক্রিয় CIA এজেন্ট ছিলেন।

এদিকে মাদখালিরা যখন হফতারের পক্ষ নিল, লিবিয়ায় আরও একটি রক্তাক্ত ইতিহাসের সূচনা ঘটল। তারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ইখওয়ানপন্থি GNA সরকারকে খারিজি ও লিবিয়ার সেনাবাহিনীকে জাহান্নামের কুকুর ঘোষণা করে লিবিয়াবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ উসকে দিল।

---

৩১২. মুখতাসারু শাহাদাতি আলাল জিহাদ ফিল জাজায়ির : ৫৩-৫৪

৩১৩. Arabs at War in Afghanistan : 212

এদিকে তুর্কি যখন হফতারের বিরুদ্ধে লিবিয়ার ইখওয়ানপন্থি সরকারের সহায়তায় অবতীর্ণ হন, তখন মাদখালিরা তুর্কি রাষ্ট্রপতি রজব তাইয়িব এরদোগানকে আল্লাহর শত্রু বলে ঘোষণা দেয়। বিশিষ্ট রাজনৈতিক গবেষক ইসমাইল ইয়াশা একটি প্রতিবেদনে লিখেছেন,

> মাদখালি সালাফি যারা হফতারের নেতৃত্বে লড়াই করেছিল, তারা (লিবিয়ার) সরকার ও ফায়িজ আল-সাররাজের নেতৃত্বে থাকা বাহিনীকে জাহান্নামের কুকুর খারিজি বলে অভিহিত করেছিল এবং দাবি করেছিল, তারা এরদোগান—যাকে তারা আল্লাহর শত্রু এবং মুসলিম ও আরবদের শত্রু বলে অপমান করত তাঁর হয়ে লড়াই করে। (মাদখালিদের গুরু) রাবি আল-মাদখালির ছাত্র আবু আবদুর রাহমান আল-মাক্কি লিবিয়ায় হফতারের অধীনে লড়াই করা মাদখালি সালাফিদের বলেন, 'তারা আল্লাহর নামে লড়াই করছে' আর 'তারা জিহাদে রত রয়েছে'। লিবিয়ার মাদখালি সালাফিদের নেতৃস্থানীয় একজন আবদুল ফাত্তাহ ইবনু গালবুন দাবি করেছিলেন, তারা সারা বিশ্বের খারিজিদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এবং তিনি ত্রিপোলি থেকে তাঁর সমর্থকদের খারিজি এবং ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বিরুদ্ধে হফতারের সমর্থনে আহ্বান জানান।[৩১৪]

মাদখালিদের ফাতওয়ার ফলে লিবিয়ায় হফতারের দখলকৃত এলাকায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। রচনা হয় বহু নিরাপরাধ মুসলিমের গণকবর। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ এপ্রিল 'ডেইলি সাবাহ' সংবাদপত্রের একটি খবর অনুযায়ী লিবিয়ায় হফতার শাসিত অঞ্চলে এ পর্যন্ত মোট ৯৪টি গণকবর উদ্ধার করা হয়েছে। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুলাই 'আল-জাজিরা' এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘের একটি প্রতিনিধি দল জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত কেবল লিবিয়ার তারহুনা অঞ্চলে প্রায় ১০০টি গণকবর উদ্ধার বাকি রয়েছে। ইতিমধ্যে কট্টর মাদখালি নেতা মাহমুদ মুসতাফা আল-ওয়েরফাল্লিকে যুদ্ধপরাধী ঘোষণা করে গ্রেপ্তার করেছে ICC। এভাবে সালাফি-ওয়াহাবিদের কারণে এককালীন সমৃদ্ধ লিবিয়া পরিণত হয় মৃত্যুপুরীতে।

ওয়াহাবিদের কবলে সোমালিয়া

আফ্রিকার মুসলিম দেশ সোমালিয়ায় ওয়াহাবিদের উৎপাত শুরু হয়, আল-কায়দার শাখা দল আশ-শাবাবের উত্থানের পর থেকে। আশ-শাবাব সংগঠনটি কয়েকটি উগ্রবাদী গোষ্ঠীর ঐক্যজোট। সোমালিয়ার বুকে প্রথম আশ-শাবাব মিলিট্যান্টসদের আবির্ভাব ঘটে ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে। গোষ্ঠীটি হলো, সম্পূর্ণ সালাফি তাকফিরি মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা সোমালিয়ার মুসলিমশাসক ও সেনাবাহিনীকে মুরতাদ ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যক্রম শুরু করে। সোমালিয়ায় আশ-শাবাব গোষ্ঠীর দ্বিতীয় উত্থান ঘটে ২০০৭-এর দিকে। প্রায় ৫০০০ মিলিট্যান্টসের সমন্বয়ে গঠিত দলটি ২০০৭ নাগাদ দক্ষিণ সোমালিয়ার অধিকাংশ এলাকা তাদের কব্জায় নিয়ে আসে। সেখানে তারা তথাকথিত তাওহিদ ও সহিহ আকিদা প্রচারের নামে মুসলিমদের মধ্যে উগ্রবাদ ও তাকফিরি মতাদর্শের প্রচার-প্রসার ঘটাতে শুরু করে। এ বছরই সোমালিয়ায় শাবাব উগ্রবাদীদের দমন করতে সোমালিয়ার সরকারকে সহায়তার উদ্দেশ্যে দেশটিতে তৎপরতা শুরু করে আল-ইত্তিহাদুল ইফরিকি ফিস সুমাল (AMISOM) যা গত ৩১ মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে তাদের মিশন সমাপ্তির ঘোষণা দিয়েছে।

২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শাবাব সোমালিয়ায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে। গালগুদুদ বিলায়াত (প্রদেশ) থেকে নিয়ে বিলায়াতে জুবা হুস প্রদেশ পর্যন্ত সোমালিয়ার মোট ১৯টি প্রদেশের মধ্যে প্রায় ৯টা প্রদেশ তারা দখল করে নেয়। সুফিবিধৌত দেশটিতে শুরু হয় সালাফিয়াত-তাকফিরিয়াতের জয়যাত্রা। এ সময় খারিজিদের বানী 'লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ'-এর স্লোগানে সোমালিয়ার এক বড় অংশের মানুষ তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ২৩ আগস্ট ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে তারা সোমালিয়ার রাজধানী মুকাদিশুস্থ রাজপ্রাসাদ ও রাজপ্রাসাদ থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত ফুনদুকু মুনায় (মুনা রেস্তোরাঁ) ভয়াবহ সন্ত্রাসী আক্রমণ ঘটায়। এ ঘটনায় তদানীন্তন আল-হুকুমাতুল ইত্তিহাদিয়াতুল ইনতিকালিয়া (TFG)-এর প্রায় ১০০ জন কর্মকর্তা নিহত হন। ঘটনাটি তদানীন্তন শাবাবের সক্ষমতার জানান দেয়। শাবাবের উগ্র তাকফিরি মনোভাব ও ফিতনার কারণে তারা সোমালিয়ার মুসলিমদের ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

২০১০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তীতে শাবাব ধীরে ধীরে দুর্বল হতে শুরু করে। অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাকফিরিয়াত ও বহিরাক্রমণ তাদের দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে দিতে থাকে। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের মাত্র ২ বছরের মধ্যে সরকার ও AMISOM-এর আক্রমণে গালগুদুদ, হিরান, বাকুল, শাবিল্লা ধিকসা, গেদো, জুবা হুসের বিরাট এলাকা তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ইতিমধ্যে শাবাবের তাকফিরিদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব মহামারি আকারে দেখা দেয়। ধীরে ধীরে তাদের আসল রূপ প্রকাশ হতে শুরু করে। এর মূলে ছিল ওয়াহাবি-সালাফি তাকফিরি মতাদর্শ। ফলে ২০১৩-এর দিকে শাবাব দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

৩১৪. The Terrorist Organization Behind the Curtain : The Madkhali Salafists : 9

তাদের একজন নেতা আহমাদ জুদানের নেতৃত্বে একটি দল ও মুখতার রুবু নামক একজন আলিমের নেতৃত্বে আরেকটি দল তৈরি হয় এবং একে অপরের বিরুদ্ধে তাকফির-তাবদিসহ নানাবিধ তকমা লাগিয়ে মারামারি শুরু করে।

এ সময় অর্থাৎ, ২০১৩ থেকে ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে নিরীহ আলিম-উলামা হত্যাসহ অন্যান্য জঘন্য জঘন্য কাজকর্মও তারা করতে থাকে। শাবাবের অন্তর্দ্বন্দ্ব সোমালিয়া সরকারের সামনে একটি সুযোগ তৈরি করে দেয়। শুরু হয় শাবাবের পতনের যুগ। মোক্ষম সুযোগ কাজে লাগিয়ে শাবাবকে কোনঠাসা করে ফেলে সোমালিয়া সরকার। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে হায়রান, বেই, শিবিল্লা ও জুবাদেকশের কিছু অংশে তাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদের পতন চলতে থাকে। কিন্তু কেবল তাদের তাকফিরি মতাদর্শ ও ফিতনার সুযোগে আস্তানা গেঁড়ে বসে বৈদেশিক দখলদাররা, লুন্ঠন করে নিয়ে যায় সোমালিয়ার সম্পদসমূহ। একসময় সোমালিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে।

এ ছাড়াও ইরাক, ইয়ামেন এবং সিরিয়ায়ও তাদের ফিতনার কথা সবারই জানা। ইরাককে ধ্বংস করতে ওয়াহাবি সৌদি রাষ্ট্র ইবনু বাজসহ তাদের বড় বড় আলিমদের ফাতওয়া নিয়ে আমেরিকার হামলা জায়িজ প্রমাণ করে, মাত্র চার দিনের ব্যবধানে Operation Desert Storm পরিচালনা করে ইরাককে কবরস্থানে পরিণত করেছিল, হত্যা করেছিল হাজার হাজার নিরীহ মুসলিমদের। ইয়ামেনে একসময় যে হুথি মুতাওয়াক্কিলি শাসকদের রক্ষার জন্য সৌদি-মিসরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, এখন পশ্চিমা ও ইসরায়েলের স্বার্থে সেই হুথিদের ধ্বংসের নামে ইয়ামেনকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে ওয়াহাবি সৌদি ও আমেরিকা।

ওয়াহাবিরা কখনো সৌদি রূপে, কখনো আল-কায়দা রূপে, কখনো মদখালি রূপে, কখনো দায়েশ অথবা বোকো হারামরূপে অথবা অন্য কোনো রূপে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। তারা যে দেশে গেছে সে দেশেই তাকফির-তাবদি করে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ তৈরি এবং তাদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছু দেয়নি। তাদের ফিতনা-ফাসাদে অতিষ্ঠ হয়ে একদা ওয়াহাবিমতাদর্শী ও আল-কায়দা তাকফিরিদের মানহাজের একজন শায়খ মাজিদ হামাদান রাশিদ আল-কায়দার তাকফিরিদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

> ইরাক, সোমালিয়া, আফগানিস্তান ও তার আগে মিসরে চেষ্টা করেছ কিন্তু তোমরা সফল হওনি। অতএব, তোমরা সিরিয়ায় তোমাদের ব্যর্থ প্রয়াস করা থেকে বিরত হও এবং এমন জনপদের অনুসন্ধান করো যারা তোমাদের চেনে না, যেমন বার্মা, যাতে করে তোমরা সফল হতে পারো।

এসব তাকফিরিদের কারণে সমগ্র বিশ্বজুড়ে মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একদিকে জিহাদ শব্দ প্রয়োগ করে তারা মুসলিমদের হত্যা করছে। ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার কারণে বিশ্বজুড়ে ইসলামফোবিয়া ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষের কাছে দীন সম্পর্কে ভুল বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে। অপরদিকে তারা তাদের অজ্ঞতা ও জাহালতের কারণে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো যেমন : সুফিবাদ, ইলমুল কালাম, ইসলামি দর্শন প্রভৃতিকে বিদআত বানানোর কারণে মুসলিমদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদের মতো মহাবিপর্যয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

বর্তমানে উপমহাদেশে বিশেষকরে বাংলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মতো ওয়াহাবি-তাকফিরিদের বিভিন্ন সংগঠন ও তথাকথিত মানহাজি বক্তা গজিয়ে উঠছে। তারা সহিহ আকিদা ও মানহাজের নামে দীনের অপব্যাখ্যাপূর্বক তাকফিরি ফিতনা শুরু করেছে এবং বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে ইন্ধন যোগাচ্ছে, যেগুলো ইসলাম সমর্থিত নয়। পাশাপাশি মুসলিমদের মধ্যে তাকফির-তাবদির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বিভক্তি ও অশান্তি সৃষ্টি করছে। মুসলিম উম্মাহ ও রাষ্ট্রকে হিফাজতের লক্ষ্যে আমাদের এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং ওয়াহাবি তাকফিরিদের ব্যাপারে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এসব ফিতনা থেকে হিফাজত করুন। আমিন।

www.muslimdm.com

পরিশিষ্ট-২

মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব সম্পর্কে উলামায়ে দেওবন্দের মূল্যায়ন - হযরত মাওলানা মানযুর নোমানীর বক্তব্য পর্যালোচনা

মুফতী মামুন আব্দুল্লাহ কাসেমী[315]

মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ছিলেন আরবের নজদ অঞ্চলের একজন ধর্মীয় নেতা ও ওহাবি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সমর্থকদের কাছে মুজাদ্দিদ ও সংস্কারক হিসেবে পরিচিত হলেও সমকালীন আলেমদের কাছে তিনি ছিলেন বিতর্কিত। ধর্মীয় নানা বিষয়ে তিনি নতুন তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা হাজির করার ফলে এক ধরণের উগ্রতা তৈরি হয়, যা ইতঃপূর্বে দেখা যায়নি। তার এই আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নিলে বিষয়টি অন্যায় রক্তপাত ও লুণ্ঠন পর্যন্ত গড়ায়। বাধ্য হয়ে আলেমরা ইবনে আবদুল ওহাব ও তার অনুসারীদের চিন্তাধারা খণ্ডনে কলম ধরেন। মুহাম্মাদ আবদুল ওহাবের মৃত্যুর কিছুদিন পর আল্লামা শামী রহ. রচনা করেন ফতোয়ায়ে শামী। সেখানে তিনি ওহাবী নজদীদেরকে খারেজী বলে আখ্যা দেন। সমকালীন আরেকজন মালেকী আলেম হযরত শায়খ আহমাদ সাভী লেখেন-

"ওহাবিরা মনে করে, নিজেরা সত্যের উপর আছে। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। শয়তান আধিপত্য বিস্তার করেছে তাদের উপর, ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শয়তানের দলভূক্ত। নিশ্চয় শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি তাদেরকে উচ্ছেদ করেন।"[৩১৬]

মক্কায় শাফেয়ী মাযহাবের মুফতী হযরত শায়খ আহমাদ যাইনী দাহলান রচনা করেন, 'ফিতনাতুল ওয়াহাবিয়্যাহ' এবং 'আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ ফির রাদ্দি আলাল ওয়াহাবিয়্যাহ' নামে দুটি গ্রন্থ। ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হযরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদের পিতা হযরত মাওলানা খাইরুদ্দিন[৩১৭] রচনা করেন 'নাজমু রাজমিশ শায়াতীন'। আধুনিক যুগে অনেকেই মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব ও নজদী ধারার সমালোচনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, সৈয়দ আহমাদ ইউসুফ রিফায়ী, ড. রমযান আল-বুতী, মাহমুদ সাইদ মামদুহ, সানআনী, আবুল হাদি আস-সাইয়াদী, মুস্তফা সাবরী, শায়খ মুহাম্মাদ যাহেদ কাউসারী, হোসাইন আহমাদ মাদানী প্রমুখ।[৩১৮]

উপমহাদেশের প্রভাবশালী ইলমি ধারা- উলামায়ে দেওবন্দও নজদী আন্দোলন এবং এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন। উলামায়ে দেওবন্দের এই অবস্থান সম্পর্কেই আলোচনা হবে এই লেখায়।

মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী (১২০৬ হি.) সম্পর্কে উলামায়ে দেওবন্দের অবস্থান :

দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৬৬ সালে। সে সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিখ্যাত ওহাবী ট্রায়াল চলমান ছিল। সিত্তানা, মহাবন-সহ সীমান্ত এলাকাগুলোতে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী রহ. এর অনুসারীগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখেছিলেন। ধর্মীয়

---

৩১৫. দাওরায়ে হাদীস, আদব, ইফতা ও উলূমুল হাদীস: দারুল উলুম দেওবন্দ।

মহাসচিব : মজলিসে তাহাফফুযে ফিকরে দেওবন্দ বাংলাদেশ।

উস্তাযুল হাদীস : জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

৩১৬. হাশিয়াতুস সাভি, ৫/৭৮।

৩১৭. ইনি ছিলেন মাজারপন্থী।

৩১৮. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাবের ভাই সুলাইমান বিন আবদুল ওহাব রচনা করেন আসুসাওয়াইকুল ইলাহিয়্যাহ ফির রাদ্দি আলাল ওয়াহাবিয়্যাহ। এই গ্রন্থে তিনি ভাইয়ের বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারা ও মতবাদ খণ্ডন করেন। তবে নজদী ধারার আলেমদের মতে এই বইটি তার রচনা নয়। অন্য কেউ প্রতারণা করে তার নামে চালিয়ে দিয়েছে।

ঘরানায়ও সময়টা ছিল উত্তাল। দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার প্রায় ৩৫ বছর আগেই হযরত শাহ ইসমাইল শহীদের তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবটি নিয়ে তুমুল বিতর্ক দেখা দেয় এবং ফযলে রসুল বাদায়ুনী, আল্লামা ফযলে হক খাইরাবাদীসহ অনেকেই তাকে তাকফীর করেন। হযরত শাহ ইসমাইল শহীদের ইনতিকালের পরেও আলোচনা থেমে থাকেনি বরং "ইমকানে নযীর ও উকুয়ে নযীর" ইস্যুতে ফতোয়া-পাল্টা ফতোয়া ও পারস্পরিক তাকফীর লেগেই ছিল। এ সময় হযরত শাহ ইসমাইল শহীদের পক্ষে যারা কলম ধরেছেন তাদেরকে আখ্যা দেয়া হয় ওহাবী হিসেবে। দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত কাসিম নানুতাবী রহ.-ও এই জটিল পরিস্থিতি থেকে নিরাপদ ছিলেন না। তার কিছু লেখা নিয়েও বিরোধিপক্ষ তুমুল বিতর্কের সূচনা করে, বাধ্য হয়ে কিছুদিন তিনি দেওবন্দ থেকে দূরে সরে ছিলেন।

মূলত এ সময় বেরেলভী ধারার পক্ষ থেকে উলামায়ে দেওবন্দকে ওহাবী বলে গালমন্দ করা হয়, যদিও আকীদা বা ফিকহ কোনোদিক থেকেই উলামায়ে দেওবন্দ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারী ছিলেন না। তবে ওহাবী শব্দের নানা ভুল প্রয়োগ সত্ত্বেও দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিবর্গ তথা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতাবি, হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতাবী, হযরত হাজী আবেদ হুসাইন প্রমুখ থেকে আবদুল ওহাব নজদি সম্পর্কে কোনো মূল্যায়ন দেখা যায় না। তবে তাদের কাছাকাছি সময়ের আলেম মুহাদ্দিসে থানা ভবন হযরত মাওলানা শায়েখ মুহাম্মাদ থানভী রহ. থেকে কঠোর বক্তব্য পাওয়া যায়। সুনানে নাসাঈর হাশিয়াতে তিনি নজদীদেরকে খারেজী বলে সম্বোধন করেন এবং হযরত আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। এ সময় তিনি নজদী ধারার বেশকিছু নেতিবাচক দিক তুলে ধরেন।[৩১৯] ইমামে রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী রহ. থেকে দু'ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। একবার এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের আকাইদের অবস্থা আমার জানা নেই।[৩২০] অন্যত্র তিনি বলেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নজদীর অনুসারীদেরকে ওয়াহাবী বলা হয়। তাদের আকীদা ভালো ছিল। তারা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। তাদের স্বভাবে কিছুটা রুক্ষতা ছিল, কিন্তু তিনি ও তার অনুসারীরা ভালো। তবে ওদের মধ্যে যারা সীমালংঘন করেছে তাদের মধ্যে ফাসাদ এসে গেছে[৩২১]। অবশ্য শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর একটি বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, হযরত রশীদ আহমাদ গাংগুহী রহ. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ও তার অনুসারীদের ফাসিক মনে করতেন।[৩২২]

ইনারা হলেন দেওবন্দী উলামাদের প্রথম সারি, যাদের হাতে এই দারুল উলূম দেওবন্দ গড়ে উঠেছে। পরবর্তী সারিতে ছিলেন তারা যারা প্রথম সারির হাতে শিক্ষাদীক্ষা নিয়েছেন। এই ধাপের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ছিলেন হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী[৩২৩], হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমীরি, শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী, হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী, শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. প্রমুখ। এই স্তরের আলেমদের থেকে আবদুল ওহাব নজদী সম্পর্কে একাধিক মন্তব্য পাওয়া যায়। ১৯০৬ সালে আহমাদ রেজা খাঁ বেরেলভী উলামায়ে দেওবন্দের কিছু বক্তব্যকে বিকৃত করে হিজাযের আলেমদের কাছ থেকে একটি ফতোয়া অনুমোদন করেন যেখানে উলামায়ে দেওবন্দকে তাকফীর করা হয়। পরের বছর দেওবন্দী আলেমরা হিজাযের আলেমদের সাথে যোগাযোগ করে বেশ কিছু বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন। তখন হিজাযের আলেমরা সেই তাকফীর প্রত্যাহার করেন। দেওবন্দী আলেমদের এই বিবৃতি ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয় 'আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ' নামে। এর মুসান্নিফ হিসেবে হযরত মাওলানা

৩১৯. সুনানে নাসাঈর হাশিয়া, কিতাবুয যাকাত, বাবু মুয়াল্লাফাত কুলুবুহুম।

৩২০. ফাতাওয়া রশিদিয়া, ৬২।

৩২১. প্রাগুক্ত ২৬৬। মুফতি মাহমুদ হাসান গাংগুহির মতে রশিদ আহমদ গাংগুহি মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতেন না। দেখুন ফতোয়া মাহমুদিয়া, ৪/১৬৩।

৩২২. বিস্তারিত জানতে দেখুন আশ শিহাবুস সাকিব, ৬৪।

৩২৩. হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী ছিলেন হযরত রশীদ আহমাদ গাংগুহী রহ. ছাত্র।

খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ.-এর নাম থাকলেও এতে উলামায়ে দেওবন্দের জীবিত প্রভাবশালী অনেক আলেমদের স্বাক্ষর ছিল।[৩২৪] এখন পর্যন্ত দেওবন্দের নিয়মতান্ত্রিক ও মাসলাকী আকিদা হিসেবে এই কিতাবের বিষয়বস্তুকে বিবেচনা করা হচ্ছে। একাধিক ভাষায় এর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

এই পুস্তিকায় এক প্রশ্নের জবাবে হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. বলেন, মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সম্পর্কে আমরা সেই মত পোষণ করি যা আল্লামা শামী রদ্দুল মুহতারে ব্যক্ত করেছেন। তিনি খারেজীদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, "আমাদের সময়ে মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারীরা এমন, তারা নজদ থেকে বের হয়ে হারামাইন শরীফাইনে চড়াও হয়েছে। মাযহাবের দিক থেকে তারা হাম্বলী। কিন্তু তারা ভাবে তারাই একমাত্র মুসলমান। তাদের চিন্তাধারার যারা বিরোধিতা করে তারা মুশরিক। এজন্য তারা আহলুস সুন্নাহ ও তার আলেমদের রক্তকে বৈধ করেছে। এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার। ইলম, ফিকহ, হাদিস, তাফসীর, তাসাউফের কোনো সিলসিলাতেই সে কিংবা তার কোনো অনুসারী আমাদের মাশায়েখ বা শিক্ষক নয়।"[৩২৫]

আগেই বলেছি পুস্তিকাটি হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. কর্তৃক রচিত হলেও একে সত্যায়ন করেছেন সমকালীন দেওবন্দী আকাবিরদের প্রায় সবাই। এই গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত সত্যায়নে হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. লিখেছেন, আমি এই বইটি পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এখানে যা বলা হয়েছে তা আমাদের এবং আমাদের সকল মাশায়েখদের আকিদা-বিশ্বাস, এতে কোনো সন্দেহ নেই।[৩২৬] একই কথা বলেছেন মীর আহমাদ হাসান আমরুহীও। দেওবন্দের প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী আজিজুর রহমান উসমানী সাহেব লিখেছেন, 'এইসব মাসায়েলে মাওলানা সাহারানপুরী যে তাহকীক পেশ করেছেন, আমাদের কাছে সেটিই হক এবং আমরা ও আমাদের মাশায়েখদের বিশ্বাস এটিই।'[৩২৭]

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ. লিখেছেন, 'আমি এই পুস্তিকার ধারাগুলো বিশ্বাস করি।' অন্য সত্যায়নকারিদের বক্তব্যও ছিল একই। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় তাদের বক্তব্যগুলো উদ্ধৃত করছি না। কারো আগ্রহ হলে 'আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ' দেখে নিতে পারেন। সবার বক্তব্য থেকে এটি পরিষ্কার যে আল মুহান্নাদের প্রতিটি বক্তব্যে দেওবন্দের আকাবিররা একমত ছিলেন। তারা একে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যারা একে সত্যায়ন করেছেন তারা সকলেই ছিলেন দেওবন্দের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব। প্রতিষ্ঠাতাদের পরেই ছিল তাদের অবস্থান। তাদের ইলমী আমলী যোগ্যতার কারণে তারা হয়েছে উঠেছেন দেওবন্দী ধারার প্রধান মুখপত্র। এতজন ব্যক্তির সত্যায়নে প্রকাশিত আল মুহান্নাদের বক্তব্যের পর নজদী ধারা সম্পর্কে দেওবন্দীদের আর কোনো বক্তব্য উপস্থাপনেরই প্রয়োজন হয় না। তবু বিষয়টির নাজুকতার কারণে আমরা আরো কয়েকজন প্রভাবশালী দেওবন্দী আলেমকে উদ্ধৃত করছি-

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমীরি (১৩৫২ হি.):

দেওবন্দী ধারার প্রভাবশালী আলেমদের তালিকা করলে হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমীরির নাম তাদের শীর্ষে থাকবে। তার প্রখর স্মৃতিশক্তি ও ইলমে হাদীসে গভীর জ্ঞানের কারণে সমকালীন আরব আলেমরাও তার যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। আবদুল ওহাব নজদী সম্পর্কে তিনি বেশ কঠোর মূল্যায়ন করেছেন। আলোচনার ভাষা

---

৩২৪. এখানে যারা সত্যায়ন করেছিলেন তারা হলেন, শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, মাওলানা মীর আহমদ হাসান আমরুহী, দারুল দেওবন্দের প্রধান মুফতী মাওলানা আজিজুর রহমান, হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী, শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী, মাওলানা হাকীম মাসউদ হাসান, মাওলানা কুদরুতুল্লাহ সাহেব, মাওলানা হাবিবুর রহমান দেওবন্দী, মাওলানা মুহাম্মদ আহমাদ বিন কাসিম নানুতাভী মাওলানা গোলাম রসুল দেওবন্দী, মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ দেহলভী, মাওলানা আশেক ইলাহী মিরাঠি।

৩২৫. আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, ৬২। মুহাম্মাদ বিন আদম কাউসারীর তাহকিককৃত নুসখা।

৩২৬. প্রাগুক্ত, ১০০।

৩২৭. প্রাগুক্ত, ১০৩।

থেকে বুঝা যায় আবদুল ওহাব নজদীর সমস্যা ও বিভ্রান্তি সম্পর্কে তিনি বেশ ভালোভাবেই সচেতন ছিলেন। তিনি বলেছেন, "আবদুল ওহাব নজদী ছিলেন কম ইলমের অধিকারী একজন নির্বোধ ব্যক্তি। তাকফীরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা ছিল তার স্বভাব।"[৩২৮]

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (১৩৭৭ হি.):

শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. ছিলেন নিজের সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্যতম। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব সম্পর্কে তার মূল্যায়ন ছিল কঠোর। তিনি লিখেছেন, "মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব হিজরী তেরো শতকে নজদে আবির্ভূত হন। তিনি ক্ষতিকর চিন্তাভাবনা এবং ভুল আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করতেন, ফলবশত তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি তার ক্ষতিকর চিন্তা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাদের সম্পত্তিকে যুদ্ধের লুঠ হিসেবে এবং তাদেরকে হত্যা করাকে বরকত ও করুণার উৎস হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি বিশেষভাবে হারামের লোকজনের প্রতি এবং হিজাযবাসীদের প্রতিও কঠোর ছিলেন। তিনি সালাফদের প্রজন্ম সম্পর্কে কুৎসা রটিয়েছেন। তার দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতার কারণে অসংখ্য লোককে পবিত্র মক্কা ও মদীনা ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল এবং তাদের অনেককেই তার বাহিনীর হাতে শহীদ হতে হয়েছিল। এক বাক্যে তিনি ছিলেন অত্যাচারী, বিদ্রোহী এবং রক্তপাতের নেশায় থাকা এক সীমালঙ্ঘনকারী।"[৩২৯]

মুফতী মাহমুদ হাসান গাংগুহী (১৪১৭ হি.):

হযরত মাওলানামুফতী মাহমুদ হাসান গাংগুহী ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দ এবং মাযাহিরুল উলূম সাহানপুরের প্রধান মুফতী। তিনি মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সম্পর্কে বলেন, "তার জানাশোনা কম ছিল। বুঝবুদ্ধিরও অভাব ছিল। তার থেকে এমন কিছু কথা ও কাজ প্রকাশিত হয়েছে যা অনেক ফেতনার কারণ হয়েছে।"[৩৩০] অন্যত্র তিনি বলেন, "মুাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সুন্নত অনুসরণের দাবি করেছিলেন, তাই অনেকেই তার সাথে যোগ দেয়। কিন্তু তার অনেক মতই ছিল সুন্নত বিরোধী। ফলে যতই তার আসল রূপ বেরিয়ে আসতে শুরু করে, অনেকেই তার দল ছেড়ে চলে যায়। সঙ্গে এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করাই তার উদ্দেশ্য ছিল এবং সুন্নত অনুসরণের দাবিটা ছিল কেবল একদল লোককে আকৃষ্ট করে নিজের অনুসারী বানানো।"[৩৩১]

দারুল উলুম হক্কানিয়ার ফতোয়া:

আখুরাখটকে অবস্থিত দারুল উলুম হক্কানিয়াকে বলা হয় দ্বিতীয় দেওবন্দ। এই মাদরাসার পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি অফিশিয়াল ফতোয়ায় বলা হয়, "মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ছিলেন একজন চরমপন্থী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তার আকিদা-চিন্তাধারার আলোকে তার অনুসারীরা মুসলিমদের হুটহাট তাকফীর করে। দেওবন্দের সম্মানিত 'উলামারা তাঁর আকিদা ও চিন্তাভাবনার সাথে একমত নন, পাশাপাশি তারা তাকে ও তার অনুসারীদের তাকফীরও করেন না। সাধারণ মানুষের জন্য তার বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলা অত্যন্ত জরুরি।"[৩৩২]

আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় আমরা আর কারো বক্তব্য ও ফতোয়া উদ্ধৃত করছি না। কারণ আমরা মনে করি আল মুহান্নাদই উলামায়ে দেওবন্দের অফিসিয়াল বিবৃতি। এর পর আর কারো বক্তব্য উপস্থাপন না করলেও চলে। প্রশ্ন উঠতে পারে, মুাহাম্মাদ বিন আবদিল ওহাব নজদী

---

৩২৮. ফাইযুল বারী, ১/২৯৪।

৩২৯. আশ শিহাবুস সাকিব, ২২১। এ ছাড়াও আশ শিহাবুস সাকিবের আরো বেশ কিছু স্থানে হযরত মাদানী মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ও নজদীবাদের কঠোর সমালোচনা করেন। দেখুন, পৃ- ৪৪-৪৬, ৫১। একস্থানে তিনি বলেন ওহাবই খবিসরা কি এই কাজকে জায়েয মনে করে? তারা তো একে শিরক, বিদআত ও কুফর মনে করে। দেখুন, ৫৪। অন্যত্র তিনি বলেন, নবীজির বিষয়ে শায়খ গাংগুহী ও তার অনুসারিদের আকিদা ওহাবই খবিসদের মত নয়। পৃ- ৫৪। অন্যত্র তিনি বলেন, ওহাবিরা যখন হারামাইন শরীফাইন নিয়ন্ত্রণ নেয় তখন তারা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, শাস্তি দিয়েছে। বিস্তারিত জানতে পড়ুন ৫১-৬৬ পৃষ্ঠা।

৩৩০. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ৩/৪৪।

৩৩১. প্রাগুক্ত, ৩/৪০।

৩৩২. ফাতাওয়া হক্কানিয়া, ১/৩৮০। একই ধরণের ফতোয়া দেয়া হয়েছে জামিয়া বিনুরি টাউন থেকেও।

সম্পর্কে উলামায়ে দেওবন্দের অবস্থান জানা জরুরী কেন? এর কারণ হলো, উপমহাদেশে বেরেলভি ধারার সাথে উলামায়ে দেওবন্দের যেই বিরোধ সেখানে এটি একটি বড় ইস্যু।

বেরেলভিরা শুরু থেকেই উলামায়ে দেওবন্দকে ওহাবী বলে আখ্যা দেয় এবং দাবী করে উলামায়ে দেওবন্দ আকীদা ও ফিকহের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ বিন আদুল ওহাব নজদীর মত উগ্র ও খারেজী। অথচ বাস্তবতা হলো নজদী ধারার সাথে উলামায়ে দেওবন্দের সামান্যতম কোনো সম্পর্কও নেই। এই ধারার কেউ উলামায়ে দেওবন্দের উস্তাদ বা অনুসরণীয় কিছুই নন। বরং ফিকহ ও আকীদা ইস্যুতে তাদের সাথে উলামায়ে দেওবন্দের অনেক বিরোধ স্পষ্ট। আর বিরোধ হওয়াই স্বাভাবিক। নজদীধারার সাথে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতেরই অসংখ্য মাসআলায় বিরোধ আছে, ফলে এ অঞ্চলে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মুখপত্র উলামায়ে দেওবন্দের পক্ষেও সম্ভব নয় সেই বিরোধ এড়িয়ে যাওয়া। এজন্য দেওবন্দী উলামারা তাদের অফিসিয়াল বিবৃতিতে যেমন নজদীধারা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন, তেমনি তাদের দরস তাদরিস ও লিখনিতেও এই বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

নজদীধারা সম্পর্কে উলামায়ে দেওবন্দের অবস্থান স্পষ্টই ছিল, কিন্তু গত শতাব্দীর শেষদিকে মাওলানা মানযুর নোমানী একটি গ্রন্থ রচনা করেন ‘শেখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব আওর হিন্দুস্তান কে উলামায়ে হক’ নামে। এই বইতে তিনি দেখান, “উলামায়ে দেওবন্দ শুরুতে মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে ছিলেন এবং বিরোধিপক্ষের প্রোপাগান্ডা শুনে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। পরবর্তীতে তাদের সামনে হাকিকত স্পষ্ট হলে তারা নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেন এবং মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সম্পর্কে ইতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেন।”

মাওলানা নোমানী ছিলেন দেওবন্দের খ্যাতিমান ছাত্রদের অন্যতম। তিনি আনোয়ার শাহ কাশ্মীরির ছাত্র। আজীবন দারুল উলুম দেওবন্দের শুরা সদস্য ছিলেন। ফলে তার এই বক্তব্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পরের দিকের দেওবন্দীদের অনেকেই তার কথা গ্রহণ করে বলতে থাকেন নজদীধারার ব্যাপারে উলামায়ে দেওবন্দের অবস্থান শক্ত নয়। মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সম্পর্কেও আল মুহান্নাদের কথাই শেষ কথা নয়।[৩৩৩]

মাওলানা মানযুর নোমানীর এই বক্তব্যের সবচেয়ে বড় জবাব হলো এখনো পর্যন্ত দারুল উলুম দেওবন্দ অফিসিয়াল কোনো ঘোষণার মাধ্যমে আল মুহান্নাদের কোনো অবস্থান থেকে ফিরে আসেননি। কিংবা এতে স্বাক্ষর করা আলেমরাও কখনো বলেননি এর কোনো ধারা সম্পর্কে তারা নিজেদের অবস্থান বদলেছেন। ফলে এ ব্যাপারে মাওলানা মানযুর নোমানীর গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ। তিনি যা বলেছেন তা একান্তই তার ব্যক্তিগত মত হতে পারে, কিন্তু উলামায়ে দেওবন্দের সর্বসম্মত মত নয়। শহীদে ইসলাম হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী রহ. এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, উলামায়ে দেওবন্দের কয়েকটি ধাপ অতিবাহিত হয়েছে।

০১. কাসেম নানুতাবী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, ইয়াকুব নানুতুবী ও তাদের সমকালীন উলামা।
০২. পরবর্তী ধাপে রয়েছেন পূর্ববর্তীদের আস্থাভাজন শিষ্য যেমন শাইখুল হিন্দ, খলীল আহমাদ সাহরানপুরী, থানবী প্রমুখ উলামা।
০৩. এরপর উপরিউক্ত আলেমদের শিষ্য কাশ্মিরী, মাদানী ও শাব্বীর আহমদ উসমানী প্রমুখ উলামা
০৪. তারপর উপরিউক্ত উলামার শিষ্য ইউসুফ বানুরী ও মুফতী শফী উসমানী প্রমুখ উলামা।
০৫. এখন পঞ্চধাপ চলমান চতুর্থ উলামার শিষ্যরা বর্তমান।

‘আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ’ এ দ্বিতীয় ধাপের সকল উলামার সত্যয়ন রয়েছে, যা প্রথম ধাপের উলামার প্রতিনিধিত্ব। এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপ থেকে এই আকিদার ব্যাপারে ঐকমত্য বর্ণিত। সুতরাং “আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ” বইয়ে অন্তর্ভুক্ত আকিদার ওপর উলামায়ে দেওবন্দের

৩৩৩. যেমন সাম্প্রতিককালে মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান, মাওলানা মানযুর মেংগল প্রমুখ মানযুর নোমানির পক্ষ নিয়েছেন।

www.muslimdm.com

সকল আকাবির একমত। কোনো দেওবন্দী তা অস্বীকার করতে পারবে না এবং যে এই আকিদার বরখেলাপ করবে বা বিকৃতি করবে —তার দেওবন্দী হওয়ার অধিকার নাই।[৩৩৪]

মানযুর নোমানির বক্তব্য সম্পর্কে এটুকু আলোচনাই যথেষ্ট ছিল কিন্তু তবু অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকতে পারেন ভেবে তার বক্তব্যের কিছু দূর্বল দিক উপস্থাপন করছি-

হযরত সাহারানপুরী সম্পর্কে মাওলানা মানযুর নোমানী র বক্তব্য

আল মুহান্নাদে হযরত সাহারানপুরীর বক্তব্য সম্পর্কে মাওলানা মানযুর নোমানী রহ. এক অবান্তর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর উত্তর থেকে বোঝা যায় না তিনি মুহাম্মাদ বিন ইবনু আবদুল ওহাব নজদীর আকিদা ও নজরিয়াত সম্পর্কে নিজে ব্যক্তিগতভাবে কোনো অনুসন্ধান করেছেন কিনা। কিংবা তার কোনো অনুসারীর বইপত্র পড়েছেন কিনা। বাহ্যিকভাবে মনে হয় তিনি প্রশ্নকারীর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে উত্তর দিয়েছেন।[৩৩৫]

প্রথমত, হযরত মাওলানা মানযুর নোমানী যদি এই ধারণাই করেন যে, হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরী কোনো অনুসন্ধান ছাড়াই নজদী সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন এবং আকাবিরে দেওবন্দও কিছু না বুঝেই স্বাক্ষর ও সমর্থন দিয়েছেন তাহলে তো আল মুহান্নাদ পুরোটাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি হযরত সাহারানপুরীকে না বলে সকল আকাবিরদেরকেই এই বিষয়ে অজ্ঞ বলা উচিত। কিন্তু হযরত মাওলানা মানযুর নোমানী এবং এই মাসআলায় তার সমর্থকরা সেই সাহস করবেন?

দ্বিতীয়ত, 'হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী শুধু প্রশ্নকারীর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে জবাব দিয়েছেন' বলে হযরত মাওলানা মানযুর নোমানীর এই ধারণা শতভাগ ভুল। যদি হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর কাছে নজদী সম্পর্কে কোনো তথ্য না থাকতো, তাহলে তিনি বলে দিতেন আপনাদের উল্লেখিত তথ্য সঠিক হলে এই ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের অবস্থান এমন। এসব ক্ষেত্রে উত্তর দেয়ার ইলমী উসূল এটাই। কিন্তু আমরা দেখি হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী স্পষ্ট লিখেছেন, 'মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সম্পর্কে আমাদের অবস্থান তা, যা ইবনে আবেদীন শামী লিখেছেন।' এই কথা থেকেই স্পষ্ট তারা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর সমস্যাগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। এমনকি আল মুহান্নাদের অন্যত্র আরেক প্রশ্নের জবাবে হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী বলেন, ওহাবীরা যেমন উম্মতের উলামাদের তাকফীর করেছে, তেমনি বেরেলভীরাও উলামাদের তাকফীর করেছে। তারা যেমন লাঞ্ছিত হয়েছে আল্লাহ এদেরকেও লাঞ্ছিত করুক।[৩৩৬]

একটু সামনে এগিয়ে হযরত মাওলানা মানযুর নোমানী দাবী করেন, 'আল মুহান্নাদ লেখার পর হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী যখন মদিনায় যান তখন তার চিন্তায় পরিবর্তন আসে। তিনি মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সম্পর্কে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেন।' এই দাবীর পক্ষে হযরত মাওলান মানযুর নোমানী, হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর দুটি চিঠি উপস্থাপন করেন। প্রথমটি লেখা হয়েছিল 'যমিনদার' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা যফর আলী খানের কাছে। দ্বিতীয়টি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর নাতী হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াকুবের কাছে। পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে দুটি পত্রই এখানে তুলে দিচ্ছি।

১। মাওলানা যফর আলী খানের কাছে লেখা পত্রে হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী বলেন, বাসার কাছেই প্রধান বিচারপতি শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে বুলাইহিদের বাসা। তাঁর সঙ্গে প্রায় সময় সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতে বিভিন্ন দ্বীনি মাসাইল নিয়ে আমাদের আলাপচারিতাও হয়েছে।

৩৩৪. ফতোয়া বাইয়িনাত, ১/৫২৬।

৩৩৫. শেখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব আওর হিন্দুস্তান কে উলামায়ে হক, ৪০

৩৩৬. আল মুহান্নাদ, ২২।

অনেক বড় আলেম। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী। হাদিসের বাহ্যরূপের ওপর আমল করে থাকেন, যেমনটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর পদ্ধতি। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ও শায়খুল ইসলাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর কিতাবাদির একান্ত অনুরক্ত। এগুলোই অধিক পাঠ করেন। আমাদের উলামায়ে কেরামও এ দু-জন বুযুর্গকে অনেক বড় মাপের আলেম হিসেবে সম্মান করেন। বিদআত ও কুসংস্কারের প্রতি সীমাহীন ঘৃণাবোধ রয়েছে। তাওহীদ ও রিসালাতকে নিজ ঈমানের শেকড় মনে করেন। মোটকথা, আমি যদ্দূর লক্ষ্য করেছি, তাঁকে আহলে সুন্নাতের আকীদা-বিশ্বাস থেকে সামান্যতম বিচ্যুত-ও পাইনি। নজদের অধিকাংশ অধিবাসী কুরআন শরীফ পড়ুয়া। তাদের মাঝে প্রচুর হাফেযের ছড়াছড়ি। তারা খুবই পাবন্দি সহকারে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করে থাকে। ইদানিং মদীনা মুনাওয়ারায় তীব্র শীতকাল চলছে। কিন্তু নজদের অধিবাসীরা ফজরের নামাযে নিয়মিত যোগদান করে থাকে। মোটকথা, এই জাতির দ্বীনি চিত্র খুবই স্বস্তিদায়ক দেখেছি।[৩৩৭]

নোট- মাওলানা মানযুর নোমানীর মতে এই পত্রই নাকি খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর অবস্থান পরিবর্তনের দলিল! সচেতন পাঠক, পত্রটি আবার পড়ুন এবং ইনসাফের সাথে বলুন, এই পত্রের কোন বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী আল মুহান্নাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন কিংবা মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সম্পর্কে আগের মতামত পরিবর্তন করেছেন? নজদী ধারার একজন আলেমের প্রশংসা ও নজদ অঞ্চলের মানুষের আমল আখলাকের প্রশংসাকেই হযরত মাওলানা মানযুর নোমানী বানালেন নজদী সম্পর্কে মতামত পরিবর্তনের দলিল। এর চেয়ে স্থুল কথা আর কী হতে পারে? তাছাড়া মাওলানা মানযুর নোমানী যদি মনে করেন, নজদের বাসিন্দা মানেই নজদিধারার লোক তাহলে সেটিও ভুল অনুমান। সেখানে নজদীধারা যেমন ছিল আহলুস সুন্নাহর অনুসারীরাও ছিল।

২। হাফেয মুহাম্মদ ইয়াকুবের কাছে লেখা আরেকটি পত্রে হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী বলেন, "আমি মনে করি, বর্তমান যুগ বিচারে এই প্রশাসন খুবই দ্বীনদার। তারা সদিচ্ছার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। যতগুলো বড় বড় কাজ হয়েছে, এর প্রতিটিতে আমি কোনো না কোনো দ্বীনি চেতনা পেয়েছি। তবে ছোট-খাট কিছু বিষয়ে ভুল-চুক হচ্ছে। আমি গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে যদ্দূর পেয়েছি, এর কারণ হলো, প্রশাসনের কাছে যোগ্য ব্যবস্থাপকের পদে দ্বীনদার লোক নেই। যার ফলে কিছু কিছু প্রাশাসনিক কর্মকাণ্ডে গাফলতি হয়ে যাচ্ছে। সুলতান ইবনে সাউদকে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত দ্বীনদার, প্রজ্ঞাবান, সহ্যক্ষম মানসিকতার অধিকারী মনে হয়েছে। কিন্তু একজন ব্যক্তির কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত হাত-পা না থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে কীইবা করা সম্ভব। গোটা হিজাযের নিরাপত্তাব্যবস্থা এতটাই চমৎকার যে, মক্কা মুকাররমা, মদিনা মুনাওয়ারা, ইয়াম্বূ ও জিদ্দার অভ্যন্তরীণ সড়কে নিয়মিত একটি- দুটি করে উট আসা-যাওয়া করছে; অথচ কারো কোনো অভিযোগ নেই। তাদের বিরুদ্ধে যেই অভিযোগগুলো খুব বেশি চর্চিত হচ্ছে তাহলো, গম্বুজ ভাঙার অভিযোগ। স্থানীয় মূর্খ জনগণ শিয়াদের সংস্পর্শে প্রভাবিত হয়ে এই গম্বুজগুলোকে নিজেদের দ্বীন ও ঈমান বানিয়ে রেখেছে। আমার মতে এগুলো ধ্বংসা করা নির্ঘাত আবশ্যক। প্রশাসনও এ বিষয়ে মদিনার স্থানীয় উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে ফতোয়া চেয়েছিল। তারা যখন তা ভাঙার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছে তখনই তারা তা ভাঙ্গার সাহস করেছে।"[৩৩৮]

নোট- এই পত্রটি পাঠ করেও কি এমন কোনো কথা পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন? মাওলানা মানযুর নোমানীর চোখে না দেখে নিজের বিবেকের আয়নায় লেখাটি পড়লেই বুঝা যায় এখানে শুধু প্রশাসনের কাজকর্মের প্রশংসা আছে। একটি দলের প্রশাসনিক কাঠামোর প্রশংসা করা মানেই তো তাদের আকিদা মেনে নেয়া নয়। এর দ্বারা হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীর মতামত পরিবর্তনের দলিল দেয়া কীভাবে সম্ভব?

অর্থাৎ মাওলানা মানযুর নোমানী যে বলতে চেয়েছেন, হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরী মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সম্পর্কে তার অবস্থান পরিবর্তন করেছেন তা কোনভাবেই সঠিক নয়। এর পক্ষে তিনি যেসব দলিল দিয়েছেন তার একটিও দলিল হওয়ার যথোপযুক্ত নয়।

---

৩৩৭. প্রাগুক্ত, ৪৪।

৩৩৮. প্রাগুক্ত, ৪৬।

হযরত মাদানীর অবস্থান সম্পর্কে মানযুর নোমানীর বক্তব্য

শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী সম্পর্কে হযরত মাওলানা মানযুর নোমানীর দাবী হলো, 'তিনি যেহেতু ১৩১৬ থেকে ১৩৩৩ হিজরী পর্যন্ত মদিনায় ছিলেন এবং সে সময় আরবে নজদিদের সম্পর্কে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালু ছিল তাই তিনি বাস্তবতা বুঝতে পারেননি। অনেক বিষয়ে ভুল জেনেছেন এবং সেগুলোই আশ শিহাবুস সাকিবে[৩৩৯] উল্লেখ করেছেন।[৩৪০] কিন্তু পরে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে ১৯২৫ সালে জমিনদার পত্রিকায় এক বিবৃতির মাধ্যমে জানান, মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী সম্পর্কে আমি যা বলেছি তা প্রচলিত কথাবার্তা অনুসারে লিখেছি। তার কোনো কিতাবাদি আমি দেখিনি। তার কিতাবাদি দেখার পর বুঝেছি আমি যা জানতাম তা সঠিক নয়।'

হযরত মাওলানা মানযুর নোমানী এরপর জমিনদার পত্রিকার সেই বিবৃতি উল্লেখ করেছেন। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় সেই বিবৃতি বিস্তারিত উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকছি। কিন্তু হযরত মাদানী রহ. যে রুজু করেননি তার একাধিক দলিল বিদ্যমান।

প্রথমত, হযরত মাদানী রহ. যদি ১৯২৫ সালেই তার অবস্থান থেকে রুজু করে থাকেন তাহলে আশ শিহাবুস সাকিবের পরবর্তী এডিশনগুলোতে তিনি সংশোধন করেননি কেন? নজদীদের সম্পর্কে যেসব নেতিবাচক মন্তব্য ছিল সেগুলো বাদ দেননি কেন? নিদেনপক্ষে তার সেই রুজুনামা তো বইটির সাথে সংযুক্ত করে দেয়ার কথা। উলামায়ে দেওবন্দের জীবনী যারা পড়েছেন তারা জানেন উলামায়ে দেওবন্দ ইলমী ক্ষেত্রে শতভাগ আমানতদারিতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। তারা কোনো বিষয়ে রুজু করলে সেই বিষয়টি সংশোধন করে নিতেন এবং সবাইকে জানিয়ে দিতেন। কিন্তু হযরত মাদানী রহ. কেন আশ শিহাবুস সাকিব সংশোধন করলেন না? কথিত সেই রুজুর পরেও হযরত মাদানি ৩২ বছর বেঁচে ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়েও তিনি বইটি সংশোধন করেননি। এ থেকে বুঝা যায় তিনি আসলে অবস্থান পরিবর্তন করেননি।

দ্বিতীয়ত, হযরত মাদানী রহ. খাস ছাত্র এবং অন্যতম প্রধান জীবনীকার কাজি মুহাম্মাদ যাহেদ আল হুসাইনী তার লিখিত 'চেরাগে মুহাম্মদ' গ্রন্থে বলেন, কিছু লোক প্রচার করছে হযরত মাদানী শেষদিকে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। এটি একেবারেই ভুল এবং বিদআতিদের সৃষ্টি। হযরত মাদানী রহ. সারাজীবন সেই অবস্থানেই ছিলেন, আঁকাবিরে দেওবন্দ যে অবস্থানে ছিলেন এবং তারা আল মুহান্নাদে যা বলেছেন। প্রখ্যাত লেখক ও আলেমে দ্বীন মাওলানা রিয়ায আহমদ আশরাফী হযরত মাদানীকে এক পত্র মারফত প্রশ্ন করেন আপনি কি আশ শিহাবুস সাকিবের অবস্থানে অটল আছেন নাকি মত পরিবর্তন করেছেন? হযরত মাদানী জবাবে বলেন, আশ শিহাবুস সাকিব রচনা হয়েছে হুসামুল হারামাইনের জবাবে। সেখানে ওহাবিদের আলোচনা এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে। আমার উদ্দেশ্য ছিল আকাবিরদের মানহাজ যে মধ্যপন্থী ছিল তা দেখানো। তারাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের প্রকৃত অনুসারী। এই কিতাবে যে মানহাজ বর্ননা করা হয়েছে এখনো আমার অবস্থান সেটিই এবং আমার আকাবিরদের অবস্থানও তাই।[৩৪১] হযরত মাদানীর এই পত্রটি ১৯৫১/৫২ সালে লেখা। অর্থাৎ কথিত সেই রুজুর ২৫ বছর পর। কিন্তু এখানেও দেখা যাচ্ছে হযরত মাদানী পূর্বের অবস্থানেই অনড় ছিলেন।

তৃতীয়ত, ১৯৫৩ সালে আবুল আলা মওদুদীর সমালোচনা করতে গিয়ে লেখা এক পত্রে হযরত মাদানী বলেন, মওদুদী সাহেবের এসব আলোচনার ফলাফল হচ্ছে খারেজীদের মত মুসলমানদের রক্তপাত। মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ও তার অনুসারীরা হিজাযে যেমনটা করেছে। এরপর তিনি আল্লামা শামির বক্তব্য উদ্ধৃত করেন।[৩৪২]

---

৩৩৯. আশ শিহাবুস সাকিব রচনা করা হয় ১৩২৮ হিজরি তথা ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে।

৩৪০. মাওলানা মানযুর নোমানি দাবী করেন হযরত মাদানী শুধু নজদী'র বিপক্ষ দল যেমন আহমাদ যাইনি দাহলানসহ অন্যদের বই পড়েছেন ফলে প্রকৃত বিষয় জানতে পারেননি। দেখুন, শেখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব, ৪৭।

৩৪১. চেরাগে মুহাম্মদ, ১১৮। হযরত মাদানী'র এই পত্রটি মাকতুবাতে শাইখুল ইসলামেও সংকলিত হয়েছে। দেখুন, মাকতুবাত, ২/২৯৮।

৩৪২. মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম, ৩/৭৯।

চতুর্থত, হযরত মাদানী রহ. জীবনের শেষদিকে রচনা করেন 'নকশে হায়াত' নামে আত্মজীবনী। এই গ্রন্থ আমাদের দেওবন্দী ঘরানায় খুবই প্রসিদ্ধ এবং হযরত মাদানির জীবন ও চিন্তা সম্পর্কে জানার প্রধানতম উৎস এটি। এই গ্রন্থের বেশ কয়েক স্থানে তিনি মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর কঠোর সমালোচনা করেন। এমনকি আলাদা শিরোনাম করে সবিস্তারে তিনি ওহাবিদের সাথে দেওবন্দীদের আকিদার তফাত বর্ননা করেন।[৩৪৩]

সবগুলো তথ্য প্রমাণ করে হযরত মাদানী রহ. জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত আশ শিহাবুস সাকিবে লিখিত অবস্থানে অটল ছিলেন। তিনি নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেননি। মাওলানা মানযুর নোমানী রহ. কর্তৃক জমিনদার পত্রিকার কথিত এক রুজুনামা আনায় বিষয়টি নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি হলেও হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী, হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী ও অন্য কোন আকাবির থেকে রুজু প্রমাণিত হয়নি এবং হবার নয়। হযরত মাদানীর খাস ছাত্র এবং আল্লামা কাশ্মীরির জামাতা আহমদ রেজা বিজনুরি[৩৪৪]ও হযরত মাদানীর রুজু করার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।[৩৪৫]

আল্লামা কাশ্মীরির অবস্থান সম্পর্কে হযরত মাওলানা মানযুরর নোমানীর বক্তব্য

ফাইযুল বারী'তে উল্লেখিত হযরত কাশ্মীরির একটি বক্তব্যে দেখা যায়, তিনি মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর কঠোর সমালোচনা করছেন। মাওলানা মানযুর নোমানী এক্ষেত্রে কয়েকটি পয়েন্ট তুলে ধরেন।

১। প্রথমত তিনি দাবী করেন এই অংশটি হযরত কাশ্মীরির বক্তব্য নয়। মানযুর নোমানীর মতে এটি বদরে আলম মিরাঠির নিজের বক্তব্য।

২। মাওলানা মানযুর নোমানী যুক্তি দেন এই বাক্যে যে কঠোরতা আছে তা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরির মেজাযের সাথে যায় না।

৩। হযরত মাওলানা মানযুর নোমানীর মতে আল্লামা কাশ্মীরি অবশ্যই কিতাবুত তাওহীদ পড়েছেন এবং এই বই পড়ে তার লেখককে কম ইলমের অধিকারী বা নির্বোধ বলা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এ অংশে এসে মাওলানা মানযুর নোমানীর লেখা যুক্তির বদলে আবেগ নির্ভর হয়ে উঠে। তিনি মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর লেখার এমন মুগ্ধ প্রশংসা শুরু করেন যা থেকে বোঝা যায় তিনি নজদী সাহেবের ভুল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না এবং নিছকই একজন ভক্ত অনুরাগীর দৃষ্টি দিয়ে নজদী সাহেবের বই পড়েছেন।

প্রথমত মাওলানা মানযুর নোমানী এমন কোনো শক্তিশালী দলিল দিতে পারেননি যা থেকে প্রমাণিত হয় কথাটি আল্লামা কাশ্মীরির নয়। ফাইযুল বারীর ভূমিকাতেই আল্লামা বদরে আলম মিরাঠী লিখেছেন, এই গ্রন্থের কিছু জায়গায় হযরতুল উস্তাদের কথার সাথে আমার কথাও ঢুকে গেছে। কিন্তু যেখানে এমনটা হয়েছে সেখানে আমি লিখে দিয়েছি 'কুলতু' কিংবা 'ইয়াকুলু আবদুয যইফ'।[৩৪৬] বদরে আলম মিরাঠী বলেই দিচ্ছেন নিজের কথা আনলে তিনি কীরকম সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তবুও হয়রত মাওলানা মানযুর নোমানী কীভাবে তার উপর দায় চাপিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লামা কাশ্মিরিরই কথা।

দ্বিতীয়ত, হযরত মাওলানা মানযুর নোমানীর মতে নজদী সাহেবকে কঠোরভাবে বলা 'হযরত কাশ্মীরির মেজাযের সাথে যায় না।' প্রশ্ন হলো, এখানে মেজাযের সাথে যাওয়া না যাওয়ার আলাপ আসছে কেন? একজন ব্যক্তির হাকীকত যা তা স্পষ্ট করতে সমস্যা কোথায়? মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ও তার অনুসারীরা খারেজী ছিল। আরব আযমের সকল উলামায়ে কেরাম এই কথা বলেছেন। উলামায়ে দেওবন্দ এই কথার

৩৪৩. বিস্তারিত জানতে দেখুন, নকশে হায়াত, ১/১০৬, ২/২৪,

৩৪৪. ইনি শাইখুল ইসলাম আল্লামা যাহেদ কাউসারিরও সান্নিধ্য পেয়েছিলেন।

৩৪৫. বিস্তারিত জানতে দেখুন, আনোয়ারুল বারী, ১৯/৩০৬।

৩৪৬. ফাইযুল বারী, ১/৩২।

উপর আল মুহান্নাদে সাক্ষর করেছেন। খারেজীরা মাথামোটা হয়, তাদের রুসুখ ও তাফাক্কুহ থাকে না, এটা তো জানা কথাই। সেই একই কথা আল্লামা কাশ্মীরিও বলেছেন। তিনি তো কাউকে অন্যায় গালি দেননি, কিংবা অপবাদ দেননি, শুধু হাকীকত বর্ননা করেছেন। হযরত মাওলানা মানযুর নোমানী কেন ধারনা করলেন হযরত কাশ্মীরির পক্ষে এমন কথা বলা সম্ভব নয়? পুরো ব্যাপারটিই দাঁড়িয়ে আছে আবেগি কথাবার্তার উপর।

তৃতীয়ত, মানযুর নোমানী নিজে নজদী সাহেব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিতাবুত তাওহীদ পড়ে হয়তো তার মনে হয়েছে ইলমের বিশাল ভাণ্ডার পেয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি কেন ভাবলেন আল্লামা কাশ্মীরির মত যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসও নজদী সাহেবের সাতহী চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করা এই বই পড়ে মুগ্ধ হবেন। কাশ্মীরির মত ব্যক্তি যিনি সালাফ খালাফের উল্লেখযোগ্য সকল কাজ পড়ে রেখেছিলেন তিনি যে নজদিকে একবার উল্টেই তার হাকীকত বুঝে ফেলবেন এটা তো স্বাভাবিক। 'আল্লামা কাশ্মীরিও মাওলানা মানযুর নোমানীর মত হালকাভাবে বিষয়টা দেখবেন এবং মুগ্ধ হবেন'- হযরত মাওলানা মানযুর নোমানী সাহেব এমনটা ভেবে থাকলে এটা নিতান্তই অবাস্তব ও অবান্তর। যদিও হযরত মাওলানা মানযুর নোমানীর মুগ্ধতা ঠিক কতটুকু বাস্তব আর কতটুকু 'শুধু প্রকাশ' সেই প্রশ্নেরও হয়ত সুযোগ আছে। আল্লামা যারওয়ালী খান এক আলোচনায় বলেছেন, মাওলানা মানযুর নোমানী মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর পক্ষে বই লিখেছিলেন তার ছেলে সাজ্জাদ নোমানীকে মদিনা ভার্সিটিতে ভর্তি করানোর সুযোগ পেতে।[৩৪৭]

সকল দলিল প্রমাণ সামনে রেখে বলতে হয় আগের দুজনের মত আল্লামা কাশ্মীরির ক্ষেত্রেও হযরত মাওলানা মানযুর নোমানী নিজের দাবী প্রমাণে সফল হতে পারেননি।

মাওলানা মানযুর নোমানীর আলোচনার সারকথা

মাওলানা মানযুর নোমানী তার বইতে দুটি বিষয় দেখাতে চেয়েছেন।

প্রথমত, তার মতে নজদীধারার সাথে উলামায়ে দেওবন্দের ইখতেলাফ শাখাগত কয়েকটি বিষয়ে যা বড় ধরণের কোনো ইস্যু নয়। হযরত মাওলানা মাওলানা আহমদ রেজা বিজনুরী তার রচিত 'আনোয়ারুল বারী'তে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন, নজদীধারার সাথে উলামায়ে দেওবন্দের উসুলগতই অনেক তফাত আছে এবং ইখতেলাফের পরিমাণ নেহায়েত কম নয়। এই বিষয়ে হযরত মাওলানা মানযুর নোমানি যা বলেছেন তা সঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত, মাওলানা মানযুর নোমানী দেখিয়েছেন দেওবন্দী উলামাদের অনেকে শুরুতে মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ও নজদীধারা সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করলেও পরে তারা নিজেদের অবস্থান থেকে সরে এসেছেন এবং নজদীধারা সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তা লালন করা শুরু করেন। এই বিষয়টিও সঠিক নয়। হযরত মাওলানা মানযুর নোমানী নিজের দাবীর পক্ষে যেসব বিষয় হাজির করতে চেয়েছেন তার কোনটিই তার দাবীকে সত্যায়িত করেনি।

দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েবসাইটের একটি ফতওয়া

দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েবসাইটে এক প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায়, হযরত মাওলানা মানযুর নোমানীর বইকে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত মত হিসেবে উপস্থাপন করতে। এ বিষয়ে কথা হলো, দেওবন্দের ওয়েবসাইটে প্রশ্নোত্তর অংশটি দারুল উলূম দেওবন্দের মুখপত্র ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সরাসরি পরিচালিত না, বরং ছাত্রদের মশকের প্রশ্নোত্তরও কখনো কখনো এখানে পরিবেশিত হয়। এখানে অনেক বেশি এহতেমাম নেই। এজন্য কখনো কখনো দেখা যায় এক প্রশ্নের কয়েক রকম উত্তর দেয়া আছে। একাধিক উত্তর দেয়া আছে। যেমন ইস্তিওয়ার মাসালায় এখানে দুরকমের উত্তর দেয়াই আছে। ফলে এই সাইটের সকল বক্তব্যকে দেওবন্দের অফিসিয়াল বিবৃতি হিসেবে গ্রহণ করা অনুচিত হবে।

---

৩৪৭. এখানে বিষয়টি উল্লেখ করা হলো নিছক একটি মত হিসেবে। এটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হওয়া জরুরী নয়। তবে মাওলানা মানযুর নোমানী'র বইয়ের আরবী ও উর্দু সংস্করণের মাঝে বেশকিছু তফাত দেখা যায়। আরবী সংস্করণে বেশকিছু বিষয় এড়িয়ে গেছেন তিনি। আহলে হাদীস ঘরানার আলেমরা এই বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন, দাওয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব, ২২১।

সারকথা:
মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ও নজদীধারা সম্পর্কে আকাবিরে দেওবন্দের অবস্থান হলো, তারা একে খারেজী জামাত মনে করেন, যেমনটা মনে করতেন আল্লামা শামীসহ সমকালীন আলেমরা। আল মুহান্নাদ প্রকাশের পর উলামায়ে দেওবন্দ কখনো নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেননি। পরেরদিকে এক-দু'জন দ্বাঈ- যারা আরবে যাতায়াত করেছেন এবং নানাভাবে সেখানকার রাজনীতি ও শাসকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন- তারা হয়তো নজদীধারা সম্পর্কে প্রভাবিত হয়েছেন বা প্রভাবিত হওয়ার ভান ধরেছেন, কিন্তু এটি দেওবন্দের অফিসিয়াল অবস্থান নয়।

তথ্যসূত্র

www.muslimdm.com

1. القرآن المجيد
2. الكتب الستة الشريفة
3. مشكاة المصابيح
4. تاريخ آل سعود لناصر سعيد، منشورات اتحاد شعب الجزيرة العربية
5. الصواعق الإلهية في الرد علي الوهابية للشيخ سليمان بن عبد الوهاب النجدي، دار ذو الفقار، بيروت
6. كشف الخفا عن عبث الوهابية بكتب العلماء للأستاذ علي مقدادي الحاتمي، دار النور المبين للنشر و التوزيع
7. فتنة الوهابية و أحوال نجد للشيخ عبد الوهاب تركي، فراديس للنشر و التوزيع
8. الحقائق الإسلامية في الرد علي مزاعم الوهابية، دار الحرمين الشريفين العالمية، مصر
9. العالم والمتعلم للإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان
10. النقول الشرعية في الرد علي الوهابية للإمام الشطي الحنبلي ، ت- بسام حسن عمقية، دار غار حراء
11. فتنة الوهابية للإمام زيني دحلان، مكتبة الحقيقة
12. تاريخ العبر للإمام ابن خلدون المالكي، دار الفكر
13. تاريخ نجد لابن غنام، دار الشروق
14. عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر، مطبوعات دارة الملك عبد العزيز
15. علماء نجد لابن بسام، دار العاصمة
16. منهاج أهل الحق لسليمان بن سحمان، مكتبة الفرقان
17. الدرر السنية في الأجوبة النجدية
18. خزانة التواريخ النجدية لعبد الله آل بسام
19. الدرر السنية في الرد علي الوهابية للإمام زيني دحلان، مكتبة الاحباب
20. مصباح الأنام للإمام علوي حداد، مكتبة العامرة الشرفية
21. المنحة الوهبية في الرد علي الوهابية للإمام السيد سليمان البغدادي
22. ترجمان وهابيه، نواب صديق حسن خان مطبع مفيد عام
23. سيف الجبار، إمام فضل رسول بدايونى، تاج الفتوح اكيڈمى
24. اتحاف أهل الزمان لأبي الزياف، الدار العربي
25. الفتوحات الإسلامية للإمام زيني دحلان دار صادر
26. الفجر الصادق للشيخ الزهاوي
27. تهكم المقلدين عبد الرحمن بن عفالق
28. متن ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب النجدي
29. كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب النجدي، وزارة الشؤون الاسلامية
30. ابجد العلوم للنواب صديق حسن خان، منشورات وزارة الثقافة
31. الرسائل الشخصية لمحمد بن عبد الوهاب النجدي
32. وہابی تحریک ، إمام فضل رسول بدايونى، تاج الفحول
33. الخوارج لغالب بن علي

34. مجلة الهدف

35. Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict by Joel Benin and Lisa Hajjar, Lokayat

36. The Political History of Palestine under British Administration, BRITISH INFORMATION SERVICES

37. شبه الجزيرة العربية ، خير الدين الزركلي

38. بريطانيا و ابن سعود لمحمد علي سعيد، منظمة الاعلام الاسلامي

39. تاريخ نجد لجون فيلبي

40. فتاوىٰ حقانيه، شيخ عبد الحق حقانى ، جامعه دار العلوم حقانيه

41. المسألة الحزازية ليوسف كمال حنانه

42. إمداد الفتاوى، شيخ اشرف على تهانوى، زكريا بوک ڈيپو

43. تاريخ التعليم في العراق للشيخ عبد الرزاق

44. خلاصة الكلام للإمام زيني دحلان، مطبعة أرض الحزاز

45. المحمل الشريف و رحلته الي الحرمين الشريفين، يوسف تشاكلر و صالح كولين

46. تاريخ الدولة العثمانية، إيلماز أوزتونا، مؤسسة فيصل للتمويل، إسلامبول

47. المنح الالهية في طمس الضلالة الوهابية، للشيخ اسماعيل التميمي، ت-الدكتور أحمد الطويل

48. تطهير الفؤاد

49. فيض الباري للشيخ انور شاه الكشميري، دار الكتب العلمية

50. بلاد العرب للإمام حسن بن عبد الله الاصفهاني

51. الخوارج لناصر بن عبد الكريم، دار اشبيلية

52. الخوارج بين الماضي و الحاضر للدكتور ياسر المسدي

53. Arabs at War in Afghanistan by Mustafa Hamid and Leah Farral, Hurst and Company, London

54. The 1936-39 Revolt in Palestine by Ghassan Kanafani, Published by the Tricontinental Society, London, 1980. "The 1936-39 Revolt in Palestine" published, in addition, by Committee for a Democratic Palestine, New York, 1972

55. F.D.R. Meets Ibn Saud by Col. William A. Eddi

56. H. ST. JOHN PHILBY, IBN SAUD AND PALESTINE by Jerald L. Thompson

57. History of the Arabs by PK Hitti, Macmillan

58. A History of Mediaeval India by Satish Chandra, Orient Black Swan

59. History of Zionism by Nahum Sokolow, Longmans, London

60. الصواعق و الرعود للإمام عبد الله بن داؤود الزبيري

61. السحب الوابلة للإمام محمد ابن حميد النجدي الحنبلي مكتبة الامام احمد

62. عجائب الآثار للإمام الجبرتي

63. أيام فيلبي لجون فيلبي

64. The Birth of Al-Wahabi Movement and it's Historic Roots, by Intel. col. Sa'id Mahmud Najm Al-'Amiri

69. Southern Nejd by John Philby, Cairo Government Press

70. Saudi Arabia by John Philby, Ernest Benn Limited, London

71. The Heart of Arabia by John Philby, Constable and Company Ltd

72. Arabia of the Wahhabis by John Philby, Constable and Co.

73. Four Centuries of Modern Iraq by Stephen Hemsley Longrigg, Oxford

74. LES TRIBUS DISPERSÉES' by Issac Ben Zvi

75. Kuwait and her Neighbors by Lt. Harold Richard Patrick Dickson, George Allen and Unwin Ltd.

76. The Complete Diary of Theodore Herzl, Herzl Press and Thomas Youseff

77. Arabian Jubilee by John Philby

78. مجموع رسائل العلامة مرعي الكرمي الحنبلي: قلائد العقيان في فضائل آل عثمان، الرسالة رقم ٤٨، ت: محمد وائل الحنبلي، دار اللباب

79. شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم- دار المنهاج

80. My Life with the Taliban by Mullah Abdus Salam Zaeef, Hachette, India

81. The Secret Life of Mullah Omar by Bette Dam, Zomia Center

82. To the Mountains by Abdullah Anas, Hurst and Company

83. The Terrorist Organization Behind The Curtain: The Madkhali Salafists by Ismail Yasha, Iram Yaninlari

84. Salafism in the Maghreb: Politics, Piety, and Militancy by Anouar Boukhars and Frederic Wehrey

85. The Desert King: Ibn Saud and His Arabia by David Howarth, Qurtet Books

86. تتمة النظام لقاضي القضاة الشيخ عبد الحكيم الحقاني، مكتبة قاسم العلوم

www.muslimdm.com

87. معتمد ماتريد من معتقد ماتريد للشيخ نور أحمد إسلام جار
88. مجلة الصمود الصادرة من إمارة افغانستان الإسلامية
89. الهدف
90. مختصر شهادتي علي الجهاد في الجزائر لأبي مصعب السوري
91. استراتيجية مكافحة الإرهاب و التمرد في الصومال، لجونج و اندرو ميم ليبمان، و نيسان تشاندلر
92. كشف الارتياب للسيد محسن الأمين العاملي
93. تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي، مكتبة السلام، مصر
94. قصة الأشراف و ابن سعود للدكتور علي الوردي
95. الشيخ أبو بكر الصديقي الفرفروي و آثار دعوته في شبه القارة الهندية للشيخ منير الاسلام
96. তবাকাতুল ইজাম ও মিন্নাতুল মুগিস, অনুবাদ : মুহাম্মাদ উজাইর সিদ্দিকী।
97. The History of Najd prior to the Wahhabis : a study of social, political and religious conditions in Najd during three centuries preceding the Wahhabi reform movement by Uwaidah Al Juhani
98. Malfoozat of Faqeeh ul Ummat by Mufti Mahmood Hasan Gangohi, Madrasah Taleemuddeen, South Africa, February 2010
99. الجواب الصحيح لابن تيمية ، دار العاصمة
100. حياة الشيخ محمد عبد الوهاب لخزعل، مطابع دار الكتب، بيروت
101. جزيرة العرب في القرن العشرين لحافظ وهبه، دار الافاق العربية
102. Four Centuries of Modern Iraq by Stephen Hemsley Longrigg , Oxford, 1925
103. The desert king : the life of Ibn Saud by David Howarth, Quartet Books
104. مجزرة الحجاز الكبرى للدكتور عبد الله الأهنومي، مركز شهارة للدراسة و البحوث، اليمن، ١٤٤١ هـ
105. The Complete Diaries of Theodor Herzl, Translated by Harry John, The Theodor Herzl Foundation, 1960
106. فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني
107. الملل و النحل للإمام لشهرستاني
108. تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، دار طيبة
109. تفسير روح البيان للإمام إسماعيل حقي البروسوي، دار الكتب العلمية
110. التنبيه للإمام الملطي، ت الإمام زاهد الكوثري، المكتبة الازهرية للتراث
111. مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين للإمام الاشعري
112. شرح الشفا للإمام ملا علي القاري
113. الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي
114. جامع الفصولين للإمام سماوه
115. الرد الوافر للإمام ابن ناصر الدين الشافعي
116. الإكليل للإمام السيوطي
117. فتاوي الشامي للإمام ابن عابدين
118. إحياء علوم الدين للإمام الغزالي
119. شرح التلويح علي التوضيح للإمام التفتازاني
120. فتح المجيد لعبد الرحمن النجدي، مكتبة دار البيان
121. منهاج أهل الحق و الاتباع لسليمان بن سحمان مكتبة الفرقان
122. عيون الرسائل لعبد اللطيف بن عبد الرحمن، مكتبة الرشد
123. شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم للإمام سعيد بن محمد الحضرمي، دار المنهاج
124. كتاب الفروع للإمام ابن مفلح الحنبلي، دار المؤيد
125. جامع البيان للإمام الطبري، دار هجر
126. درج الدرر للإمام الجرجاني، دار الفكر
127. المجموع شرح المهذب للإمام النووي، مكتبة الارشاد
128. المقصد الأرشد للإمام ابن مفلح الحنبلي
129. محق التقول في مسألة التوسل للإمام زاهد الكوثري
130. شفاء السقام للإمام تاج الدين السبكي
131. المواهب اللدنية للإمام القسطلاني
132. الجوهر المنظم للإمام ابن حجر الهيتمي
133. شرح المقاصد للإمام التفتازاني
134. سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي
135. الإشارات الإلهية للإمام الطوفي الحنبلي

www.muslimdm.com

136. الفقه الأكبر للإمام الأعظم
137. فتح القدير للإمام كمال الدين ابن همام الحنفي
138. فتح الوهاب لزكريا الانصاري
139. تبيان كذب المفتري للإمام ابن عساكر
140. الإنصاف للقاضي الباقلاني، ت - زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث
141. التحقيق التام في علم الكلام للإمام محمد الحسيني الظواهري ، مطبعة حجاز القاهرة
142. ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب النجدي
143. مجموع الفتاوي لابن تيمية
144. الفتوحات المكية للشيخ الأكبر ابن عربي
145. فيه ما فيه للإمام جلال الدين الرومي
146. ديوان الصنعاني
147. حاشية تفسير الجلالين للإمام أحمد بن محمد الصاوي
148. إثبات المولد و القيام للإمام أحمد سعيد
149. الشهاب الثاقب، حسين أحمد مدنى، دار الكتاب
150. مكتوبات شيخ الإسلام، نجم الدين اصلاحى
151. المهند على المفند، شيخ خليل أحمد سهرانپورى
152. الكوكب الدري للشيخ رشيد احمد الكنكوهي
153. The Battle for Saudi Arabia by As'ad Abukhalil, Seven Stories Press, New York

www.muslimdm.com

লেখক পরিচিতি

ইয়াসির আরাফাত আল হিন্দির জন্ম ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ অক্টোবর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং উত্তর প্রদেশের লাখনৌ অবস্থিত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতোকত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় (Ph.D) নিয়োজিত রয়েছেন। ওয়াহাবিদের ইতিহাস তাঁর লেখা প্রথম গ্রন্থ।